৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার
কলিকাতা
২৪৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৩২

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ—১ম খণ্ড—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান (বিজ্ঞান)—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ ২১৯, ৮১৫
অনুযোগ (কবিতা)—শ্রীহরিধন মিত্র ১৬৬
অনুরোধ (কবিতা)—শ্রীরমিন্দু দত্ত ২৪৯
অন্ধ ভিখারী (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির ২৯
অন্নচিন্তা (অর্থনীতি)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১০১
অভিশপ্ত (গল্প)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৭৪৮
অমরত্ব (দর্শন)—শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম-এ, পি-আর-এস ৯৬৭
অমর স্মৃতি (কবিতা)—রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল ৩১৭
অমৃত ও গরল (বিজ্ঞান)—শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্ সি ২৮৮
"আগে চল্ আগে চল্ ভাই" (আলোচনা)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ ৯৫৫
আশুতোষ (জীবনী)—শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী ১১২, ২৬৭, ৫০৯, ৭৫২, ৯৪০
উদ্বোচিঠি (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩
উদাসিনী (চিত্র)—শ্রীরণদা উকিল ৬১৫
এসেছে আষাঢ় (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৪১
কন্যা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল ৬৫
কলিকাতার গৃহ-সমস্যা (পূর্ত্তবিজ্ঞান)—শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই ৫৩২, ১০৩৩
কবির দুঃখ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩০৪
কাম্নাবিলাসী (কবিতা)—শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫
৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C. I. E (জীবন কথা)—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৫৮
কাব্য-কল্পনায় আর্ট (সাহিত্য)—শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি এল্ ৮৯০
কুলবধূ (চিত্র)—শ্রীরণদা উকিল ৭২৮
কৃষ্ণের কংসবধ (রঙ্গ ও ব্যঙ্গ)—শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩০
কে দায়ী ? (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ ১০২০
কৈবর্ত্তদিদি (গল্প)—শ্রীরমলা বসু ৮২৪
কোষ্ঠীর ফলাফল (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬, ২৬৩, ৪৩৭, ৬০৮
খাঁচার পাখী (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি ৬৫৩
গরমিল্ (উপন্যাস)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১১, ২১৫
গান্ধীজী (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ২৩০
গৃহচিকিৎসা (চিকিৎসা শাস্ত্র)—ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র এম বি ২৭৮, ৮০৬
চট্টগ্রামের কয়েকটি দৃশ্য (বিবরণ)—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত ৬৬
চন্দননগরের আনন্দ উৎসব (বিবরণ)—শ্রীহরিহর শেঠ ৪৭২
চিত্তশোকের প্রায়শ্চিত্ত (কবিতা) —শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি এ ৩৯৭
চিত্রশালা ১৭৭
চিত্রে বৈচিত্র্য (বিবরণ)—শ্রীহরিহর শেঠ ৮১
জ্যোতির্বিজ্ঞান (জ্যোতিষ শাস্ত্র)—শ্রীঅমিয়া বসু ৪৯১
জাগরণ (গল্প)—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৭০২
জয়দেব (জীবনী)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন ৮৪৬
জল্‌কে চল (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির ১২৭
জেকো-শ্লোভেকিয়া (বিবরণ)—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস্, পিএইচ্-ডি ২১০
জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ (ধর্ম্মতত্ত্ব)—আচার্য্য শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ ৪০১
ডালহাউসি ও চাম্বা (ভ্রমণ)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৫৯০
তবু যে ঘুম ভাঙ্গলে না (কবিতা)—শ্রীমানকুমারী বসু ৩৯৫
তস্মিন্ তুষ্টে—(গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৪২৪
তারা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৫১
দক্ষিণাপথ (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ১০১৩
দ্বন্দ্ব (উপন্যাস)—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫, ২৪৬, ৪০৭, ৫৬৭, ৭৬৩, ৯০৯
দুর্দ্দশা (চিত্র) ১৫৫
দেশবন্ধু-বিয়োগে (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩৪
দেশবন্ধু স্মৃতিতর্পণ ৩৫৩
দেশ-চিত্ত (কবিতা)—মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ৩৯৭
নারীর কাজ (চিত্র)—শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্ সি ৭০৬
নিষ্ফল নিশা (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৮৮৬
নিরঞ্জন (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭০
নিখিল-প্রবাহ (বৈদেশিকী)—শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্সি ১১৪, ৩০৫, ৫০০, ৮৫৪, ৯৭২
নিকুঞ্জ কানন (কবিতা)—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্ ১৩৩
নৃতত্ত্বে জাতি নির্ণয় (নৃতত্ত্ব)—ডাক্তার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি ২৯৫
পিয়ারী (উপন্যাস)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্ ৭১, ২৫৫, ৪৩০, ৫৮৪, ৭৭৬, ৯৪১
প্রলয়ঙ্করী (গল্প)—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্ ১২১
প্রাবৃট্ (কবিতা)—শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৩
পথ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ৩৩৬
পঞ্জিকা-সংস্কার (জ্যোতিষ)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৫৬১
পারুল (গল্প)—শ্রীগোপাল হালদার ৫৭৭

৩৪৭৭৮
কলিকাতা

বিরাম-প্রভাত (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৫৮২
বিক্ষীতীর্থ (ভ্রমণ)—রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল ৮২১
প্রাচীন কথা-সাহিত্য (সাহিত্য)—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ ডি ৪৬৩
পাঠকের নিকট প্রার্থনা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৫০৮
পরলোকে হিরণ্ময়ী দেবী ৫৫৪
পুস্তক-পরিচয় ৫৫৫
ভগ্ন-প্রাসাদ (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ৪৬৮
ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ (দর্শন)—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম-এ ৭৯
ভ্রষ্ট লগ্ন (গল্প)—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪৯
ভারতের স্থাপত্য শিল্প (কলা শিল্প)—শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ ৪৪১
মাতৃমূর্ত্তি (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির ৭৮
মনের পরশ (উপন্যাস)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ১৫৬, ৩২৫, ৫৫২, ৬৭২, ৭৯২, ৯২৩
মহাত্মা কবীর (জীবনী)—শ্রীসীতেশচন্দ্র সান্যাল ৪৫৭
মন্দির প্রতিষ্ঠা (গাথা)—শ্রীকামিনী রায় বি-এ ৫৭০
মিলন-পূর্ণিমা (উপন্যাস)—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্ ৫৭২, ৭২১, ৮৮৫
মালা (কবিতা)—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ৬১৬
মন্দির পথে ৮৫০
যশোহর (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ২৩৩, ৯৪৫
যোগী (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির ৮৮৯
রক্তকমল (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি টি ১৮৫
রবারাবৃত ক্ষুদ্র নৌকা ১৯৭
রাজপুরী (দৃশ্য কাব্য)—মন্মথ রায় ৩১২
রিক্তা (গল্প)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ৬০৬
রাজগী (উপন্যাস)—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল ৩৬, ২০৫
রূপান্তর (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৬
রক্ত গোলাপের জন্মকথা (গল্প)—শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী ৭১৫
রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি (রাজনীতি)—শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ ৮৫০
বংশীধর (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির ১০০
বধূ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্ ৬৫
বড়দিনের উপহার (গল্প)—শ্রীমণীশ ঘটক এম এ ১০৮
বর্ষ-প্রবেশ (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ১
বাংলার ভদ্রলোক (অর্থনীতি)—পরশুরাম ৩০
বাংলার মুস্‌লিম নারী (মাতৃ-মঙ্গল)—মুহম্মদ্ অব্‌দুল্লাহ্ ৯১
বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে (মাতৃ-মঙ্গল) —শ্রীদরদী ২৫৮
বাউল (চিত্র)—শ্রীরণদা উকীল ৬০৫
বাণী-বীণা (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ৭০
বাদলধারা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৭৬৬
বাল্যবিবাহ ও অকাল মৃত্যু (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীগোকুলবিহারী দাস বি-এ ৭৬৭
বাল্যবিবাহ ও অকাল মৃত্যু (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট্-ল ৫০
বাস্ত উপন্যাস (চিকিৎসা শাস্ত্র)—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল এম্-এস্ ৮৪১
বিক্রমপুর (প্রত্নতত্ত্ব)—অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ ৪২
বিরহী দেওয়ানা (গল্প)—শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ ৮৬৫
বিরহী (কবিতা)—শ্রীরমলা বসু ১০০৭
বিরিঞ্চি-বাবা (ব্যঙ্গ-চিত্র)—পরশুরাম ৬৫৮
বিশ্ব-মানসে বৈষ্ণবকাব্য (সাহিত্য)—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এস্সি ২
বেদ ও বিজ্ঞান (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ ৭২১
বেদান্তে বৈদিক দেবতা (দর্শন)—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল ৪৮৪
বোধন (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ২৫০
ব্রজবিপক্ষী (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-সী-এস্ ২০৪
ব্রিটিশ আফ্রিকা (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৩৩৭, ৫৩৫, ৬৮১, ৮৩০, ৯৯৬
ব্রেজিল (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১৩১
বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা (চিত্র)—ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন এম বি ৯৮৮
ব্যর্থ-বরষা (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১০১১
শিব সমুদ্রম্ (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই ১০২২
শঙ্কর ও রামানুজ (ধর্ম্মতত্ত্ব)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ২০১
শিশু-পালন (স্বাস্থ্যতত্ত্ব)— ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় ৪২৮
শিল্প-বাণিজ্যে চন্দননগর (বিবরণ)—শ্রীহরিহর শেঠ ৭৩৩, ৮৯৮
শেষ দান (গাথা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৫৭৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (জীবনী)—শ্রী-ম কথিত ১২৮, ২৬৯, ৪১৪
শ্রীচৈতন্য ভাগবত (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ঐতিহাসিকাচার্য্য ৮৮১
শোক-সংবাদ ১৯৬, ১০৩৮
সন্ধ্যা (গল্প)—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৬৮০
স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস (আলোচনা)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৯১৩
স্বকীয়া পরকিয়া (সাহিত্য)—শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ ৯১৭
সাইকেলে দারজিলিং (ভ্রমণ)—শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ৭৫৮
সাপুড়ে ৮৬৪
সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িকতা (সঙ্গীত-শাস্ত্র)—শ্রীবাণী দেবী ৬০
সঙ্গীত—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ও শ্রীসাহানা দেবী ১১০
সন্ন্যাসী (গল্প)—শ্রীঅজয়কুমার সেন ২৯৩
সমবেদনা ৩৯৮
স্বর্ণবলয় (কবিতা)—শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪০
স্নানযাত্রা (কবিতা)—শ্রীকামিনী রায় বি-এ ৫০১
সাময়িকী ১৯৮, ৫৪৫, ১১৭, ৮৭৮, ১০৩৩
সাহিত্য-সংবাদ ২০০, ৫৬০, ৭২০, ৮৮০, ১০৪০
সুরেন্দ্রনাথ ৫৫১
সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস (প্রত্নতত্ত্ব)—শ্রীকালিদাস দত্ত ৬১৬
সেকালের তীর্থযাত্রী (কবিতা)—শ্রীকামিনী রায় বি-এ ১০৪০
হাইফেন (উপন্যাস)—চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪, ২৭৫, ৪২২; ৬৯৭, ৭৫৪, ৯৯১
হিন্দীভাষা ও কবি সমাদর—শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ২৯১
হিমালয়ের পত্র (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ ৬৪৫, ৭৮১
হেমন্তে (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৮৮৪

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩৩২

অন্ধ ভিখারী
বরকল জলপ্রপাত (১) ...
বরকল জলপ্রপাত (২), বরকল জলপ্রপাত (৩)...
বরকল জলপ্রপাত (৪), বরকল জলপ্রপাত (৫)...
বরকল জলপ্রপাত (৬)
মাতৃ-মূর্ত্তি ...
১ম চিত্র, ২য় চিত্র, ৩য় চিত্র, ৪র্থ চিত্র ...
৫ম চিত্র, ৬ষ্ঠ চিত্র, ৭ম চিত্র, ৮ম চিত্র ...
৯ম চিত্র, ১০ম চিত্র, ১২শ চিত্র, ১৩শ চিত্র ...
১১শ চিত্র, ১৬শ চিত্র, ১৪শ চিত্র, ১৭শ চিত্র ...
১৫শ চিত্র, ২১শ চিত্র, ১৮শ চিত্র, ২০শ চিত্র ...
১৯শ চিত্র, ২২শ চিত্র, ২৪শ চিত্র, ২৫শ চিত্র ...
২৩শ চিত্র, ২৬শ চিত্র, ২৭শ চিত্র ...
২৮শ চিত্র, ২৯শ চিত্র, ৩০শ চিত্র
৩১শ চিত্র ...
বংশীধর ...
নিঃশ্বাসে সামর্থ্য নির্ণয়, বেতার নারী ...
বাত্যা নির্দ্দেশক যন্ত্র, জনসভায় বেতার
আর একটী দৃশ্য, অভিনব জাহাজ ...
বায়ুর চাপে জাহাজের গতিবৃদ্ধি, এণ্টন ফ্লেটনার ...
আর একটী চিত্র, অভিনব যন্ত্র
তরঙ্গ-ভঙ্গ, তরঙ্গ ভঙ্গের কারণ নির্ণয়, তেজ পরীক্ষা...
শ্রবণশক্তির পরীক্ষা, যন্ত্রের সাজসজ্জা, দিবালোকের যন্ত্র
বধিরত্বে বেতার, শ্রবণযন্ত্রের চিত্র
জল্‌কে চল্‌ ...
দুটি ছেলে, মিশ্রবর্ণের দু'টি ছেলেমেয়ে ...
মজুরণীর দল, নৌবহরের পোতসৈন্যের মিছিল ...
বিবাহ উৎসবের নৃত্যকারিণীগণ ...
ধর্ম্মোৎসবের নৃত্যকারিণীগণ ...
সুসজ্জিতা 'বৈবৈ' তরুণী যুগল, সুসজ্জিত 'বৈবৈ' পুরুষদ্বয়
সৌখীন 'তুকানো', আমাজনের কিশোরী ...
কাসাবার ছাতু তৈরী ...
রবার গাছের আঠা সংগ্রহ, রবারের খণ্ড ...
রবারের তাল পাকানো, মুর্গীর ছানাওয়ালা, ভাগ্যচক্র
কাসাবার রুটি
বাঁশীর ওস্তাদ, বাসনওয়ালা, রবার গাছ ...
প্রাচীন আরুযাক্ শিকারীদ্বয় ...
অশ্বারোহী প্রবাসী পোর্ত্তুগীজের দল, কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে
বেতের কাজ, খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া,
হীরক সন্ধানীরা, কফির বীজ ...
উৎসব বেশে আমাজন যুবা, ছাতু ছেঁকে ফেলা ...
আমাজন রমণীদের সর্পনৃত্য, কফিবীজ পচানো
ব্রুশ, ঝাড়ণ ও বেতের চেয়ার বিক্রেতা ...
বিষাক্ত মূল নির্ব্বিষ করা ...
কফির চাষ, ব্রেজিলের মানচিত্র ...
দুর্দ্দশা ...
শ্যামবাজার পার্ক একদিকের দৃশ্য ...
" " দ্বিতীয়দিকের দৃশ্য ...
" " তৃতীয়দিকের দৃশ্য ...
চট্টগ্রামের কয়েকটি দৃশ্য (বিবরণ)
চন্দননগরের আনন্দ উৎসব (বিবরণ)—শ্রীহরিহর শেঠ ৪১২

শ্যাম স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার
২৯ যোড়াপুকুর স্কোয়ার, মহিলা পার্ক ...
৬৬ বিদ্যাসাগর পার্ক (রামকৃষ্ণ দাসের লেন) ...
৬৭ মির্জ্জাপুর পার্ক, কলেজ স্কোয়ার ...
৬৮ ডালহৌসী স্কোয়ার ...
৬৯ ওয়েলিংটন স্কোয়ার ...
৭৮ ৺দক্ষিণাচরণ সেন ...
৮২ রবারাবৃত...নৌকা ...
৮৩ শ্রীদুর্গাপুরী দেবী বি-এ ব্যাকরণতীর্থা ...
৮৪ শ্রীশ্রীগৌরীমাতা ...
৮৫ শ্রীসুতপাপুরী দেবী ব্যাকরণতীর্থা ...
৮৬
৮৭
৮৮ মাইকেল মধুসূদন দত্ত—(প্রচ্ছদপট)
৮৯ অশ্বপালী
৯০ বাতায়ন রক্ষে
১০০ জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কোলাহল
১১৪ এখন যদি সাহস থাকে, ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি চল
১১৫ শেষ চিন্তা
১১৬
১১৭ শ্রাবণ—১৩৩২
১১৭ ডামরাইল—কালিন্দীর কর্দ্দমময় তীর ... ২৩৩
১১৮ ডামরাইল বা মুস্তাফাপুরের কাছারী বাটী ... ২৩৪
১১৯ ডামরাইলের ভগ্ন নবরত্ন মন্দির ... ২৩৫
১২০ মুকুন্দপুর...কালীমন্দির, কাটুনিয়া...৺গোবিন্দজীউ ... ২৩৬
১২৭ গোপালপুর—দীঘি ... ২৩৬
১৩৯ কাটুনিয়া...গুম্বজ ... ২৩৭
১৪০ মুকুন্দপুরের গড়ের খাত ... ২৩৮
১৪২ কাটুনিয়া...পুত্রদ্বয় ... ২৩৯
১৪২ কাটুনিয়া...দৃশ্য ... ২৪০
১৪৪ গোপালপুর...মন্দির ... ২৪১
১৪৪ মানচিত্র ... ২৪৩
১৪৫ কপিলাবস্তু পরিত্যাগ ... ২৫০
১৪৬ মন্দির-প্রাঙ্গণ, বজ্রাসন ... ২৫১
১৪৬ ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, বুদ্ধদেব ... ২৫২
১৪৭ অস্থি ও শিরা, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ... ২৭৯
১৪৮ খাদ্য পরিপাকের যন্ত্র, সম্মুখের দৃশ্য ... ২৮০
১৪৮ পশ্চাৎভাগের দৃশ্য, আঙ্গুলের চাপ, টুর্ণিকেট বাঁধা ... ২৮১
১৪৯ ত্রিকোণাকার ব্যাণ্ডেজ, গ্র্যানিনট, রিফ নট ... ২৮২
১৫০ মস্তকের ব্যাণ্ডেজ, স্কন্ধের ব্যাণ্ডেজ, ... ২
১৫০ কলার বোন ব্যাণ্ডেজ, আর্ম স্পাইরাল ও রিভার্স ব্যাণ্ডেজ ২
১৫১ ট্রায়াঙ্গুলার, কনুই ট্রায়াঙ্গুলার, হাণ্ড ব্যাণ্ডেজ ... ২
১৫২ ট্রায়াঙ্গুলার, রোলার স্পাইরেল, ফুট ব্যাণ্ডেজ ... ৩
১৫৩ কলার বোন দুইদিক ভাঙ্গিলে, চুয়াল ব্যাণ্ডেজ ... ৩
১৫৩ আর্ম্মের ফ্র্যাকচার ... ৩
১৫৪ ফোর আর্ম্মের ফ্র্যাকচার, হাতের হাড়ভাঙ্গা ... ৮৪
১৫৫ থাইবোন ভাঙ্গা, মালাইচাকী, পায়ের হাড়ভাঙ্গ ... ৮৪
১৭৭ একজনে তোলা, দুইজনে তোলা, ষ্ট্রেচার ... ৮৪
১৭৮ নিশ্বাস লওয়া, প্রশ্বাস লওয়া, ... ৮৫
১৭৯ শেফারের মতে কৃত্রিম উপায়ে, রোগীকে বসে তোলা ২৮৫
সিলভেষ্টারের মতে কৃত্রিম উপায়ে ... ২৮৭

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস লওয়া ... ১৮৩
হাওয়ার্ড কার্‌টার্, টুটানখামেনের প্রতিমূর্ত্তি ... ১৮৪
কবরের ভিতরকার দৃশ্য ... ১৮৪
প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ প্রতিলিপি ... ১৯৬
নায়াগ্রা প্রপাতের নিম্নাংশ ... ১৯৭
বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র, বিদ্যুৎ ভাণ্ডার ... ২০০
নায়াগ্রা প্রপাত, বৈদ্যুতিক শক্তিউৎপাদন গৃহ ... ২০০
বৈদ্যুতিক...হচ্চে, বৈদ্যুতিক...অভ্যন্তর ...
রেমণ্ড সাহেব, জলমগ্ন পর্ব্বতের সন্ধান ...
প্রকৃতি-বিচার, গ্রন্থি-চিকিৎসা ...
তিনতলা রাস্তার আনুমানিক চিত্র ...
নিউ ইয়র্কের রাজপথ ...
রাজপথে মোটর গাড়ীর ভীড়, চিকিৎসা ...
পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, অম্লজান মুখোষ, নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ ...
জলীয় অম্লজান, কার্য্যক্ষেত্রে ...
ষ্টেনটোফোন চালাবার যন্ত্র ...
ষ্টেনটোফোনের নাদযন্ত্র, ষ্টেনটোফোন ...
বৃটিশ আফ্রিকার অন্তঃপুরে ...
মাদুর ও চ্যাটাইবোনা ! ক'নে !
এশা গাঁয়ের গৃহিণী, বোর্ণুর বাদ্যকর ...
গৃহের চাল নির্ম্মাণ, হাতে তৈরী বাড়ী ...
কাফ্রীদের নির্ম্মিত সেতু, মাটীর ঘর ...
কাফ্রীমজুরণীর দল ...
হাউশা নারী, বর বধূ ...
আব্‌কা রমণীদের শির-শোভা ...
ষমজ পুত্রের জননী, শোকোতো অশ্বারোহী ...
কাফ্রী চিকিৎসা ...
কাটশেনার আমীর, শেহু ঘোড়শোয়ার ...
নৌকা নির্ম্মাণ ...
তৃণাচ্ছাদন ...
য়্যাম বা কাফ্রী আলু, জু' জু' ...
শেহু রাজ-ঐশ্বর্য্য ...
মহাপ্রস্থান ...
দেশবন্ধু—চিত্তরঞ্জন ...
ভবিষ্যৎ দেশবন্ধু ...
দেশবন্ধুর পিতা-মাতা ...
অক্সফোর্ডে—ছাত্রজীবন ...
সাগর সঙ্গীতের কবি ...
কারামুক্তির পর ...
কলিকাতার প্রথম মেয়র ...
মেয়রের বসিবার ঘর ...
মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে, দার্জ্জিলিং কার্ট রোডে দেশবন্ধু ও মহাত্মা গান্ধি ...
"ষ্টেপাসাইড"—বাঙ্গালার তীর্থ ...
দেশবন্ধুর শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রা ; দার্জ্জিলিং ...
দর্শন-কামনায় উদ্‌গ্রীব দার্জ্জিলিংয়ের অধিবাসীবৃন্দ ...
শিয়ালদহ ষ্টেশনে শববাহী ট্রেণ ...
ষ্টেশনে দর্শনকামনায় উদ্‌গ্রীব জনতা ...
ষ্টেশনের বাহিরে জনস্রোত ...
ভক্তি-প্রবাহে ...
হ্যারিসন রোডে—শোভাযাত্রা ...
কলেজ ষ্ট্রীটে—শোভাযাত্রা ...
ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে—শোভাযাত্রা ...
কর্পোরেশনে—মেয়রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ...
রসারোডে—শোভাযাত্রা ...
শ্মশান-সান্নিধ্যে ...
শোকমগ্না ...
দর্শন আগ্রহে ...
শ্মশানে শবদেহ অপেক্ষায় মহাত্মা ...
চির-বিদায় ...
সব শেষ ...
তীর্থপীঠ ...
শেষ দান ...
চতুর্থী শ্রাদ্ধ ...
বৃষোৎসর্গ বেদী ...
শ্রাদ্ধবাসর ...
স্মৃতি তর্পণ—বিরাট জনসমুদ্রে ...
দেশবন্ধুর স্বাক্ষর—বাংলা ...
দেশবন্ধুর স্বাক্ষর—ইংরেজী ...

বহুবর্ণ-চিত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—প্রচ্ছদপট
সুখনীড় [সপরিবারে দেশবন্ধু]
অভিমন্যু
বনফুল
মেঘসঞ্চার

ভাদ্র—১৩৩২

নৌকার মাঝি ...
দিলবারা নাট-মন্দির ...
দিলবারা নাটমন্দিরের চন্দ্রাতপ ...
দিলবারা মন্দিরের স্তম্ভ ...
একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার—দিলবারা ...
দ'লানের ছাদে কারুকার্য্য ...
আরাবল্লী পর্ব্বত ...
বীকানের মহারাজের আবু প্রাসাদের গাড়ি বারান্দা ...
জৈসলমের হ্রদ ...
জৈসলমের দুর্গ ...
জৈসলমের দুর্গে রাণীমহল ...
হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন ...
আধুনিক-হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন ...
গোমুখী ফোয়ার', সুন্দরবনের জঙ্গল মধ্যে হিন্দু মন্দির
কামাখ্যার মন্দির ...
পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির ...
বিষ্ণুপুরের মন্দির (১) ...
ঐ (২) ...
ঐ (৩) ...
ঐ (৪) ...
চন্দননগরে...ফরাসী গবর্ণর...বাঙ্গালার গবর্ণর ...
শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মাতা ...
স্নানযাত্রা ...

ফ্যাস্তা
গোস্বামী ঘাটের...মহোৎসব ...
যাদু ঘোষের রথ ...
রথ যাত্রা ...
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী প্রতিমা ...
মাইকেল মধুসূদনের প্রতিমূর্ত্তি ...
বার্ত্তা গ্রাহক ...
বেতার এরিয়াল, বেতার সঙ্কেত ...
বেতার-সঙ্কেতের কার্য্য, স্বয়ঞ্চল বেতার সঙ্কেত ...
গতি পরিবর্ত্তনকারী ...
নব রূপ, নৈশ দৃশ্য ...
আগ্নেয়গিরির রূপান্তর, পরশনের ভাষা, চোর ধরা কল
সূর্য্য-সারথি, ঘড়ির অন্তর্দৃশ্য, গ্রহাচার্য্যের ঘড়ি ...
প্রতিকৃতি গ্রাহক, লিপি প্রেরক, যন্ত্রের কার্য্যকলাপ ...
প্রতিকৃতি-প্রেরক, যন্ত্রের অন্তর্দৃশ্য ...
লিপিগ্রাহক, তড়িত-পত্রবাহক যন্ত্র ...
এঞ্জিনের অন্তর্বিচার, হৃদ্‌পিণ্ড দর্শন ...
সূর্য্যকরে ধাতুপিণ্ড ...
নূতন ধরণের স্বাস্থ্যকর সস্তা বাড়ী ...
সস্তা বাড়ীর নক্সা, গ্রাউণ্ড প্ল্যান ...
বাউটীর দোগারী, বোর্ণ্যূর কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ ...
নাকাদার মুসলমান কাফ্রীগণ, বোর্ণ্যূর কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ, ঐ
শোকোতোর সুলতান ...
বোর্ণ্যূর কানুরী নর্ত্তকীদের নাচ, ফুলানী তরুণীদ্বয় ...
আকড়া জাতীয়া সুন্দরী, নমাজ পাঠ ...
ন্যূপের আটচালা, কাতাম্বা ...
বোর্ণ্যূর বাজারে, চ্যাটাইয়ের হাটে ...
নাইগেরীয়ানদের গৃহ নির্ম্মাণ, আমীর সম্মেলন ...
'শল্লা' পর্ব্ব, উত্তর নাইগেরীয়া
বেণু নদী তীরে ...
মহাত্মা গান্ধী ...
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ...
শ্রীযুক্ত এইচ্, এস্ সারওয়াদ্দি ...
বখরিদ-উৎসব—ধর্ম্মতলার মস্‌জিদ্ ...
ইদ্-উপলক্ষে উপাসনা—নাখোদা মস্‌জিদ্ ...
ইদ্-উপলক্ষে ময়দানে উপাসনা (১) ...
ইদ্-উপলক্ষে ময়দানে উপাসনা (২) ...
উত্তরপাড়ার হেমচন্দ্র-স্মৃতি-ফলক উন্মোচন ...
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...
মৃত সুরেন্দ্র ...

বহুবর্ণ-চিত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব (প্রচ্ছদপট)
ভিটের মায়া
বুল্‌বুল্
মান
আলোর খেলা

আশ্বিন—১৩৩২

ডালহাউসীর একটী বাড়ী
দূর হইতে চাম্বা ... ৫৯০
ছাউনী হইতে ডালহাউসী ... ৫৯১

৪৭৭ খজিয়ারের হ্রদ
৪৭৮ গিরিবর্ত্ম ... ৫৯৩
৪৭৯ ডালহাউসীর পথে, সেনানিবাস—ডালহাউসী ... ৫৯৪
৪৮০ ক্লাবঘর হইতে ডালহাউসী ... ৫৯৫
৪৮১ রাবীর পুল হইতে দৃশ্য ... ৫৯৬
৪৮২ ডালহাউসীর একখানি বাড়ী ... ৫৯৭
৫০০ তুষার শ্রেণী ... ৫৯৮
৫০১ খজিয়ার ... ৫৯৯
৫০১ চাম্বার নিকট রাবী, চাম্বানগরী ... ৬০০
৫০১ বাখরু উপত্যকা ... ৬০১
৫০২ শীতকালে পাহাড়ের দৃশ্য ... ৬০২
৫০৩ পঞ্চপুলের ঝরণা ... ৬০৩
৫০৪ বাউল ... ৬০৪
৫০৫ উদাসিনী ... ৬০৫
৫০৬ নীলকুঠী ... ৬১৫
৫০৬ ত্রিপুরাসুন্দরী ... ৬১৭
৫০৭ অম্বুলিঙ্গ ... ৬১৮
৫০৮ কৃষ্ণচন্দ্রপুরের ভগ্নমূর্ত্তি ... ৬১৯
৫৩২ জলঘাটার প্রস্তর মূর্ত্তি, জলঘাটার আর একটী প্রস্তর মূর্ত্তি ৬২০
৫৩২ জাতের দেউল, শ্রীশ্রীনীলমাধব ... ৬২১
৫৩৫ রায়দীঘি, শ্রীশ্রীকালীমাতা ... ৬২২
৫৩৬ বৈশাটা মঠবাড়ী ... ৬২৩
৫৩৭ জাতের দেউলে আবিষ্কৃত প্রস্তরখণ্ড ... ৬২৪
৫৩৮ ঝাঁপানে বঙ্গমহিলা, অরণ্য মাঝারে ডাণ্ডীপৃষ্ঠে বঙ্গমহিলা ৬২৮
৫৩৯ দেবপ্রয়াগ, জলপ্রপাত, হিমালয়ের কৃষিক্ষেত্র ... ৬৪৬
৫৪০ অলকানন্দার লৌহসেতু, কৃষকপল্লী, চটী ... ৬৪৭
৫৪১ গঙ্গা পেরোবার দড়ির ঝোলা, হিমালয়ের দৃশ্য—কেদার পথে ৬৪৮
৫৪২ বিরিঞ্চি বাবা ... ৬৪৯
৫৪৩ "তিনে—কত্তি তিন" ... ৬৫৮
৫৪৪ নিরুপমা ও প্রফেসার ননী ... ৬৫৯
৫৪৫ "মাই ঘড্" ... ৬৬২
৫৪৬ "আঃ ছাড়—ছ'ড়—লাগে" ... ৬৬৮
৫৪৭ যাঃ ... ৬৭০
৫৪৮ প্রকাণ্ড ডুমুর গাছ, অন্ধ নিগ্রো মুসলমান ... ৬৭১
৫৪৮ কুমোর বাড়ী, ফান্তির কুমোরশালা ... ৬৮১
৫৪৯ রাজসূয় নৃত্য, কুমাশীর হাট ... ৬৮২
৫৪৯ হাউশা কুটীর, কানো সহরের মেটে বাড়ী ... ৬৮৩
৫৫০ হাউশা তরুণীদ্বয় ... ৬৮৪
৫৫১ লোকোজার মুসলমান কাফ্রী সর্দ্দারের পুত্র ও তার দুই পত্নী ৬৮৫
৫৫২ এক নম্বর কানো ... ৬৮৫
অশ্বারোহণে...পার্শ্বচরগণ ... ৬৮৫
বিলাত-ফেরত কাফ্রী ডাক্তার ... ৬৮৬
সুবর্ণতীরের মৎস্যগন্ধারা, মাটীর রূপান্তর ... ৬৮৭
জলবাহী বালা, দাহোমিয়া ... ৬৮৮
ফান্তিবালার বেণীরচনা ... ৬৮৯
নাইগেরীয়ানদের মাছধরা জাল, বৃদ্ধ নিগ্রো ... ৬৮৯
বৃদ্ধের সম্মান ... ৬৮৯
হাউশাকুটীরের কঙ্কাল, আশান্তি কিশোরী ... ৬৯০
নাইগেরীয়ার চৌকিদারগণ ... ৬৯০
বেদের দোকান, কান্তি পরিবারের গৃহপ্রাঙ্গণ ... ৬৯১
জল নিয়ে ফিরছে, কানোর কাজীর বাড়ী ... ৬৯২

কুম্ভকার কুমারী, আকাবের সমাধিস্তূপ ...
ক্রেড়োবা সুন্দরীর কেশপ্রসাধন, জলের কল ...
আশান্তিরাজ প্রেম্পে ! পশ্চিম.....স্তম্ভ ...
নাইগেরীয়ার.....শোভা, সুবর্ণতীর.....এসেছে ...
বাস্কেট বল খেলায় ...
গৃহস্থালীতে. তেজারতি কারবারে, টাইপরাইটিংএ ...
বনরক্ষায়, বক্তৃতায়, অস্ত্র-চিকিৎসায়, অশ্বচালনায় ...
বর্ণ প্রলেপনে, হকি খেলায়, জজিয়তীতে ...
ইতিহাসে, পুলিশের কাজে, শুশ্রূষায় ...
পূর্ত্ত বিভাগে, দস্যু ব্যবসায়ে, উপন্যাস-রচনায় ...
ছায়াচিত্রে, কংগ্রেসে, প্রিয়া সচিব, কাব্যে ...
ধর্ম্মযাজক, টেনিস খেলায়, চিত্রশিল্পে ...
মমতায়, যৌনতত্ত্বে. এটর্ণীগিরিতে, স্বরাজ-নেতৃত্বে ...
কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়)
ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলে স্বেচ্ছাসেবকগণ ...
দারজিলিংয়ে ষ্টেপ-এসাইডের পথে মহাত্মা গান্ধী, সঙ্গে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ...
দারজিলিংয়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণ-হলে মহিলা-সমিতিতে মহাত্মা গান্ধী ...
দারজিলিংয়ে জন-সভায় মহাত্মা গান্ধী ...

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

৺প্যারীচরণ সরকার (প্রচ্ছদপট)
বুদ্ধের গৃহত্যাগ
বিদায়-ব্যথা
সত্যনারায়ণ
গুহকমিলন

কার্ত্তিক—১৩৩২

কুলবধূ ... ৭২৮
বর্ত্তমান লণ্ডনীগঞ্জ ... ৭৩৪
শন হইতে দড়ি ... ৭৩৫
দড়ি গুটাইবার যন্ত্র, সেগুন.....মূর্ত্তি ... ৭৩৬
রামনগর—কাশী, নেম্ ব্রুচ, দেড়শতাধিক...চৌকি ... ৭৩৭
চন্দন.....দ্রব্য ... ৭৩৮
চন্দন.....পত্র ... ৭৩৯
ঘোষপাড়ায়...দীক্ষা ... ৭৪০
রামপ্রসাদ সেন ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা ... ৭৪১
জলের কল, গালাবাড়ী ... ৭৪২
সেণ্টলুই গির্জা, ডাক্তারী যন্ত্রাদি ... ৭৪৩
শ্রীযুক্ত.....ছবি ... ৭৪৪
শিল্পী.....নির্ম্মিত ... ৭৪৫
বর্ত্তমান.....চেয়ার, চন্দন.....দৃশ্য ... ৭৪৬
পাঁচজন.....আরোহী ... ৭৫৮
তিনদরিয়া, হারাধনের তিনটী ছেলে ... ৭৫৯
কার্শিয়ংয়ের.....দৃশ্য, অদূরে তিস্তা নদী ... ৭৬০
নদীতে জল নাই, শিলাস্তূপ ... ৭৬১
সাঁওতালসুন্দরী ... ৭৬২
বিশ্বনাথের মন্দির ... ৭৮২
চড়াই পথ, অনন্তের আভাস ... ৭৮৩
তুঙ্গনাথ ... ৭৮৪
গুপ্তকাশীর পথে, নীহারস্ফোট ... ৭৮৪
গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ... ৭৮৬

৬৯৩ তুষারের দৃশ্য, বরফের নদী ...
৬৯৩ বঙ্গমহিলা কাণ্ডীমধ্যে ...
৬৯৪ বরফের উপরে বঙ্গমহিলা ...
৬৯৫ কেদারনাথ ...
৭০৬ মহাবলিপুরমের দৃশ্য ...
৭০৭ দেবগিরীশ্বর পাহাড়ে, তিরুকলড়িকুণ্ড্রম ...
৭০৮ দেবগিরীশ্বর মন্দির ...
৭০৯ মাচার উপর ঘর ...
৭১০ বিলাতী সাজে, জল্‌কে চল্ ...
৭১১ ঢেঁকিতে মকাই কুটছে, মকাই ক্ষেত ...
৭১২ বেকীভাই সর্দ্দারের দরকার, কাফ্রি তাঁতি ...
৭১৩ কাফ্রি ক'নে, মাপনরাজ ...
৭১৪ গুরুমশাই, শিরোভূষণ ...
৭১৭ সুবর্ণতীরবাসিনী তরুণী, আগ্‌ড়ায় গুরুমা ...
৭১৮ বুণ্টুকু.....দল, বুণ্টুকু.....পত্নী ...
কীণ্ডাম্পুর বারিবাহিনী, গামাম নিগ্রো বালা ...
৭১৯ ফাণ্ডিদের ছাদের সিঁড়ি ...
মন্দির-পথে ...
৭১৯ সংবাদ পাঠান ...
৭১৯ নূতন টেলিফোনের ডায়াল, তারের কথা ...
Commutator, Post ...
জন কার্টি, আলমারি, মুখভাব ...
বিমানপোত, হব্‌স সাহেব, ওয়াশিংটন সাহেব ...
পৃথিবীর.....আকর, জ্বালামুখীর জন্ম ...
ফ্রষ্ট সাহেব, ছায়াচিত্র, ক্যামেরার কারচুপি ...
চোখের কাজ, সহরের হাওয়া ...
কর্ণের ব্যায়াম, ক্ষুধায়, সন্তান পালনে, যুদ্ধের পরিণাম
জিঘাংসায়, যুদ্ধের প্রারম্ভ ...
যুদ্ধের আত্যন্ত অবস্থা ...
প্রাচীন চিত্রের নব কলেবর, সাপুড়ে ...

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

মনোমোহন ঘোষ (প্রচ্ছদপট)
গোদাবরী তীরে
ভরা-ভাদর মাস
মিলন
দিবাস্বপ্ন

অগ্রহায়ণ—১৩৩২

যোগী ...
গুরুবাবুর আড়ত ...
শ্রীবসন্তলাল মিত্র, বেণীমাধব পাল ...
শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র ...
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, শ্রীদীননাথ চন্দ্র ...
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ...
ইরাণী চিত্র ...
পুরাতন পট, কাপড়ের উপর চিত্র ...
পুরাতন কাঠের বেঞ্চি, দড়ির কারখানা ...
একখানি তৈল চিত্র ...
আর একখানি তৈলচিত্র, শ্রীনবগোপাল ঘোষ ...
মদ চোলাইয়ের যন্ত্র ...

দণ্ডী ... ৯৪৪
যশোরেশ্বরীর মাটীর প্রবেশদার ... ৯৪৫
বংশীপুর প্রাচীন দুর্গের মধ্যস্থ ভূমি ... ৯৪৭
ঈশ্বরীপুর—গঙ্গাদেবী ... ৯৪৮
ঈশ্বরীপুর—যশোরেশ্বরী ... ৯৪৯
বংশীপুর টেঙ্গা মস্‌জিদ ... ৯৫০
ঈশ্বরীপুর চণ্ডভৈরব ... ৯৫১
ঐ চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির ... ৯৫৩
বংশীপুর ভগ্ন হামাম ... ৯৫৪
কাগজ তৈয়ারীর যন্ত্র, কাগজ তৈয়ারী, কাগজ বাহির হওন ৯৭২
আবর্জ্জনা, বোস ও বার্গো, পৃথিবীর বক্ষের দিকে ... ৯৭৩
ঝম্পপ্রদান, গতি-নির্দ্দেশক, মানুষের গতি ... ৯৭৪
শূন্যের রেলগাড়ী, এঞ্জিন গাড়ী, উইলিয়াম বিবি সাহেব, জাহাজ ৯৭৫
পরীক্ষা, মৎস্য আহরণ ... ৯৭৬
পুল মটর, অটো টেলিফোন ... ৯৭৭
Oxyacetelene, Rope-shot, উদ্ধার করণ ... ৯৭৮
হরপ সাজান ... ৯৭৯
অদ্ভুত সাইকেল ... ৯৮০
কাফ্রী-সৈন্যদল ... ৯৯৬
মরুসাগর কাণ্ডারী, মান্দিষ্টো মহিলাবৃন্দ, শিল্লুকের কবরী ও শিরোভূষণ ... ৯৯৭
বীশারীণ রাখাল বালিকাদ্বয়, ফন্দাও যোদ্ধা, মুখপাত, তলা তোলা ... ৯৯৮
চুল বাঁধা, ন্যাম্ ন্যাম্ কুমারী, শেষ দৌড়া ... ৯৯৯
বীশারিণ শকট চালকের দল, কাঁপানো, গলা বাঁধা ... ১০০০
তালের পাটি, সুদানের শেখ ... ১০০১
কাফ্রী কৃষ্ণা, লাতুকার লাবণ্যময়ী ... ১০০২
কাফ্রী মুসলমান ফকির, বীশারীণ বেদের ছেলেমেয়েরা ১০০৩
চাউ, হাদেন্দোয়া ... ১০০৪
বীশারীণ যুবকদ্বয়, মান্দীর মৃত্তিকা-শিল্প, মাটি মেখে সাজানো, চেঁচে ফেলা ... ১০০৫
শিল্লুকা সুন্দরী, দেশী ও বিলাতী, তরুণী স্থায়ানী সুন্দরী ১০০৬
প্রস্তাবিত বাঙ্গলোর নক্‌সা ... ১০৩৭
৺সারদারঞ্জন রায় ... ১০৩৮
৺গোকুলচন্দ্র নাগ ... ১০৩৯

বহুবর্ণ চিত্র

রমেশচন্দ্র দত্ত (প্রচ্ছদ পট), কচ ও দেববালা
প্রতীক্ষা, শান্তি-নিকেতন, চাঁদিনী-রাতে

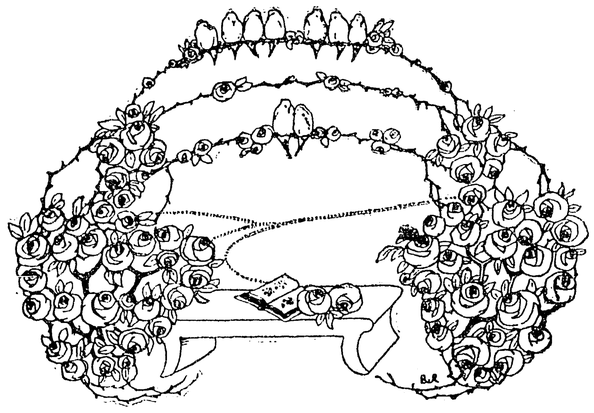

ভারতবর্ষ

অম্বপালী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

ভারতবর্ষ

আষাঢ়, ১৩৩২

প্রথম খণ্ড | ত্রয়োদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বর্ষ-প্রবেশ

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

অরুণ উদয়ে যথা নিশান্ত নলিনী
অপূর্ব্ব মাধুরী-মাখা,—করে ঢল ঢল !
হে বর্ষ ! প্রবেশে তব এ বিশ্ব-মোহিনী,
সৌরকরে মেঘসম রঞ্জিত উজ্জ্বল !
অতীত ফিরিয়া আসি বিচিত্র বর্ত্তনে,
সৃজিছে সৃষ্টির শত রহস্য গভীর !
আনে আশা মরীচিকা এ মরভবনে
মোহন-মূরতি-মঞ্জু-মধুর-মদির !
পীত রৌদ্র-দীপ্ত আম্র-মঞ্জরী-মুকুল
কদম্ব-করবী-কুঞ্জ—কল-কুহরণ,
তারকা, তপন, শশী—সন্ধ্যা, বনফুল,
শোভার নির্ঝর-ধারা করে বরিষণ !
তাই তব আগমনে প্রফুল্ল অন্তর,
হে চির-তরুণ তৃষ্য শাশ্বত সুন্দর !

বিশ্ব-মানসে বৈষ্ণব কাব্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ, বি-সী-এস্

(১)

বিশ্ববাসীর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যের যোগ কোথায় ?

বিশ্বে মানুষ তো আছেই,—তা' ছাড়া অপর প্রাণী-জগৎ, বাহ্য প্রকৃতি, আকাশ, বায়ু,—সমস্ত লইয়াই যে বিশ্ব-প্রকৃতি !

কাব্যের ভিত্তি 'ভাব'।

বাহ্য প্রকৃতির দিক দিয়া দেখিলে বৃক্ষ-লতা, আকাশ-বায়ু সমস্তই যেন একটা ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাণী-জগতের দিক দৃষ্টিপাত করিলে,—দুইটী পাখী যখন একত্র বসিয়া আছে, গাভী যখন বৎসকে নিকটে পাইয়া তাহার দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া আছে, তখন ভাবের বন্ধন তাহাদের মধ্যে কতদূর তা' বুঝিতে পারা যায়। তাহারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কাব্যের 'ভাব',—তাহারি নির্ব্বাক্ অনুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে,—নির্ব্বাক্ অবস্থায়ই তাহা অনুভব করিতেছে। মানুষের মধ্যে এই ভাবের উপলব্ধি-ক্ষমতা না থাকিলে তাহা মানুষের চোখে পড়িতই না।

মানুষ বাক্য দ্বারা ভাবকে প্রকাশ করিতে সমর্থ। সেই অভিব্যক্তিতে কোথাও বা ভাব-সঙ্কেত বা ভাবোচ্ছ্বাস, কোথাও বা ভাব-বিহ্বলতা বা ভাবোন্মাদ। কাব্যের যাঁরা নায়ক-নায়িকা, কাব্যের যিনি রচয়িতা, কাব্যের যিনি অনুভূতি-প্রয়াসী তাঁর কাছে তা'তে আনন্দ। কাব্যের জগৎ সেই আনন্দে অনুপ্রাণিত,—সেই আনন্দের স্বচ্ছন্দ-গতিত্ব বাংলার বৈষ্ণব কাব্যে অভিব্যক্ত।

বৈষ্ণব কাব্যের 'আনন্দে'ও আনন্দ,—'বেদনায়ও' আনন্দ। 'আনন্দে' তো আনন্দ আছেই ; তা' ছাড়া ক্লেশ, পরাজয়, বিষাদ, বৈরাগ্য, আত্ম-সমর্পণ,—এতে এ-সমস্তই এক 'আনন্দের' সুরে সঞ্জীবিত। এই অভিনব 'আনন্দের' অনুভূতিতেই বৈষ্ণব কাব্যের ভাবানুভূতি,—তা'র উপলব্ধির ক্ষমতা না থাকিলে বৈষ্ণব কাব্যের স্বরূপ অনুভব করা যায় না।

এই বৈষ্ণব কাব্য বাংলার আত্ম-বিবৃতির একটা দিক, বিশ্বের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ কোথায়, তা ভাবিতে গেলে, গোড়ায় কবির কথাই মনে পড়ে,—

"আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন বিরাগ-ভরা বিবেকে !"

[রবীন্দ্রনাথ]

(২)

'বিশ্ব-ভারতীর' কর্ম্ম-ব্রত বিশ্লেষণ করিবার সময় আচার্য্য-কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"যাহা বাস্তবিক বিশ্বের সম্পদ্, তাহা বিশ্ববাসীর আত্ম-ব্যক্তিত্বেই তাহার অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া থাকে।" (১)

পৃথিবীর দ্বিধা-প্রধাবিনী গতির মত মানুষের জীবন সর্ব্বদাই দুইটী গতির শক্তি-সামঞ্জস্যের মধ্যে চালিত,—একটীর কেন্দ্র তার নিজ ব্যক্তিত্বে ; অপরটীর কেন্দ্র এক কল্পিত মানব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে। মানব-ব্যক্তিত্বে যে 'সত্য' নিহিত আছে তাহাতে, আর বিশ্ব-মানবের অন্তরে যে নিত্য-'সত্য' বিরাজমান, তাহাতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নাই।—তাই, এক হিসাবে, বিশ্বের ব্যক্তিগত মানব তার অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে বিশ্বমানবের আভ্যন্তরীণ সত্যের জ্ঞাতিত্ব, একবংশীয়ত্ব, লইয়া স্বভাবতঃই যেন বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিতে উন্মুখ। (২)

কিন্তু একটা ব্যক্তিত্বের দাবীতে অপরকে আহ্বান করিতে হইলে সেই ব্যক্তিত্বে স্বকীয় সত্তার অনুভূতি চাই,—আত্মদর্শন চাই। অপরের নিকট নিজেকে জ্ঞাপন করিতে

(১) The true *universal* finds its own manifestation in the *individual*." Viswa-bharati Quarterly, January, 1924 (Magh 1330), page 387.

(২) "Viswa-bharati" is an "invitation to the world,"—an "offer of sacrifice to the highest Truth of Man." Viswa-bharati Quarterly, April, 1923 (Vaisakh 1330), page 4.

হইলে নিজেকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া চাই। মানুষ 'গ্রহণ'-তো করেই,—তার 'প্রদানে'র ক্ষমতাও চাই,—আর এই 'প্রদানের' ক্ষমতাই তার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

বিশ্ব-কেন্দ্রের বাণী শ্রবণ করিতে হইবে,—তা'তে আত্মোন্নতির মন্ত্র-সিদ্ধির সহায়তা হইবে ; কিন্তু শ্রবণের ইন্দ্রিয় না থাকিলে তা' শোনা যাইবে না,—তা'তে মানব-মানসে কোন রেখাই আঁকিবে না। এরূপ স্থলে 'প্রদানের' ক্ষমতা দূরে থাকুক, 'গ্রহণের' ক্ষমতারই অভাব।

এই শ্রবণের ক্ষমতা, গ্রহণ-প্রদানের সামর্থ্য, আত্ম-প্রকাশের শক্তি,—মানবের সম্পদ্। ইহার অঙ্কুর মানব-ব্যক্তিত্বে নিহিত আছে। এই ব্যক্তিত্ব অনুসারেই আমাদের উপনিষদের 'ব্রহ্মত্ব',—"তত্ত্বমসি,"—"সত্যম্, শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্।"

'সত্য' নিজেই সত্য,—তা'তে আবার শান্তি, মঙ্গল, অভিন্নতা !

এই 'অভিন্নতা'-বোধেই মানবে-মানবে মিলন-স্পৃহা, আর প্রেমে সেই মিলনের সম্ভবতা। প্রেমেই অপরের সঙ্গে নিকট-সংস্পর্শ, প্রেমেই 'একে'র পক্ষে 'সমস্তে'র মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার,—প্রেমই বিশ্ব-আত্মার দ্বার উদ্ঘাটনের উপায়।

এই প্রেমের অনুসরণে আবার অবস্থাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের আত্ম-দর্শন অথবা আত্ম-দ্রষ্টার ব্যক্তিত্ব নিতান্ত আত্ম-হারা। এই আত্ম-হারা প্রেমই বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শ।

(৩)

যাহা 'সমস্ত',—যে জিনিষ সৃষ্টি-মণ্ডলীতে 'আছে', যাহা—'সৎ', 'অস্তি', (৩) 'স্থিতি'-বিশিষ্ট,—তাহা প্রেম-স্পর্শে, অন্তরের আহ্বানে সাড়া দেয়। যাহা 'নাই', 'নাস্তি', (৪)—তাহা কিছুতেই সাড়া দেয় না ; অথবা যা' প্রেম-স্পর্শে বা আন্তরিক আহ্বানে সারা দেয় না তাকে বিচার-মীমাংসায় "নাই", বা "নাস্তি", বা তাহারি কাছা-কাছি কোনো জিনিষ বলা যাইতে পারে।

এই অনুভূতির প্রভাবে সৃষ্টির প্রভাত হইতে সৃষ্ট মানব 'মৃত' এবং 'অ-মৃত'কে বিভিন্ন করিয়া দেখিলেন,—'মৃতের' অন্তরালে 'অ-মৃতে'র সন্ধানে যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বিভিন্ন জাতি তাঁহাদের আত্ম-বিবৃতিতে এই তথ্যের অনুশীলন-স্পৃহা জ্ঞাপন করিলেন। স্রষ্টা ভগবান্ যখন "অস্তি" তখন প্রেমের প্রার্থনায় তাঁহাকে স্পর্শ করা যাইবে,—তিনি 'সাড়া' দিবেন,—এই জ্ঞান মানুষের মনে আসিল ; বিভিন্ন প্রণালীতে এই বাসনা আত্ম-বিকাশ করিল ; বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতে ভগবৎ-আরাধনার ব্যবস্থা হইল।

মানবের "অস্তিত্বে" চিন্তা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, পরার্থপরতা, আত্মবিকাশের ব্যাকুলতা মানবের একটা সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিকত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। যাহা ভৌতিক দৃষ্টিতে "অস্তি" তাই সমস্ত "অস্তিত্ব"কে সমাধা করে নাই,—মৃত্যুর অন্তরালে মানবাত্মার "অমৃতত্ব"-বোধ মানব-হৃদয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত।

এই আধ্যাত্মিকত্ব গীতায় গীত হইয়াছে,—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তি,—ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

"তথাগত" ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সমস্ত মতের মধ্যে সর্ব্বজীবে সমদর্শন মত জ্ঞাপন করিলেন।

খ্রীষ্ট বলিলেন, (৫)—"মানুষ কেবলমাত্র পার্থিব আহার্য্য লইয়াই জীবন ধারণ করে না।"

মহম্মদ বলিলেন,—"স্বর্গ ও মর্ত্ত্য জগদীশ্বরেরি। তাঁহাতেই সমস্ত জিনিষ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" (৬)

—বিশ্বের বিভিন্ন দিক হইতে একই অধ্যাত্ম-চিন্তার ধারা,—

"তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা !" [বিদ্যাপতি]

(৪)

প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড়ীয় ও আর্য্য জাতির চিন্তা-প্রণালীতে, চীন ও কোরিয়ায়, ফিনীসিয়া ও কার্থেজে, মিশর ও বেবিলনে, গ্রীস ও রোমে, পারস্য ও আরবে,—

(৩) Latin "*est*".

(৪) Latin "*non-est*".

(৫) "Man shall not live by bread alone". St. Luke, 4—4.

(৬) "God's is the Empire of the Heavens and the Earth,—and to Him must all things return." S. Lane-Poole. "Speeches etc" of Mohamed, Introduction, Golden Treasury Series. page lii.

এই আত্ম-বিবৃতির প্রচেষ্টা কত দিক দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবশ্যক নাই।

তথাপি বিশ্বমানবের মনোবৃত্তির সহিত কোথায় আমাদের স্পর্শ-স্থল তাহাই দেখাইতে সামান্য দুই-একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বেই একটা সময় ছিল, যখন ভগবৎ-চিন্তার দিক দিয়া শাশ্বত সৌন্দর্য্যের একটা নিবিড় অনুভূতি মানবের মধ্যে ভাবাবেশ বা ভাবোন্মাদনায় তাহাকে আত্ম-প্রকাশিত করিতেছিল।

যাহা অপ্রকাশিত হইয়াও প্রকাশিত, প্রকাশিত হইয়াও অপ্রকাশিত,—তাহাই লইয়া একটা চিন্তা-প্রবণতা মানুষকে যে এক আনন্দপ্রদ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে বিলীন করিতে পারে, ইহা মানব-অন্তঃকরণের একটী চিরন্তন ধর্ম্মের মধ্যে।

পারস্য ও আরবের "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌" [mysticism] ও পারসীয় "সুফিজ্‌ম" [Sufism]-এর বিষয় চিন্তা করিলে এই শ্রেণীর আত্মবিকাশ-পদ্ধতির কথা মনে পড়িবে।

বেদান্ত-সারের "তত্ত্বমসি"-মতের ও বৌদ্ধ নির্ব্বাণ-তত্ত্বের সহিত পারসীয় ও আরবীয় "মিষ্টিসিজ্‌ম্‌"-এর সম্বন্ধ, ও এই সূত্রে গ্রীসীয় "নিও-প্লেটোনিক" [Neo-Platonic] মত কি ভাবে সংশ্লিষ্ট,—এই বিষয় "ইস্‌লামীয় সভ্যতা"-সম্বন্ধে বিখ্যাত ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত এস্‌-খোদাবক্স্‌ "জারমান্‌" পণ্ডিত ভঙ ক্রেঙারের (৭) [Von Kremer's] গ্রন্থ হইতে সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন।

"নিও-প্লেটোনিষ্ট্‌"গণ [Neo-Platonists] খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী মধ্যে পারস্য ও আরব দেশে উপস্থিত হইলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঐ সব দেশে ভগবানের "প্রিয়ত্ব"-উপলব্ধি বিদ্যমান ছিল।

"নিও-প্লেটোনিষ্ট"গণ স্রষ্টা ভগবানকে "সর্ব্বমঙ্গল" [Supreme Good] রূপে মানিতেন, (৮)—তাঁহাদের মতে ভগবান্‌ নিজেই নিজেতে অস্তিত্বশীল [Self-existent] ; কিন্তু পারস্যদেশের মানব-অন্তঃকরণে এই সম্বন্ধীয় চিন্তায় যে "প্রিয়ের" জন্য আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান্‌ ছিল, তাহা সে দেশের সাহিত্যে এক অভিনব ধারা সৃজন করিল,—উহা পারসীয় "সুফিজ্‌ম" বলিয়া পরিচিত। এই পারসীয় সুফি-মতকে "তাস্‌-ওয়াফ্‌" [tasawwuf] বলে। (৯)

"নিও-প্লেটোনিষ্ট্‌-মতে ঈশ্বর সর্ব্বগুণ-সমষ্টি (abstract),—সুফির নিকট ঈশ্বর নিতান্তই "প্রিয়"—ব্যক্তি-গুণবিশিষ্ট, প্রেমাস্পদ (essentially personal) । এই ব্যক্তিগুণবিশিষ্ট বাঞ্ছিতের ধ্যানে (১০) সুফি কবি "আত্ম-

(৭) Translation of Von Kremer's Historical Studies (Culturges chichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams) in 'History of Islamic Civilisation' by Mr. S. Khoda Buksh. M. A., B. C. L. (1905).

"We find mentioned in this work, 'the Vedanta-Sara,' the spiritual exercise which consists of the frequent repitition of a certain formula. e. g. *Tat tvam asi*,—That Thou art".....'An expresssion which repeatedly occurs with the Vedanta School is—'He who knows the Highest Brahma becomes himself Brahma'...This extrenal resemblance between the two systems'—those of the Vedanta and the Arabian and Persian mysticism,—obtains a further confirmation by their remarkable internal similarity. Both are pantheistic, and have as their subject the union of the individual with God,—with Brahma".....'We are constrained to to ascribe to Indian influences the rise of Muslim mysticism." Page 113-114.

The Platonic philosophy, notably in its Neo-Platonic form, also counted adherents among the Arabs." Page 107.

"Budhistic views partly transformed that Muslim mysticism which had for its source the Vedantic School." Page 115.

"The works of the Greek thinkers were brought within the reach of the Arabs through the medium of Arabic Translations." Page 117.

(৮) "The Neo-Platonists believed in the Supreme Good as the Source of all things." 'The Persian Mystics' by F. Hadland Davis, Wisdom of the East Series, pages 12-13.

(৯) Pers. "Suf"=Wool.

(১০) "Sufism or mystic Philosophy".....'finds expression in various order of Dervishes" and "owes its origin mainly to the School of Indian Philosophy, which is known as that of the Vedanta School." Page 108. Khoda Buksh "Islam."

"Budhism and the doctrine of the Vedanta School introduced the pantheistic conception of the world, which notably in Eastern countries,—in India, Persia, and even Asia minor,—obtained constantly increasing popularity and called into being numerous orders of Dervishes." Page 117. Khoda Buksh "Islam."

"With the growth of the *ecstatic* and *rapturous* tendencies numerous orders of Dervishes sprang up in Islam." Page 108. Khoda Buksh "Islam."

(চিন্তাশীল সাহিত্যিক চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার "বঙ্গবাণী" গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিদিগের "প্রেমের" আদর্শ ও পারসীক "সুফি" মতে "আত্মার" সম্মিলন প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। "বঙ্গবাণী" ১৪৬ পৃঃ)

(১১) দিওয়ানি শম্‌সি তাব্রিজ্‌ (Divani Shamsi Tabriz) বলিতেছেন :—

"I am silent. Speak Thou, O, Soul of Soul.
From desire of whose Face every atom grew
. . . articulate."

(Translation from Persian, by F. Hadland Davis).

(১২) "What is this nation (Arabian),—which leapt up before the world in sudden and amazing fortune ?"..."It was from the Desert that Arab poetry was to come." The long caravan-marches...taught the Arab to sing rhymes." History of Arabic Literature by Clement Huart, Chapter I.

হারা" হইতেন,—ভাবাবেশ [Ecstasy] এই আত্ম-বিস্মৃতি বিবৃতির একটা দিক। "নিও-প্লেটোনিষ্ট"গণও এই ভাবাবেশ-মত [Doctrine of Ecstasy] অনুসরণ করেন,—কিন্তু পারসীয় "সুফিজ্‌ম্‌" তাহার স্বকীয়ত্বকে স্বদেশের সৌন্দর্য্য-সম্ভারেই স্থির রাখিয়াছেন। (১১)

প্রাচীন আরবীয় সাহিত্য মরুপ্রান্তর হইতে এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা লইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল,—তাহার মধ্যে প্রায়ই থাকিত এক "প্রেমাস্পদের" আদর্শ [Image of the Best Beloved] (১২)। এই সাহিত্যেও "নিও-প্লেটোনিক" [Ishraqui (১৩)]-মতের সহিত আংশিক পার্থক্য রাখিয়াই ভগবৎ-"প্রেমের" আদর্শ প্রকাশিত হইল (১৪)—আর এই আদর্শের অনুসরণে "ভাবাবেশ"-মত [Doctrine of Ecstasy] উচ্চ স্থান পাইল।

জোরোস্তারের (Zoroasters) আত্ম-জ্ঞান-মত [Doctrine of Light or Illumination] এবং "মানিকীয়" [Manichæans] দের আত্ম-তত্ত্ব এই উভয়কে লইয়া "ইশ্‌রাকি" [Ishraqui]-মতের আংশিক ধারা-প্রভাব আরবীয় চিন্তাস্রোতের সহিত মিলিত হইল ; তখন আরবের "নাক্‌শবন্দী" [Naqshbondi] দরবেশগণ "যিকির" [Dhikr]-নামক "কীর্ত্তন" প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন।

বৈষ্ণব কাব্যেরই অনুমোদিত ধারার মত এই "কীর্ত্তন"-প্রথা ভগবানকে "প্রিয়তম-নিকটতম" করিয়া লইতেছে। দার্শনিকতত্ত্বের "পুরুষ" ও "প্রকৃতি",—মানব-সত্তার চিরন্তন "পুরুষ" ও "স্ত্রী",—সাহিত্যের রসে, কাব্যের রসে সম্মিলিত ;—"ধর্ম্ম ও কবিতা, কবি ও ভক্ত পরস্পরের তত্ত্বে ওতপ্রোত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরূপ রসানন্দে বিলসিত।" * (১৫)

"কীর্ত্তন" কাহিনী সূত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদনার কথা মনে পড়ে,—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥" [বিদ্যাপতি]
(৫)

এক হিসাবে "অধ্যাত্মতঃ সকল কবিই বৈষ্ণব কবি",—সেই কাব্যের সুরে "মানবাত্মা তীব্র, উচ্চ, উচ্ছ্বসিত ঋজুকণ্ঠে আপনার মাহাত্ম্য ও বিশ্বমানবের একত্ব ঘোষণা করিতেছে।" (১৬)

(১৩) "The Platonic school is known among the Orientals (Arabs) as 'Ishraqui'." Khoda Buksh, "Islam, page 107.

(১৪) "Pure, un-mixed Essence of God,—most High." Khoda Buxsh "Islam." pag 109.

"Dhikr"—"by which the Naqshbandi Dervishes believe they attain the greatest ecstatic raptures." Khoda Buksh, "Islam", page 109.

(১৫) (১৬) শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন, "বঙ্গবাণী [২২-২৭ পৃঃ]

উত্তরকালের আরব সাহিত্যে "ইবন্ তুফাইল" [Ibn Tufail, (১৭) ১১৮৫ খ্রীঃ] নামক গ্রন্থকার "হাই ইবন্ ইয়াক্‌ধান" [Hayy Ibn Yokdhan]-শীর্ষক "আত্মার উন্মেষ" [Awakening of the Soul] বিষয়ে এক দার্শনিক উপন্যাস লিখিলেন। এক পরিত্যক্ত মানব-শিশু একটী জনহীন অরণ্যময় দ্বীপে বৎস-হারা হরিণী কর্ত্তৃক পশুপক্ষীদিগের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া পরিশেষে কি-উপায়ে আত্মদর্শন ক্ষমতা বলেই মানব-আত্মার সমস্ত জ্ঞান-সম্পদ্ লাভ করিল, তাহাই এই পুস্তকের বিবৃত বিষয়।

কোরাণ-সাহিত্যের উক্তি,—"তিনিই স্থিতি, তিনিই সুন্দর, তিনি তিনিই" [He is the Existence, He is Beauty, He is He],—বেদান্ত-সারের "তত্ত্বমসি"-জ্ঞান বালক-হৃদয়ে উন্মেষিত হইল।

এই বালকের কাছে মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলই এক বিশ্বজীবনের বিকাশ মাত্র।

"কিয়ে মানুষ-পশু- পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন-পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥" [বিদ্যাপতি]

(৬)

সাধারণ পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এক-একটা অধ্যাত্ম-বোধের ভাব আশ্চর্য্য উপায়ে প্রকাশিত।

খাসি-রমণী বিরহ-কাতরা,—তাঁহার যেন মনে হইতেছে প্রিয়-সঙ্গ ব্যতীত কি করিয়া জীবন কাটিবে! যেন বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

"কি কহসি, কি পুছসি,—শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ-দিন-রজনী!" [বিদ্যাপতি],

কিন্তু খাসি-রমণী শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবিতেছিলেন কি না জানি না,—তবে তাঁহার মন একেবারে মাটীর পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে উড়িতেই চাহিতেছে,— (১৮)

"প্রাণ মোর গাহে তালে-তালে,—
যাব আমি, যাব আমি,—দূর গগনেতে,
যাব আমি মেঘের আড়ালে'!"

এক ত্রিপুর (Tipra) রমণী,—নিতান্তই পর্ব্বত-বাসিনী,—তাঁহার প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা নাই, তাই বিরহ-কাতরা। তিনি বিধাতাকে দোষ দিতেছেন,—যেন শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

"সজল নয়ান করি পিয়া-পথ হেরি-হেরি
তিল এক হয় যুগ-চারি।
বিহি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি॥" [বিদ্যাপতি]

ত্রিপুর বালিকা (১৯) গাহিতেছেন,—

"বন্য বরাহী অবাধে জলেতে নামিয়া সাঁতার কাটে;
গৃহের বিড়ালী,—জীবন থাকিতে গেল না জলের ঘাটে।
বন-তরু-লতা বসন্ত আসিলে নূতন পাতায় সাজে,
গৃহেতে লাগানো দারুখণ্ড কভু জাগে না ঘরের মাঝে।
* * * * * * * *
আমি যারে চাই, তার ভালে যবে বিধাতা 'লেখন' লেখে,
নিঠুর বিধাতা লেখে-নি সে 'লেখা' মোর কথা মনে রেখে।

(১৭) "The Awakening of the Soul",—Story of Hayy Ibn Yokdhan, a philosophical Romance by Ibn Tufail, Secretary at Granada (died in Morocco 1185 A.D.) Published by the Oxford University Press in "Philosophus Autodidactus," Edited by Edward Pococke, 1671 A. D. Translated from Arabic by Dr. Paul Bronnle. (Cranmer Byng and Kapadia's "Wisdom of the East" Edition 1907)

(১৮) খাসি ভাষায় (উহারা রোমান অক্ষরে লেখে) সঙ্গীতাংশটী এইরূপ :—

"To yathuh ki mynsim jong nga
Shano phynsa her,—
Nga'n sa her, nga'n sa her shah lyndit ki lyoh."

(১৯) মুল তিপ্‌রা সঙ্গীতটীর [তিপ্‌রা ভাষায় বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়] কিয়দংশ এইরূপ :—

"বলং অআন্না তুকুবাই লাখা
আমিংসা তুকুলিয়া।
বলংনি খুফাং রতম্ বাই লাখা,
ফাকলাই রতম্ লিয়া"

* * * * * *
বন সুইফুর আনি সুইলিয়া ববাই আংনানি ককুগিয়া।

[বঙ্গানুবাদ, "মানসী ও মর্ম্মবাণী," বৈশাখ ১৩৩১]

ভুলি মোর নাম, লিখে ফেলে দিল অদৃষ্টবারতা তার,
তাই মোর সাথে তাহার মিলন হবার নহেকো আর॥

ত্রিপুর বালিকার দোষারোপ বিধাতার উপর,—তাঁর "প্রিয়ের" অদৃষ্টলিপি লিখিবার সময় বিধাতা একেবারেই যখন বালিকার কথা ভাবেন নাই তখন তাঁহাদের মিলনের আর কোন সম্ভাবনা নাই! তাই বালিকা ক্ষোভ করিয়া বলিতেছেন,—তাঁহার বড় দুঃখ রহিল তিনি আগেই বিধাতার হাতখানি কেন কাটিয়া রাখেন নাই :—

"ক্ষোভ,—বিধাতার হাত খানি আগে কাটিয়া রাখিনি আমি!"

(৭)

বিশ্বমানবের অধ্যাত্ম-বোধ কত ভাবেই প্রকাশিত!

খ্রীষ্টীয় শকাব্দার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চীন-দেশের আত্ম-চিন্তার বিবরণ তাহার সাহিত্যে প্রতিভাত।

সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কংফুসী [Confucius] ও লাও-চু [Lao Tsu]-র মতাবলী,—যাহাকে "তাও" [Tao, Taoism] বলে, তাহা,—মানবের মনকে এক আধ্যাত্মিক জাগরণে সজীব রাখিয়াছিল। ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মরীতি তাহাতে এতদূর ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

চীনদেশীয়ের নিকট লাও-চু [Lao Tsu]—র "তাও" [Tao] এক আশ্চর্য্য শক্তি,—সে যে কি তাহার কোন সংজ্ঞা নাই, সে একটী 'ভাব (idea) যাহা মানুষের এ জীবনের সহিত পূর্ব্বাপর জীবনের এক অচিন্তনীয় সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিতেছে। "তাও" প্রধান, মহৎ। "মানুষ পৃথিবীর নিকট তাহার আইন গ্রহণ করিতেছে, পৃথিবী স্বর্গের নিকট, স্বর্গ 'তাও'-এর নিকট,—কিন্তু 'তাও'এর যে বিধান, তাহা নিজেই নিজেতে বিকশিত।" (২০)

(২০) Tao is great...man takes his law from the Earth, the Earth takes its law from Heaven; Heaven takes its law from Tao; but the law of Tao is its own spontaneity." 'The sayings of Lao Tsu', Lionel Giles. (Wisdom of the East). page 21.

কংফুসীর পূর্ব্ব-পুরুষ-উপাসনাবাদ [Ancestor Worship] (২১) মৃত্যুর অতীত মানবাত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এই পূর্ব্ব-পুরুষ-উপাসনাবাদ [ancestor worship] বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই জাপানে "শিন্তো" [Shinto] নামক এক আধ্যাত্মিক-মত রূপে নিজ প্রাদুর্ভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই "শিন্তোও জাপানীর নিকট একটী 'ভাব' (idea), (২২)—ইহারও কোন সংজ্ঞা নাই।

এই মত অনুসারে প্রত্যেক জাপানবাসীর বিশ্বাস, তাহাদের মৃত এবং জীবিত আত্মীয়গণ সর্ব্বদাই এক সঙ্গে রহিয়াছেন। এই অধ্যাত্ম-বোধ মানবকে জানাইয়া দিতেছে যে, অতীত সমস্ত কাল (Past Eternity) আর

(২১) "Worship of Ancestors." "The like responds to the like...When the descendants in sincerity and concentration of spirit beckon the ancestral spirit to return to the house, on such occasions the scattered spirit is capable of assembling again and returning." The Confucian God Idea, py Chinese thinker Y.Y. Tsu in "China of To-day" (page 79-80).

(২২) "There is self-contentment in Shinto. How can it be otherwise when Death itself is conceived of as Deification, and when Nature,—all its destructive forces not excluded,—is thought to be working for us?

That the dead are alive somehow and somewhere is the strongest faith of our people, and as long as science does not prove such a belief to be contrary to its discoveries and teachings, Ancestor-Worship is not deemed to be a superstition.....

Shinto is a religion without a founder, without theology, and without scriptures.....we speak of the eighty myrird deities of the Shinto pantheon...The Shinto shrine is a repository of every sacred memory." The Japanese Nation by Inazo Nitobe, Japanese Exchange Professor in America (1911-12), Lectureon Religious Beliefs, page 125-131. ('Story of Nations' Series.)

ভবিষ্যৎ অনন্তকাল (Future Eternity) এই পার্থিব জীবনের সঙ্গেই এক সূত্রে গ্রথিত। "শিন্তো"-র মত অনুসারে কোনো-কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক জাপানী এক ক্ষুদ্র দর্পণ-খণ্ডে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তখনই সরিয়া যান,—পার্থিব জীবনের নিতান্ত অলীকত্ব যাহাতে সর্ব্বদাই মনে থাকে, এই উদ্দেশ্য।

বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত-শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন,—আমরা সকল সময় তাহা জানিতেও পারি না। অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তামাদের কার্য্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না,—জানিতেই পারি না।" (২৩)

বিশ্বমানবের জগৎ নিতান্তই মানবাত্মার জগৎ। তাহার ভৌতিক অবস্থিতির বাহিরে সীমাহীন অধ্যাত্ম-অবস্থিতি। কাব্যের জগৎ,—বৈষ্ণবের জগৎ এই "ভৌতিক" ও "আধ্যাত্মিক" লইয়া, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চিরন্তন সম্বন্ধ লইয়া। বাহ্য পৃথিবীকে লইয়া এই "জগতের" ব্যবহার তো আছেই,—কিন্তু ইহা বাহ্য পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহার বিস্তৃতি অতীত ও ভবিষ্যতে অনন্ত-প্রসারিত; ইহাতে "ভৌতিক" ও "আধ্যাত্মিক" অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; একের সৌন্দর্য্য, ভাব-মাধুর্য্য অপরের অস্তিত্বে সার্থকতাপূর্ণ।

এই অনুভূতি যেখানে আছে সেখানে বিশ্বমানবের জ্ঞাতিত্ব।

"O Light, O glory of the human race!
What stream is this which here unfolds itself
From out One Source, and from itself
withdraws" (২৪)

সেই বৈষ্ণব কাব্যের কথা,—"তোঁহে জনমি পুন!"

(৮)

ইংরেজকবি ওয়ার্ডওয়ার্থ [Wordsworth] বলিলেন,—সেই একই সুর সে ধ্বনিতে,—

"Trailing clouds of Glory do we come
From God who is our Home"[Immortality Ode].

শেলি [Shelley] বলিতেছেন,—"Our sweetest thoughts are those that tell of saddest things" [Sky Lark]। এ যেন শ্রীরাধিকারই অনুভূতির মত,—বেদনায় যেন আনন্দ, আনন্দে যেন বেদনা! যেন রাধা ভাবিতেছেন,—

"পিরীতি রতন করিব যতন পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী পরাণ বধে আমার॥" (২৫)
[চণ্ডীদাস]

বৈষ্ণবের সুরেই যেন কীটস্ [Keats] বলিতেছেন 'যাহা সুন্দর তাহাতে চিরন্তন আনন্দ,—তাহাতে চিরন্তন সত্য',—আনন্দ ও সত্য ছাড়া 'সুন্দর' সুন্দরই নয়ঃ

"A thing of Beauty is a Joy for ever."
"Beauty is Truth,—Truth Beauty."

যেন বৈষ্ণবেরই সুরে এই কবি গাহিতেছেন,—ক্লেশের ভিতর কি শান্তি,—বেদনার অনুভূতিতে কত আনন্দঃ

"O sorrow,
Why dost thou borrow
Heart's lightness from the merriment
of May!"
[Endymion]

আবার বৈষ্ণবেরই সুরে যেন টেনিসন্ [Tennyson] দেখাইতেছেন নৈরাশ্যের মধ্যেও কত আনন্দ ["divine despair"], প্রিয়জনের পার্থিব অবসানের পরও পূর্ব্বানুভূত প্রণয়মিলনস্মৃতি কত মধুরঃ

"Sweet as remembered kisses after death."
["Tears, Idle Tears"]

আবার এই কবি (Tennyson) "প্রণয়" এবং "পার্থিব দেহাবসান"কে যেন বৈষ্ণবের শ্রীরাধিকার অনুভূতিতেই বিচার করিতেছেন,—

(২৩) সমালোচনা,—৩৬ পৃঃ

(২৪) Dante, *The Divine Comedy*, Purgatorio *XXXIII*, l. 115 etc. (Longfellow's Edition).

(২৫) বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ, ইহা "স্বর্গীয় অশ্রু ও নির্ম্মল স্বার্থত্যাগের রাজ্য"। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য", ৬ষ্ঠ অঃ, "পদাবলী-সাহিত্য।"

"I fain would follow Love if that conld be,
I needs must follow Death, who calls for me.
Calls! and I follow! I follow,—let me die."
["Sweet is True Love" etc.]

যেন বৃন্দাবনের বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকা প্রিয়ের অপেক্ষায় এত দিন আত্মজীবন লইয়া বসিয়া থাকিয়াও অবশেষে নিয়তির আহ্বানে মৃত্যুকেই আত্মদান করিতেছেন,—

"হিয়া" মেরি বোলত, "চলহ প্রণয়-সাথ,"—
অব নাহি হোয়ত সোহি।
"নিয়তি" ডাকত আজু,—চলনু "মরণ" সাথ
হাম্‌কা লো ডাকত ওহি॥
ডাকত, তেঁহি অব চলনু।
আহ মরণ হামারি! (২৬)

জীবন আর মৃত্যুর এই চিরন্তন খেলা,—পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অথচ মনোরম ক্রীড়া-নীড়ের চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর অনিবার্য্য আবেষ্টন, 'সান্ত' আর 'অনন্তের' এই মোহিনী লীলার মধ্যে তথাপি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির প্রাণস্পর্শী মাধুর্য্য,—রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন,—

"এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী'পরে মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী, এই সব দেখাশোনা, ক্ষণিকের মেলা,—
* * * * *
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙ্গে এ খেলার পুরী;
ক্ষণেক বিলম্ব কর,—আমার দুদিন হ'তে করিয়োনা চুরি।(২৭)

(৯)

এই যে মানবের আকাঙ্ক্ষা, এ-জন্ম ও-জন্ম লইয়া আলোড়ন; এই যে আদর্শ-চিন্তা, আদর্শের দিকে চিত্তের গতি, আদর্শের অপ্রাপ্তিতে বেদনা; এই যে অধ্যাত্ম-বোধ;—এই সার্ব্বজনীন চিত্ত-বৃত্তি বিশ্বের মানবে-মানবে জ্ঞাতিত্ব সংজ্ঞাপক করিতেছে, এই চিত্ত-বৃত্তির আত্ম-বিবৃতির মধ্যে সাহিত্য,—কাব্য-সাহিত্য একটী দিক। এই কাব্য-সাহিত্য আবার অবস্থাবিশেষে নানা শ্রেণীর,—যেমন খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি।

গীতিকাব্য দেশ-কালানুসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—মূলতঃ গীতিকাব্য (lyrical poetry) সঙ্গীতেই গীত হইত।

বাংলার গীতিকাব্য বৈষ্ণবের সুরে তাহার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে 'আত্মহারা' প্রেমের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে প্রিয়ের জন্য, বাঞ্ছিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেশ-বিদেশে মানুষকে আপ্লুত করিয়াছে, যে ভাবাবেশ বা ভাব-বিহ্বলতা মানব-হৃদয়ের আনন্দ-মণ্ডিত বেদনা বা বেদনা-ক্লিষ্ট আনন্দের পরিচায়ক, যে আস্থা মানুষকে এ-জন্ম-পূর্ব্বজন্ম-পরজন্মের বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে,—সমস্ত বিশ্বকে এক সুরে গ্রথিত করিতেছে,—সেই প্রেম, সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই বিহ্বলতা, সেই আস্থা বৈষ্ণব কাব্যের মেরুদণ্ড। (২৮) বেদনা ও আনন্দের সমাবেশে যে 'পরমানন্দ' তাহাই ওই কাব্যের রস,—এই রসে বৈষ্ণবের জগৎ,—মানব, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী,—সকলি সঞ্জীবিত।

এই বৈষ্ণব কাব্য বাঙালীর নিজস্ব। আর এই কাব্যের সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি প্রেমবিহ্বলা নায়িকা শ্রীরাধিকা। বিশ্ব-সাহিত্যের বরেণ্যা নায়িকামণ্ডলীর মধ্যেও বৈষ্ণবের শ্রীরাধিকা এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

(১০)

চীনের "তাও" [Tao] এর মত, জাপানের "শিণ্ডো" [Shinto] র মত "সুফী" [Sufi] ও "নাক্‌শবন্দী" [Naqshbandi]র আবেশ-বিহ্বলতা [Ecstasy]র মত,—বাঙালীর বৈষ্ণব কাব্য একটা "ভাব" [Idea], একটী জীবনীশক্তি [vital force]। যেন ইহার কোন সংজ্ঞা নাই,—এ নিজেই নিজের সংজ্ঞা, নিজেই নিজেতে আত্মবিবৃত; কালস্রোতের মধ্যে ইহার স্থির ধারা নিজেরই মাধুর্য্যপ্রভাবে প্রবাহিত। ["It is its own spontaneity"].

(২৬) 'ভারতবর্ষ', পৌষ, ১৩২৬। (২৭) রবীন্দ্রনাথ, "প্রতীক্ষা", কাব্য-গ্রন্থাবলী, ৩১৪।

(২৮) "এই কবিতা মনুষ্য হৃদয়ের চিরকালের কবিতা", শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, "বঙ্গবাণী", ২৩ পৃঃ।

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল,—তাহা বঙ্গদেশে। [শ্রীচৈতন্য-রূপে]।.....এই অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট,...তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।" রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ৭ম, অঃ।

স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় গাথা-বলিলে ইহাকে বুঝা যায় না,—অথচ ইহা সেই প্রণয়েরই সঙ্গীতের সুরে জাগ্রত। বাহ্য-প্রকৃতির প্রতি মানবের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির দিক দিয়া ইহাকে দেখানো যায় না;—অথচ ইহা সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে, বৃন্দাবনের তাল-তমালকে, ধেনু ও বৎসকে, শুক ও সারিকে আত্ম-সৌন্দর্য্যের হিল্লোল-স্পন্দনে প্রেমবিহ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মানবের প্রতি ভালবাসার কথায় ইহাকে ব্যক্ত করা যায় না,—অথচ বৃন্দাবনের গোপ-গোপী, গোষ্ঠ-বিহারী রাখাল সকলেই ইহার প্রণয়-কীর্ত্তনে আত্ম-বিস্মৃত। দার্শনিকতত্ত্ব বলিলে ইহাকে বলা হয় না,—অথচ দর্শনের সমস্ত তথ্য,—সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন, মৃত্যু,—সকলকে ইহা সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের প্রতি প্রেমজ্ঞাপনের কথায় ইহাকে বুঝানো যায় না,—অথচ অনন্ত, শান্ত, সত্য, শিব, অদ্বৈতকে লইয়াই ইহার ব্যবহার।

ইহাকে লিখিত কাব্য বলিলে চলে না,—কারণ, ইহার যাহা অ-লিখিত তাহাও কাব্য। এ-খানি 'করুণ' (pathetic) শ্রেণীর কাব্য নহে,—এ কাব্য উদার, মহান্ (sublime), ইহার অনুভূতি-কেন্দ্র একবার ধূলি হইতেও নিম্নে, আবার আকাশ হইতেও উচ্চে।

এ স-সীমের উপর দাঁড়াইয়া অসীমকে আহ্বান করিতেছে; এ,—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" [চণ্ডীদাস]

এ যেন পৃথিবী শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গেলেও তার মধ্যে প্রবাহিত স্ফটিকধারা; যেন চন্দ্র অস্তমিত-হইলেও তার পর মানব-মানসে জ্যোৎস্নার প্লাবন; যেন সঙ্গীত শেষ হইলেও তার সুরের তান।

কথার বাহিরেও ইহার অর্থ,—সেই অর্থ যেন অন্তরের কোন্ বৈরাগ্য-ভিত্তির উপর আত্ম-ন্যস্ত রহিয়াছে,—আর তাই ভিতরে-বাহিরে তাহা কি এক মাধুরী-ময়ী "অনর্থ" সৃষ্টি করিয়া মানুষকে পাগল করিয়া দিতেছে,—

"অন্তরে মোর বৈরাগী গায়,—তাইরে, নাইরে, নাইরে,—না!" [রবীন্দ্রনাথ]

(১১)

বৈষ্ণব কাব্য বাঙালীর নিজস্ব,—গোপনে, অতি যত্নে বাঙালীর হৃদয়ে ইহা সংরক্ষিত। কিন্তু তথাপি বোধ হয় বিশ্বমানবের দৃষ্টির সম্মুখে রাখিলে ইহাকে খাঁটি 'জহুরি' ঠিক ধরিয়া ফেলিবে।

কবির কথায়,—"নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া" তবে ইহাকে চিনিতে হইবে। (২৯)

বৈষ্ণব কাব্যের প্রেম-সম্পদ্ মাণিককে শ্রীরাধা চিনিয়াছেন, তাই প্রেমাস্পদকে বলিতেছেন,—

[আমার] "অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা-ধনে মিলাওল বিধি।"—

আর যদি

[আমায়] "নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ-দেশ।"
[লোচন দাস]

শ্রীরাধা আবার বলিতেছেন,—

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব!
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব।" [জ্ঞানদাস]

আর,

"দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঁঞি না পায়।"

বিশ্ব-মানসে বৈষ্ণব-কাব্যের কি অনন্ত প্রভাব!

(২৯) রবীন্দ্রনাথ, "সমালোচনা" ১০ পৃঃ

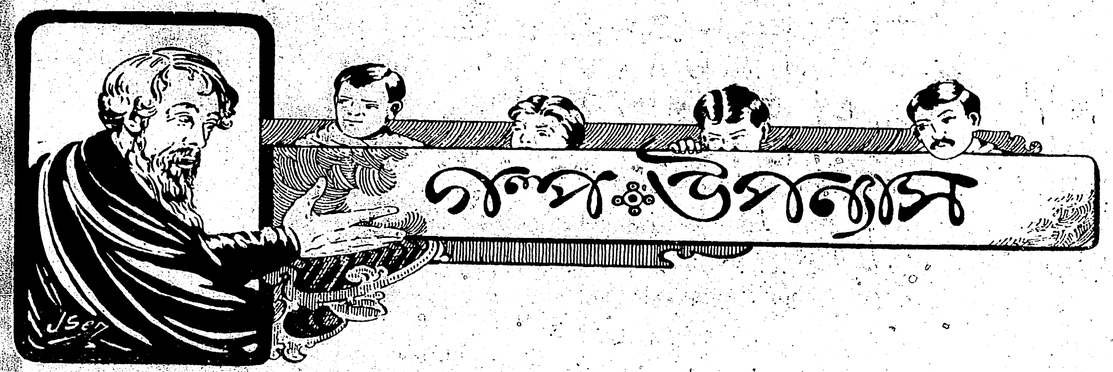

গরমিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রথম অংশ)

৪

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর নরেশ আপন মনে বলিতে লাগিল—"যাক্, এ পথও বন্ধ দেখ্‌ছি! লীলা তো আমার একটা কথাও বুঝ্‌তে পারে না,—যে পারে সে তো শুনলেই না! এখন উপায়? শীগ্‌গিরই এর যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত না করতে পারলে, হয় তো এর পর এদের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ রকম অবস্থায় আর বেশী দিন থাক্‌লে, আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা একেবারে অন্ধকার হোয়ে উঠ্‌বে! না—না, এই বেলা সময় থাক্‌তে আমি মুক্ত হোতে চাই। এ কি বন্ধন নাগপাশের মতো ক্রমশঃ আমাকে চারিদিকে জড়িয়ে ধরে আমায় প্রতি দিন অলস, অবশ, নির্জ্জীব ক'রে আন্‌ছে? সত্যই কি আজীবন আমাকে এদের এই মাপ-জোপ-করা ঘর ক'খানিতে, এই হিসেব-করা আস্‌বাব-গুলোর ভিতর গুণে গুণে পা ফেলে এমনি গুঁড়ি মেরে মেরেই কাটাতে হবে? এমন কি, এদের এই ওজোন-করা কথাবার্ত্তা, কেতা-দোরস্ত আচার-ব্যবহার, বাঁধা-ধরা সাজ-সজ্জাগুলো কি আমাকে অনুকরণ করে চলতে হবে?—অসম্ভব! অসম্ভব!—এ রকম কোরে আমি বেঁচে থাকতে পার্ব্বো না! এর মধ্যেই যেন আমার হাঁপ ধ'র্‌ছে। ইচ্ছে ক'র্‌ছে, এই বাড়ীখানাকে দু'হাতে প্রাণপণে তুলে ধরে জোর ক'রে একবার উল্‌টে বসিয়ে দিই! একটা কিছু নতুন রকম পরিবর্ত্তন হোতে পারে তাহ'লে! কিন্তু পরিবর্ত্তন কি নতুন, এ সবের প্রবেশই যে এখানে একেবারে নিষেধ! একখানা চেয়ার এঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে গেলেই যেন এদের সর্ব্বনাশ হোয়ে যায়! একটা কিছু কোনও খানে যদি একটু নাড়া-চাড়া করে রাখি,—সমস্ত বাড়ীখানা যেন ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে,—এমনি কোরে ওঠে এরা সকলে মিলে! ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা আমি যেন আড়ষ্ট হোয়ে থাকি! একটু আল্‌গা হোয়ে আরামে খানিকটা পায়চারি করে যে কতকটা সোয়াস্তি পাবো তার যো'টি নেই! নাঃ—এখানে এ ভাবে বাস করা আর আমার চল্‌বে না।...এই প্রকাণ্ড কোচখানা ঘরের মাঝখান থেকে সরিয়ে যদি একটু ওই দেয়ালের দিকে ঘেঁসিয়ে রাখি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি?—এই দিগ্-ধোড় ইজিচেয়ারটাকে দরজার গোড়া থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে যদি ওই দক্ষিণের জান্‌লাটার কাছে বসিয়ে দিই, তা' হোলে কি একটা কোনও মহাপাতক করা হয়?.. সৌরজগতের নিয়মের মতো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এগুলো কি অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই একই

ভাবে একই যায়গাতে থাকবার জন্যে তৈরী হয়েছে? এগুলো কি যে যার যায়গায় সব শেকড় গেড়ে বসে গেছে না কি? স্বয়ং ব্রহ্মা এসেও কি এসব আর নড়াতে পারবেন না? দেখি দাঁড়াও তো—একবার নড়ানো যায় কি না—" বলিতে বলিতে নরেশ উঠিয়া কর্ত্তার প্রকাণ্ড কৌচখানা হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিল।

"বাঃ! এ তো নড়ে দেখছি!—আর এই মান্ধাতার আমোলের ইজিচেয়ারখানা?"—বলিয়াই সেখানাকে দুই হাতে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়া বার দুই জোরে ঝাঁকানি দিয়া নরেশ একেবারে দক্ষিণের জানালার সম্মুখে সশব্দে বসাইয়া দিল।

"আচ্ছা, ওই পাথরের টেবিলটা কি ওঘরে যাবার এই সোজা পথটা আটকে চিরকাল ওইখানে হাতীর মতো চার পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? রোসো—ওটাকেও আজ হঠিয়ে দিই ওখান থেকে; নইলে আমার চলা-ফেরার ভয়ানক অসুবিধে হয়।"

সশব্দে পাথরের সেই মস্ত টেবিলটা টানিয়া একপাশে সরাইয়া দিয়া নরেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"আঃ! একটু হাত-পাগুলো নেড়ে যেন বাঁচলুম! আমার তো মনে হচ্ছিল, হয় ত বা চলতেও বুঝি ভুলে গেছি! আজ প্রায় এক বছর হোতে চললো—আমি এ বাড়ীতে কারুর পায়ে চলার একটু শব্দ পর্য্যন্ত কোন দিন শুনতে পাইনি! কারুর একটু উঁচু গলা এক দিনও শুনিনি। কেবল ফিস্ ফিস্ করে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা, আর এক-আধবার মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি! কেউ এ বাড়ীতে কখনও প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে হাসেও না ছাই! দেখি একবার, হাসিটা মনে আছে কি না—"হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—!" নরেশ পাগলের মতো আপন মনে অট্টহাসি হাসিতে লাগিল।

"গানটান গুলো কি আর মনে আছে সব? হার্ম্মোনিয়মটা তো দেখছি পড়ে পড়ে ছাতা ধরে গেল! সেই যেদিন শশাঙ্ক গেছে, সেদিন থেকে এখানে তো গান-বাজনাও একেবারে বন্ধ! দেখি দাঁড়াও, গাইতে বাজাতে এখনও পারি কি ভুলে গেছি?"—বলিতে বলিতে টেবিল-হারমোনিয়মের ডালাখানা খুলিয়া ফেলিয়া নরেশ বাজাইতে বসিয়া গেল। তার পর প্রাণপণ জোরে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল—

"বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ কারা;
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কৈ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-হীনে
ব্যর্থ শক্তি, নিরানন্দ জীবনধন দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও, দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।"

* * * *

রায় বাহাদুর, গৃহিণী, কমলা, লীলা সকলেই নরেশের গানের শব্দ শুনিয়া সেই ঘরে ছুটিয়া আসিল। রাগে কর্ত্তার দুই চক্ষু লাল, গৃহিণীর মুখখানি ভার। লীলার দৃষ্টিতে নিষেধের পরিপূর্ণ মিনতি, কেবল কমলার মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। কতক গোপন হাস্যের অস্পষ্ট ছায়া, কতক কৃত্রিম বিরাগের নিপুণ ছদ্মবেশ যেন একত্র সে মুখে উঁকি মারিতেছিল।

গৃহিণী বলিলেন "এ সব কি কাণ্ড নরেশ?"

কমলা বলিল, "হঠাৎ আপনার জামায়ের ঘাড়ে গান চেপেছে বোধ হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন "আমার বাড়ীটা তো যাত্রার দলের আখড়া নয় বাপু!"

নরেশ ধীরে ধীরে হারমোনিয়মের ডালাটি বন্ধ করিয়া অপ্রতিভের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, এই হারমোনিয়মটা ঠিক আছে কি না একবার দেখ্‌ছিলুম!"

ঘরের ভিতরের কৌচ ও টেবিল চেয়ারগুলোর অবস্থা দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এগুলোও কি ঠিক আছে কি না দেখ্‌ছিলে নরেশ?"

এতক্ষণে কর্ত্তারও সেদিকে নজর পড়িতে, তিনি ভয়ানক চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাই তো! এ কি? এগুলো সব এমন নাড়াচাড়া ক'রে রাখলে কে?"

বিনীত ভাবে নরেশ বলিল, "আজ্ঞে, ওগুলো নাড়া যায় কি না, আমি পরীক্ষা করছিলুম।"

কর্ত্তা গিন্নী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "নাড়া যায় কি না দেখ্‌ছিলে!—সে কি?"

কমলা তাড়াতাড়ি সেগুলা টানিয়া-টুনিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "হারমোনিয়মটা তো একটু বাজালেই ঠিক আছে কি না বুঝতে পারতে; তার সঙ্গে অমন গর্দ্দভরাগিণীতে গান ধরবার মানেটা কি শুনি?"

নরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "গান-টানগুলো গাইতে ভুলে গেছি কি না, একবার যাচাই ক'রে দেখছিলুম।"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "নরেশের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

কর্ত্তা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "হ'তেও পারে!—হয় ত খুব সম্ভব তাই!" তার পর নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ নরেশ, বিবাহের আগেও কি তোমার মধ্যে মধ্যে এ রকম হ'তো!"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না। বিবাহের আগে কখনও হয়নি; আর এখনও যে সম্পূর্ণ খারাপ হোয়েছে, তা মনে করবেন না। তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, এ ভাবে আর কিছু দিন থাকলে হয় ত মাথাটা আমার সত্যই খারাপ হয়ে যাবে!"

গৃহিণী ভীত হইয়া বলিলেন, "কেন বাবা নরেশ, তোমার এ রকম মনে হচ্ছে? এখানে কি তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

নরেশ দ্বিধা মাত্র না করিয়া বলিল, "যথেষ্ট হচ্ছে।"

কর্ত্তা গিন্নি উভয়েই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি! সে কি!"

নরেশ বলিতে লাগিল, "অশৈশব আমি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিছি বটে, কিন্তু এমন পরিশ্রান্ত আর কখন হইনি। আজ আমার মনে হচ্ছে, জগতে আমার চেয়ে অসুখী বোধ হয় আর কেউ নেই!"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই না কি! এখনও যে এক বছরও হয়নি তোমাদের বে' হয়েছে,—এর মধ্যেই অসুখী হওয়াটা তো সম্ভব নয়।"

গৃহিণী সস্নেহে বলিলেন, "তাই বুঝি ক'দিন থেকে বাছা আমার মুখটি শুকিয়ে বেড়াচ্ছে,—কেমন যেন মনমরা গোছ ভাব। কি হয়েছে বাবা বল তো? লোকজনেরা কেউ কি তোমাকে অসম্মান দেখিয়েছে? খুকীর সঙ্গে কি কিছু বচসা হয়েছে,—সে কি কোনও অন্যায় করেছে? বল, লজ্জা কি, বল না।"

নরেশ তথাপি চুপ করিয়া আছে দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার অভাব-অভিযোগের কথা যদি আমাদের না জানাও, তাহ'লে প্রতীকার হবে কেমন করে?"

গৃহিণী বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন নরেশ?—তবে কি তোমার প্রতি আমাদের কোনও স্নেহের অভাব দেখেছো?—তাই কি বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছো?"

নরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অস্থির ভাবে বলিল, "না মা, একটুও না। বরং এতো বেশি স্নেহ পাচ্ছি আপনাদের কাছে, যে তাতে আমার সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে!"

বাধা দিয়া বিরক্ত ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "এ কথার অর্থ কি নরেশ?"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আপনারা আমাকে এত বেশি আদর যত্ন করছেন, যে, আমি ছেলেবেলা থেকে ওটাতে মোটেই অভ্যস্ত নই বলে' আজ একেবারে হাঁপিয়ে উঠিছি!—আরাম আর আয়েস এই দুটো সর্ব্বনেশে জিনিস এত বেশি করে আমার জন্যে এখানে বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, কষ্ট বা পরিশ্রম—এগুলো যে কি রকম, তা আমি প্রায় ভুলে যেতে বসিছি। আমি আমার নিজের শক্তি-সামর্থ্য ক্রমশঃ হারিয়ে ফেল্‌ছি! আমার কাজ কর্ব্বার উৎসাহ চ'লে যাচ্ছে! আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি বা আমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সব অতৃপ্ত থেকে যাবে।"

গম্ভীর ভাবে কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাগুলোর সন্ধান পেলে, হয় তো সেগুলো সার্থক করবার একটা উপায় করতে পারা যায়।"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমি চাই নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন ক'রে আমার পরিবার প্রতিপালন করতে,—আমি চাই সমাজে একটা মান্য-গণ্য পদস্থ ব্যক্তি হোয়ে উঠ্‌তে,—আমি চাই এই কর্ম্মহীন নির্জ্জীব কুঁড়েমির বাইরে গিয়ে একটা কার্য্যক্ষম জীবন্ত মানুষ হ'তে!"

কর্ত্তা হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ যে তোমার নিতান্ত আহাম্মুকের মতো খেয়াল নরেশ?—একে বলে সেই সুখে থাকতে ভূতে পাওয়া।"

গৃহিণী কর্ত্তাকে চোখে কি একটা ইসারা করিয়া বলিলেন, "আহা, শোনই না ছাই সবটা আগে,—ওর মনের ইচ্ছেটা কি,—ও কি হ'তে চায় জেনে, সেই ভাবে ওকে তোমার সাহায্য করা উচিত। পাঁচপাঁচটা পাশ করেছে ও, —কেন হবে না শুনি?" নরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল তো বাবা, তোমার কি হ'তে সাধ যায়। হাইকোর্টের উকীল হবে, না শ্বশুরের মতো সদরআলা হাকিম হবার ইচ্ছে আছে?"

তার পর আবার স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ও যা হ'তে চায়, তোমাকে তাই করে দিতে হবে, বুঝ্‌লে? নরেশ আজ শুধু আমাদের জামাই নয়—ও আমাদের শশাঙ্কর অভাব ভুলিয়ে রেখেছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র কমলার সর্ব্বশরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনাদের জামায়ের যে রকম কল্পনার দৌড়, তাতে 'কবি' হওয়াই ওঁর পক্ষে সব-চেয়ে সুবিধে।"

নরেশ বলিল, "আমার এক বন্ধু মেদিনীপুরে ওকালতি করছে। এর মধ্যেই তার বেশ পসার হ'য়েছে। সে বলছিল আমাকে উকীল হতে—"

কমলা চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাহলে যে তোমাকে সেইখানে গিয়েই থাক্‌তে হবে! এখান থেকে তো মেদ্‌নীপুরে ওকালতী করা পোষাবে না!"

নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার উকিল হবার ইচ্ছে নেই। পয়সার জন্যে যে কাজে মিথ্যেকেও সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে হবে, সে রকম নীচ উপজীবিকা আমি গ্রহণ করতে চাই না।"

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "কাজটাকে যতটা খাটো ঠিক করেছ নরেশ, ওটা ততটা খেলো নয়। ন্যায় বা সত্যের প্রতিষ্ঠাও উকীলের সাহায্যেই হতে দেখিছি আমি।"

নরেশ তাহা স্বীকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এক পক্ষে সেটাও ঠিক বটে। দেখুন,—আমাদের কলেজের প্রিন্সি-প্যাল সেদিন আমাকে প্রোফেসার হবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। আপনি কি বলেন?"

কর্ত্তা উত্তর দিবার আগেই গৃহিণী বলিলেন, "তাই বা কি করে হবে নরেশ? তাহ'লে যে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে!"

নরেশ বলিল, "সে তো যেতে হবেই মা। আমি যদিও প্রোফেসার হতে ইচ্ছে করিনি; কিন্তু আজকালের মধ্যেই যে কলকাতায় চলে যাবো, সেটা একরকম ঠিক করে ফেলিছি!"

কথাটা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি! কলকাতায় চলে যাবে কেন?"

কর্ত্তা বলিলেন, "প্রোফেসারি কাজটা বেশ সাধু কাজ বটে, কিন্তু উপার্জ্জনের দিকটা নেহাৎ অল্প। তা সে যা হয় পরে ঠিক করা যাবে। এখন বেলা হয়েছে। যাও, আগে নেয়ে খেয়ে নাও।"

গৃহিণী নরেশের কাছে সরিয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, বলি কিছু দেনাপত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়োনি তো? হঠাৎ কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো কেন, আমায় সব খুলে বল না—ভয় কি;—আমি সব মিটিয়ে দেবো অখন।"

নরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "না মা, আপনাদের আশী-র্ব্বাদে আমি ঋণের দায় থেকে অনেক দিন মুক্তি পেয়েছি। সে সব কিছু নয়। আমি কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু ব্যবসা করবো ঠিক করছি!"

কর্ত্তা সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। নরেশের ব্যবসার কথাটা কাণে আসিতেই দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"নাঃ—এটাকে দেখ্‌ছি আর খেয়াল বলাও চলে না,—এ একেবারে নিছক্ পাগলামী! ব্যবসা করবে কি হে, ও কি ভদ্রলোকের কাজ! যাও, যাও, চট্ করে নেয়ে খেয়ে নিয়ে ক'সে একঘুম দাও গে, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে তাহ'লে।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমার মাথার ভেতর যে আগুণ জ্বলছে—এ সহজে ঠাণ্ডা হবে না। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন সে আগুণের জ্বালা বাড়ছে!—আমি কাজ চাই—কাজ চাই—এখানে এমন নিশ্চেষ্ট নিরুপায় বসে বেঁচে থাকতে পার্ব্বো না। আমি এ হাত-পা-গুলোকে খাটাতে চাই। মনটারও একটা খোরাক চাই। আমার অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটা স্বাভাবিক নিবৃত্তির পথ খুঁজে নিতে চাই। এই কয়েদখানার মতো

বাড়ীটাতে আদবকায়দার হাতকড়ি পরে এ ভাবে আটক্ হোয়ে থাকা আর আমার সহ্য হচ্ছে না।"

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার ও গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কমলা কিন্তু হাসিমুখেই বলিল, "শ্বশুর-বাড়ীটাকে যখন কয়েদখানা বলে মনে হ'চ্ছে ঠাকুরজামাই, তখন তোমার মনের অবস্থা যে খুবই খারাপ, এটা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। তা কিসের ব্যবসা করবে মনে করছো? ধান চালের না গুড় পাটালীর?"

গৃহিণী বলিলেন—"তা বাছা, কাজ-কর্ম্মই যদি করতে চাও, তো এইখানেই কেন একটা কিছু কারবার ফেঁদে বোস না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কিছু মন্দ কথা নয়। তোমার মনের অবস্থা যখন এ রকম, তখন একটা কিছু কাজে লেগে যাওয়াই উচিত। তা তুমি এক কাজ কর না,—আমার জমীদারীটাই না হয় দেখা শোনা কর না। কিম্বা যদি একান্তই কোন কারবার করবারই ইচ্ছেটা বেশি থাকে, তা'লে তাইতেই লেগে যাও, মূলধন যা লাগে আমি দোবো। তোমার কাজ কর্ব্বার এই ঝোঁকটাকে আমি বন্ধ ক'রে দিতে চাইনি—ওটা খুব ভালো। সে ছোঁড়াটা ছিল কিন্তু—ঠিক তোমার উল্টো; কাজের নাম শুনলে ভয় পেতো! তা যাক্, আর গোলমাল কোর না—আমি শিগ্‌গিরই দেখে শুনে তোমায় যা হোক্ একটা কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো।"

নরেশ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"কিন্তু তা'হলে তো আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবো না! সে যে সকল রকমে আমাকে আবার আপনারই অধীন হোয়ে থাক্‌তে হবে! আমি কারুর সাহায্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে চাই না। আমি নিজে স্বাধীন ভাবে আপনার পায়ের ওপোর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই।"

"মূলধন পাবে কোথায়?"

"নিজের পরিশ্রমে উপার্জ্জন ক'রে নেবো। না পারি, কারুর কাছ থেকে আপাততঃ কিছু টাকা ধার করে নেবো। ধরুন আপনার কাছ থেকেই যদি চাই, তা'হ'লে কি কিছু টাকা ধার পেতে পারি না?"

"একটী পয়সাও নয়।"

"কেন?"

"আমার ইচ্ছে; আমি তোমাকে ধার দেবো না।—কেন জানো?—আমি চাই, আমার জামাই ঠিক জামায়ের মতই বাড়ীতে থাক্‌বে। আমি ইচ্ছে করি না যে, আমার মেয়ে কোনও ফিরিওয়ালা দোকানদার, কোনও চাকরে কেরাণী, কি কুলি মজুর কিম্বা পেশাদার উকিল মুহুরীর স্ত্রী বলে পরিচিত হয়।"

"স্বাধীন উপজীবিকা কি আপনি পছন্দ করেন না?"

পরাধীন দেশে পরাধীন জাতের আবার স্বাধীন উপ-জীবিকা কি? কথাটা শুনলে আমার হাসিও পায়, রাগও হয়। চোখের সামনে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি—'স্বাধীন উপজীবিকা' বলে একটা লম্বা-চৌড়া ভড়কানো গোছের নাম দিয়ে করছে তো সবাই একটু ভদ্ররকমের ভিক্ষে!—একএকখানা বড় বড় সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে হাঁ করে হাত পেতে খদ্দেরের মুখ চেয়ে বসে আছে!"

"বলেন কি? ব্যবসায়ীদের আপনি ভিক্ষুকের দলে ফেলছেন? ও কথা বল্‌লে তাদের অপমান করা হয়।"

"কিছুমাত্র নয়। ব্যবসার প্যাঁচওয়া ফন্দী আর ঘোরালো জুচ্চুরীর চেয়ে বরং সোজা সুজি ভিক্ষে করা ঢের ভালো। তাতে অন্ততঃ লোককে ঠকানোর পাপটা এড়ানো যেতে পারে।"

"সে কি! ব্যবসা করাটাকে জুচ্চুরী বল্‌ছেন?"

"জুচ্চুরী নয় ত কি?—পাঁচ টাকার কেনা জিনিসটা তুমি পাঁচজনকে ডাহা ঠকিয়ে আট টাকায় গছাতে পারলে তবে তো দুপয়সা লাভ খাবে? তাহ'লেই দেখে না কেন, ওটা জুচ্চুরী ঠগবাজী হোল না কি? কি জানো—ব্যবসাটা হচ্ছে ঠিক্ 'লাইসেন্স'-নেওয়া চুরি আর কি! প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বত্রই চল্‌ছে,—কেবল লাইসেন্সের জোরে 'পেনাল কোডের' ধারাগুলো এড়িয়ে যায়!"

"এ ভাবে বিচার করলে তো কোন কাজেই হাত দেওয়া চলে না দেখ্‌ছি!"

"তোমার দরকার কি বাপু হাত দিয়ে? তুমি রাজনগরের একটা পুরোনো বনেদী বড়লোকের ঘরে একটা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে বিবাহ করেছো—যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ কখন কুলি মজুরের মতো কেরাণীগিরী, মাষ্টারী কি মোক্তারী করেনি। চিরকাল পায়ের ওপোর পা দিয়ে বসেই কাটিয়েছে,—নয় তো বড় জোর—হাকিম

হ'য়ে হুকুম চালিয়েছে। তুমি আর কিছু পারো আর না পারো, অন্ততঃ তোমার স্ত্রীর পিতৃকুলের মানসম্ভ্রম, তাদের বংশমর্য্যাদাটা বজায় রেখে চলো। তুমি এম্-এ, বি-এ পাশ করেছো বটে, কিন্তু ও পাঠশালার ছাপ দেখে কেউ তোমাকে আমার চেয়ে বেশি খাতির করবে না—এটা তুমি নিশ্চয় জেনো। অথচ কাল যদি তুমি আমার জমীদারী হাতে নাও, দেখ্‌বে, রাস্তায় বেরুলে দুধারি লোক তোমাকে সেলাম করছে! এত বড় যে ইংরেজ গভর্মেণ্ট এরাও ডেকে উপযাচক হোয়ে আমাদের খেতাব দেয়।"

"কিন্তু, আমি যে পরের ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে বড় হতে চাই না—সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

"তুমি দেখ্‌ছি একটা আস্ত গাড়োল! যেটাকে পরের ময়ূরপুচ্ছ বলে মনে করছো, সেটাতে যে তোমার এখন একটা নেয্য অধিকার জন্মেছে—সেটাই বা তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন?—আমার যে এখন ঐ এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই! দুদিন বাদে যা সম্পূর্ণ তোমার নিজের হবে, আজ সেটাকে পরের জিনিস বলে তুচ্ছ করাটা যে তোমার আর একটা প্রকাণ্ড আহাম্মুকীর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।"

"স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পত্তি দখল করে সম্ভ্রান্ত সাজাটাকে আমি অতি নীচ দীনতা বলে মনে করি!"

"তোমার কথাগুলো বড্ড বেশি কড়া হ'য়ে পড়্‌ছে। তুমি একটু সংযত হ'য়ে কথা কইলে আমি বড় বাধিত হব।"

শ্বশুর ও জামাতার কথাবার্ত্তা ক্রমেই কলহে পরিণত হইবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া, গৃহিণী তাড়াতাড়ি স্বামীর সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, থাক্ থাক্—তুমি আর বেশি তর্ক বিতর্ক কোর না। তর্ক করলেই তোমার মাথা গরম হ'য়ে ওঠে।" জামাতাকে বলিলেন "বাবা নরেশ, আর তর্কে কাজ নেই; ডাক্তাররা তোমার শ্বশুরকে তর্ক করতে বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। উনি যা বলছেন শোনই না কেন। উনি তোমার গুরুজন, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁর কথা শুনে চললে তোমার ভালই হবে।" মেয়েকে বলিলেন, "খুকি, যা তো মা, ওঁর সর্ব্বতের গেলাসটা এনে দে তো—বকে বকে ওঁর গলা শুকিয়ে গেছে।"

কমলা বলিল "চল ঠাকুর জামাই—খাবে চল, সকাল থেকে এক পোড়া তর্ক জুড়ে অনেক বেলা করে ফেল্‌লে!"

নরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার ক্ষিধে নেই! আমি আজ আর কিছু খাবো না।"

গৃহিণী নরেশের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, রাগ করতে আছে কি; চল খাবে চল।"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "এ বাড়ীতে আমি আর জলস্পর্শ কোরবো না!"

লীলা ঠিক সেই সময় কর্ত্তার সর্ব্বতের গেলাসটি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। নরেশের কথাটা কাণে আসিতেই সর্ব্বৎ-ভরা কাঁচের গেলাসটা তাহার হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হঠাৎ গেলাসটি ভাঙিয়া যাওয়ার শব্দে সকলেই একটু চম্‌কাইয়া উঠিল। কমলা ও গৃহিণী 'আহা হা!' করিয়া উঠিলেন। কর্ত্তা একবার করুণনেত্রে সেদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাক্‌গে—ওখানটা সাফ করিয়ে ফেল। উঃ! ভারি গরম বোধ হচ্ছে! জানালার সার্শীগুলো সব খুলে দাও কেউ।" বলিয়া খবরের কাগজখানা ভাঁজ করিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বাতাস খাইতে সুরু করিলেন।

কমলা তাড়াতাড়ি গিয়া সার্শীগুলা খুলিয়া দিতে লাগিল। গৃহিণী একখানা পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। লীলা তখন ঘরের মেঝেয় নতজানু হইয়া শতখণ্ড কাঁচের গেলাসের টুক্‌রাগুলা হেঁট মুখে কুড়াইতেছিল। নরেশ নিতান্ত নির্লজ্জের মত একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল।

৫

পাখার বাতাস করিতে করিতে গৃহিণী কর্ত্তার কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, তাই তো গো! ঈস্! এ যে বড্ড ঘেমেছো দেখ্‌ছি! রোসো, একখানা তোয়ালে এনে মুছিয়ে দিই। বৌমা! তুমি বাছা আর এক গ্লাস সর্ব্বৎ তৈরি ক'রে আনো—বকা-ঝকা ক'রে তোমার শ্বশুর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না—না, আর আনতে হবে না, কিন্তু এ কি! সকল বিষয়েই তর্ক। যা বলি তারই একটা উল্টো জবাব! এ রকম তো জীবনে কখনো আমি

দেখিনি! আমার মুখের ওপর তো আজ পর্য্যন্ত কাউকে জবাব দিতে শুনিনি!"

গৃহিণী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাক্‌গে। ছেলেমানুষ অতশত জানে না, কথার পিঠে দু'কথা ক'য়ে ফেলেছে। ও তো এখনও তোমার ধাত ঠিক বুঝতে পারেনি! তাছাড়া আজ ক'দিন থেকেই ওর মনটাও একটু যেন খারাপ হ'য়ে রয়েছে—নারে খুকী?"

লীলা সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ।"

গৃহিণী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ তো মা। তুই কিছু জানিস?"

লীলা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

গৃহিণী পাখাখানা রাখিয়া মেয়ের নিকট উঠিয়া গিয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, "খুকী, কি জানিস্ সব খুলে বল আমার কাছে—লুকোস্‌নে কিছু।"

"আমি তো তা কিছু জানি না মা!" বলিয়া লীলা তাহার উদ্গত অশ্রুজল গোপন করিবার জন্য ভাঙা কাঁচের টুক্‌রাগুলা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে গেল, কিন্তু তাহার চক্ষের জল কমলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না। কমলা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "এ কি! কাঁদছিস কেন ভাই? কি হ'য়েছে?" গৃহিণীও সত্বর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তাই তো, কাঁদছিস্ যে! কি হয়েছে মা?"

কর্ত্তা একবার কন্যার অশ্রুনিসিক্ত মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিয়া জলদগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন "নরেশ! কি বলেছো তুমি ওকে? ও যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে?"

গৃহিণীও জামাতার দিকে বিরাগপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড হ'য়েছে,—নইলে ও তো সহজে কাঁদে না!"

লীলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"কই, এই তো আমি তো আর কাঁদ্‌ছি না।"

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া তাহার গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী! এই মাত্র কাঁদ্‌ছিলি, আর বলছিস কাঁদিনি!"

নরেশ কঠোর বিদ্রূপের সহিত বলিয়া উঠিল, "এক ফোঁটা চোখের জল দেখে যার জন্যে আজ বাড়ীশুদ্ধ আপনারা অস্থির হোয়ে উঠেছেন, তার যা কিছু দুঃখ সব কিন্তু আপনাদেরই অনুগ্রহে! বোধ হয় এখন থেকে ওকে রোজই চোখের জল ফেল্‌তে হবে!"

নরেশের কথা শুনিয়া সকলে সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন—আজ যখন কথাটা উঠেছে, তখন সব পরিষ্কার ক'রে বলাই ভালো। আমার মনে হয়, আমাদের এ বিবাহ বড় অশুভক্ষণেই হয়েছে। আমরা কেউই পরস্পরের যোগ্য নই। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের যেটি প্রধান বন্ধন, আমাদের উভয়ের মধ্যে সেই বস্তুটারই একান্ত অভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

উত্তেজিত ভাবে গৃহিণী বলিলেন, "নরেশ!—কি বল্‌ছো তুমি এ সব?"

কর্ত্তা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি থামো। ব্যাপারটা কি আমাকে ভালো ক'রে বুঝতে দাও। হ্যাঁ, কি বলছিলে নরেশ?"

নরেশ নির্ব্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাদের স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্যে প্রেমের পবিত্র বন্ধন স্থাপিত হয়নি।"

কর্ত্তা বিস্ফারিত নেত্রে নরেশের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৃহিণী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলা! নরেশ যে তোকে নিয়ে সুখী হ'তে পারেনি, এ কথা এত দিন আমাদের কাছে বলিস্‌নি কেন খুকী?"

লীলা কোনও উত্তর দিবার আগেই নরেশ বলিল, "এ ক্ষেত্রে অপরাধী ও নয় মা, অপরাধী আমি। আমিই ওর মনের মতো হতে পারিনি বোধ হয়, তাই ও আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেনি!"

গৃহিণী চিন্তিত মুখে মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, নরেশ যা বলছে, যদি যথার্থই অবস্থাটা তাই হয়ে থাকে, তবে তো—"

বাধা দিয়া নতমুখে লীলা বলিল, "উনি তাই মনে করেন মা। কিন্তু আমার মুখে তোমরা কি এক দিনের জন্যেও ও রকম কোনও কথা শুনেছো?"

বিজ্ঞের মতো গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল, "দেখুন, ওর মনের এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি হয়নি। ও নিজেই হয় তো জানে না যে কি ওর অভাব, কোথায় ওর ত্রুটী। আর জানতেও বোধ হয় কোন দিন পার্বে না, যদি ওকে

চিরকাল ওর এই পিতৃগৃহের অসংযত আদরের অন্তরালে এমনিই দায়িত্বহীন জীবন যাপন করতে হয়!"

কর্ত্তা তাঁহার চশমাখানা খুলিয়া কোঁচার কাপড়ে বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া আবার চক্ষে দিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ—?"

নরেশ বলিতে লাগিল—"পিতামাতা ছাড়া এখন আরও একজনের প্রতি যে ওর একটা বড় রকম কর্ত্তব্য রয়েছে, পিতামাতার চেয়েও যার দাবী ওর ওপোর এখন সব থেকে বেশি—সেই সহজ শিক্ষাটাই ওর এখানে থাকলে কোন দিনই হবে না। ও তার স্বামীকে নিজের বড় ভায়ের চাইতে আর অধিক কিছু মনে করে না। ও জানে ওর যে স্বামী, সেও ওরই মতো চিরকাল এখানে থেকে ওর পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করবে এই মাত্র!"

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"সেটা বুঝি তুমি একেবারেই ইচ্ছে কর না?"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিল, "ইচ্ছে থাকলেও সেটা করা আমি বিধেয় মনে করি না। ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের যেটা পরম বন্ধন, সেটা ও যে আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। আমি এখানে থাকি বা চলে যাই, তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। ও চিরকাল এখানে ওর পিতামাতার স্নেহনীড়ে আদরে থাকতে পেলেই চরিতার্থ হবে মনে করে। ওর নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছে নেই, কোনও আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনও সাধ আহ্লাদ নেই! ওর পিতামাতার যা অভিরুচি, ওরও অবিকল তাই। আমাকে ভুলেও ও কখন কোনও অনুরোধ করে না। কোনও দিন ওর মনের কোনও সাধ, কোনও বাসনা—ও আমার কাছে জানায়নি। আজ পর্য্যন্ত ওর কাছে আমি একটা কোনও উচ্ছ্বসিত সোহাগের বাণী শুনতে পাইনি। ওর যত কিছু স্নেহ-ভালবাসা-ভক্তি-অনুরাগ সমস্তই যেন একমাত্র এঁদের দুজনেরই একচেটে সম্পত্তি। আর কারুর তাতে বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই বোধ হয়।"

গৃহিণী এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "ওগো, শুনছো?—লিলি আমাদেরই সব চেয়ে বেশি ভালবাসে বলে নরেশের ভারি রাগ হয়েছে।"

কর্ত্তাও সহাস্য মুখে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে খুকী?—তুই আমাদের সব থেকে ভালোবাসিস বলে কি নরেশ রাগ করে?"

লীলা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। রায় বাহাদুর চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "এঃ নরেশ! তুমি দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলেমানুষ! এর জন্যে কি এতো রাগারাগি করতে আছে? লোকে শুনলে যে তোমায় ভারি ঠাট্টা করবে!"

নরেশ তখন অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন, এ ছেলেমানুষী নয়, আর এ ব্যাপারটা এমন হেসে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। আমাদের দুজনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়েছে—তার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার পক্ষে ঐ জিনিসটাই আজ প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! তাই আমি ওটাকে আর মোটেই সহ্য করতে পারছি না।"

কর্ত্তা নরেশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "তাহ'লে দেখছি নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বাবাজী!"

নরেশ বলিল, "তা হ'তে পারে—কিন্তু সে জন্যে আপনারাই সম্পূর্ণ দায়ী।"

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"কি রকম?"

নরেশ বলিতে লাগিল—"আপনারা যেন আমাকে এখানে একটা কলের পুতুলের মতো করে রেখেছেন—আমি যেন আপনাদের আদুরে মেয়ের একটা খেলনার সামিল! সে যদি ভুলেও কোন দিন আমাকে তার চেয়ে একটু বেশি কিছু মনে ক'রে, সেটা বোধ হয় আপনারা কেউই সহ্য করতে পার্ব্বেন না।"

কর্ত্তা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নরেশ, তুমি একটু সংযত হোয়ে কথা কও!"

নরেশ হাত জোড় করিয়া বলিল, "আজকের মতো আমার বেয়াদবিটুকু আপনারা মাপ করবেন। আমি আজ খোলাখুলি গোটাকতক কথা বলতে চাই। আমার বক্তব্য আর কিছু নয়,—আমি শুধু আপনাদের জানাতে চাই, যে, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় চিরদিন পরিবৃত থাকলে কোন বালিকাই তার স্বামীর যথার্থ পত্নী হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারে না। এই দায়িত্বহীন বেষ্টনের মধ্যে বন্দিনী হ'য়ে থাকলে, এও বোধ হয় কোন দিনই যাকে

বলে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী, সংসারের কর্ত্রী, পতির সহধর্ম্মিণী বা স্বামীর জীবনসঙ্গিনী—তা হো'য়ে উঠতে পারবে না। চিরকাল এম্‌নিতর এক অবোধ বালিকাই থেকে যাবে!"

কমলার চোখে মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুস্পষ্ট বিদ্রূপের ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, "তবে যে বল্‌তে—ওর এই ছেলেমানুষীটুকুর জন্যেই লীলাকে তোমার সব চেয়ে বেশি মনে ধরেচে?"

নরেশ ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল—"সে কথা আমি এখনও অস্বীকার করছি না বৌদি! ওর ওই বালিকাসুলভ স্বভাব যথার্থই আমাকে মুগ্ধ করেছে—ওর ওই শান্ত স্নিগ্ধ সরলতা আমাকে যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ কিরণে অভিষিক্ত করে দিয়েছে! ওর অনাবিল সঙ্গ, অকলুষ স্পর্শ যেন নির্ম্মল ঊষালোকের মতো আমার দেহ মন উজ্জ্বল ও পবিত্র করে দিয়েছে! ও যেদিন হাসিমুখে আমারই গলায় তার বরমাল্যখানি পরিয়ে দিলে, সেদিন আমি ওকে পেয়ে আমার জীবন ধন্য মনে করিছিলুম; আমার জন্ম সার্থক হ'ল ভেবেছিলুম! জগতের যা কিছু সৎ, যা কিছু মঙ্গল,—যা কিছু কল্যাণকর,—তারই মূর্ত্তিমতী ছায়ার মতো ও সেদিন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল! ওর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিখানি সেদিন বিকশিত শতদলে কমলার কনক-প্রতিমার মতো আমার চক্ষে যেন মহামহিমময়ী হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছিল! কিন্তু আজ আর আমাদের মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই। আজ আমি ওর একান্ত নিকটতম আত্মীয় হ'য়ে শুধু ওকে প্রশংসার চক্ষে দেখেই পরিতৃপ্ত হ'তে পার্চ্ছি না!—আমি চাই যে সেও আজ আমাকে তার অনির্ব্বচনীয় প্রেমে অভিষিক্ত ক'রে নিক। আজ আর আমি শুধু প্রতিমার সম্মুখে অর্চ্চকের আসন অলঙ্কৃত করে নির্ব্বিকার বসে থাকতে পার্চ্ছি না; আজ আমি চাই যে ওর অন্তরের সুপ্ত ভাবরাশি জাগ্রত ও জীবন্ত হ'য়ে উঠে আমার হৃদয়ের সকল চিন্তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে তাকে তৃপ্ত করে দিক্—শান্ত করে দিক্।—আমার এ দুঃখদগ্ধ জীবন আজ সেই মহামিলনের আনন্দ কিরণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক! জন্মার্জ্জিত অভ্যাস ও সংস্কারের দোষে যে আকর্ষণটা আজ তার মনে প্রবল হোয়ে উঠে আমাকে তার কাছ থেকে দূরে রেখে দিয়েছে—আমি নিষ্ঠুরের মতো সেটাকে চূর্ণ করে দিয়ে—আজ আমাদের দুজনের মধ্যে সব ব্যবধান দূর করে ফেল্‌তে চাই!"

গিন্নী চুপি চুপি কর্ত্তার কাণে কাণে বলিলেন, "জামাই দেখ্‌ছি মেয়েটাকে খুব ভালবাসে!"

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন "হুঁ, কিন্তু ছোক্‌রার দেখ্‌ছি মাথার গোলমালও একটু আছে। বড় নির্লজ্জ বেহায়ার মতো যা-তা আমাদের সাম্‌নে বলছে!"

গিন্নী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজকালকার ছেলেরা যে গুরু-গুরু মানে না গো!"

লীলা ধীরে ধীরে জননীর নিকট আসিয়া বলিল, "মা, আমার নতুন নেকলেস্‌টা বার ক'রে দিও, চারু বাবুর ওখানে আমি একলাই যাবো মনে করছি। এই নিয়ে যখন এত রাগারাগি—তখন তুমি না যেতে পারলেও আমাকে অন্ততঃ যেতেই হবে দেখছি!"

কমলা কথাটা শুনিতে পাইয়া লীলার পিঠে একটি ছোট চাপড় মারিয়া বলিল, "আঃ, বাঁচালি ভাই!—"তার পর নরেশের কাছে আসিয়া বলিল, "তোমার উনি নেমন্তন্ন যেতে রাজি হয়েছেন, এইবার সব গোল মিটলো তো?—নাও,—এখন চল, নাইবে খাবে চল—"

নরেশ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—না এ শুধু নেমন্তন্ন যাওয়া না যাওয়ার কোনও কথা নয়,—এটা তার চেয়েও ঢের গুরুতর কথা। নেমন্তন্ন যেতে চা'ক্ বা না চা'ক্, তাতে আমার কিছু যায় আসে না!"

লীলা মুখখানি ভারি করিয়া জননীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখ্‌লে তো মা! যেই রাজি হলুম, অম্‌নি বল্‌লে যাক্ না যাক্ তাতে কিছু যায় আসে না!—এ কি রকম বল তো! উনি যখন যা চান, যেই কিন্তু সেটা করা হয়—অম্‌নি বলেন—'আমি তো তা বলিনি!' তখন আবার ঠিক্ উল্টো আর একটা কিছু ধরে বসেন!—আমি বাপু অত মন যুগিয়ে চল্‌তে পারি না!"

গৃহিণী তখন কন্যার পক্ষ লইয়া জামাতাকে বলিলেন, "নরেশ! তুমি কিন্তু বাবা আজ এই নেমন্তন্ন যাওয়া নিয়েই সকাল থেকে রাগারাগিটা বাধিয়েছো?"

নরেশ বলিল, "না মা, সে জন্যে নয়, বিবাদটা হচ্ছে আসলে—আমাদের দু'জনের যে প্রকৃত সম্বন্ধ—তারই চূড়ান্ত দাবী দাওয়া নিয়ে!—আমি স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর

যা যথার্থ প্রাপ্য, তাই থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে সৌভাগ্য ক্রমে আমি ওর কাছ থেকে যে সহানুভূতিটুকু পাই, সে যেন দীনের প্রতি দাতার করুণা ভিক্ষার মতো! নাম যশ পুণ্য বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে উদ্বোধিত যে কাজ, তার সঙ্গে কোন দিনই হৃদয়ের কোনও ঐকান্তিক যোগ থাকে না। আমিও তাই আজ পর্য্যন্ত ওর হৃদয়ের আন্তরিক কোনও পরিচয় পেয়ে ধন্য হ'তে পারিনি—আর তা বোধ হয় কখনো পার্ব্বোও না—যদি না ওকে আমি শীগ্‌গির আপনাদের কাছ থেকে তফাৎ ক'রে নিতে পারি!"

গৃহিণী শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তবে লীলাকে আমাদের কাছ থেকে তফাৎ ক'রে নিতে চাও?"

কর্ত্তা বলিলেন—"তোমার উদ্দেশ্যটা আমরা ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি না নরেশ!"

নরেশ বলিতে লাগিল, "আমি চাই ওকে আমার সত্যকার স্ত্রীরূপে পেতে,—আর সেটা সম্ভব হবে কেবল সেই দিনই, যে দিন ও বুঝ্‌তে পারবে যে, ও আর শুধু আপনাদেরই কন্যা নয়, আমার স্ত্রীও বটে। যে দিন, যে মুহূর্ত্তে ও জানতে পারবে যে, আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে গেলেও ওর দিন বেশ সুখেই চল্‌তে পারে, সে দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমি ওর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারবো।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌ছে এ?"

পেচকের মতো দুই চক্ষু বাহির করিয়া উভয় হস্তই নাড়িতে নাড়িতে কর্ত্তা বলিলেন—"কি জানি! কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!"

নরেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিল, "কেবলমাত্র পিতামাতার অনুগত আদুরে মেয়ে হওয়া ছাড়া, ওকে যদি কোনও দিন পতির অনুরক্তা স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী সুশীলা ও সুচরিতা পত্নী হ'তে হয়, তাহ'লে এই বেলা ওকে এ বাড়ী ত্যাগ করে যেতে হবে। এ ভাবে এখানে থাকলে ওর জীবন যে পথে গ'ড়ে উঠ্‌বে, আমরা সকলেই তাতে চিরকালের জন্য অসুখী হবো—আমি তাই সময় থাকতে ওকে আমার নিজের আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

নরেশের মনোগত অভিপ্রায়টি যখন এমনই নিদারুণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, আর তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না, তখন কাতর ভাবে গৃহিণী বলিলেন, "লীলাকে ছেড়ে যে আমরা থাকতে পারবো না বাবা! ওকে যদি তুমি কেড়ে নিয়ে যাও, তাহ'লে আর আমরা বাঁচবো না!"

কর্ত্তাও এবার নরম হইয়া বলিলেন, "দেখ নরেশ, একটা কথা বলি শোনো। তুমি তো জানো—আমাদের পাঁচটি সন্তান হ'য়েছিল। কিন্তু তাদের চারটিকে একে একে ভগবান তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন। এখন কেবল ওই একটা মেয়েই আমাদের জীবনের সম্বল পড়ে আছে, ওকে নিয়েই কোনও রকমে আমরা বেঁচে আছি—"

ব্যাকুল হইয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "ওকে আমরা চোখের আড়াল করতে পার্ব্বো না; আর জন্মাবধি আমাদের ছেড়ে ও কখনও কোথাও গিয়ে এক দিনের জন্যে থাকেনি। ও কি আমাদের কাছ থেকে যেতে পারে? ও গেলে আমরা যে এ বাড়ীতে আর একদণ্ডও তিষ্ঠুতে পার্ব্বো না!"

নরেশ অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "কাজটা যতই কেন কঠিন ও কষ্টকর হোক্ না, এ আপনাদের করতেই হবে। আপনারা উদ্যোগী হ'য়ে যথা সময়ে যদি না ওকে ওর নিজের গৃহে পাঠান, তাহ'লে সবার বড় আত্মীয় হয়েও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবেন ওর আপনারাই। তাই বলছি, প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন—আমি ওকে সময় থাকতে ওর স্বস্থানে নিয়ে যাই।"

গৃহিণী এবার কাঁদ-কাঁদ হইয়া কর্ত্তাকে বলিলেন, "ওগো, কি হবে তাহ'লে? আমি লীলাকে ছেড়ে কি করে থাক্‌বো? তুমি নরেশকে একটু বুঝিয়ে বল না!"

কর্ত্তা তখন চেয়ার হইতে উঠিয়া নরেশের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ নরেশ, তোমাকে আমরা ভালো ছেলে ব'লেই জানি। আমাদের যাতে কষ্ট হবে, সে কাজ বোধ হয় তুমি কখনই কর্ব্বে না।"

নরেশ হেঁটমুখে মাটির দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "অপ্রিয় হ'লেও কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা চলে না। জানি, আপনাদের খুবই মনকষ্ট হবে; কিন্তু উপায় নেই। দু'দিনের জন্যে সেটুকু কোনও রকমে সহ্য ক'রে থাকতে হবে। স্নেহের বশে অন্ধ হোয়ে এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে,

আপনাদের মেয়েরই আখের-উমের মাটি করা হবে। আমি যদি এই বেলা ওকে এখান থেকে না নিয়ে যাই, তাহ'লে আমাদের দু'জনের জীবনই চিরকালের জন্যে অসুখী হ'য়ে যাবে; আর আমাদের সে অবস্থাটা, আমি জানি, আপনাদের পক্ষেও মোটেই প্রীতিকর হবে না। তাই মিনতি করে বল্‌ছি, আর অমত কর্ব্বেন না, কাল দিন ভালো আছে, কাল আমরা আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে যাই।"

ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে আগুণ হইয়া কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"অসম্ভব! সে হ'তে পারে না নরেশ!"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের এই সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্যেই কি আমরা তোমার হাতে লীলাকে তুলে দিয়েছিলুম? বিয়ের আগে তো তোমার সঙ্গে এ নিয়ে একটা বোঝাপড়া হ'য়েছিল—যে লীলা আমাদের এখানেই থাক্‌বে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়, সে কথা তখন বার বার ক'রে আমি ওকে বলিছি,—ও তখন তাতেই স্বীকার হয়েছিল; কিন্তু এখন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাচ্ছে! দেখ নরেশ, আমি তোমাকে এখনও ভালো করে বল্‌ছি, মিনতি করে বল্‌ছি, তোমার ও দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। তোমার ভবিষ্যতে যাতে ভাল হয়, তোমরা স্বামী স্ত্রী দু'টিতে জীবনে যাতে না কখন কষ্ট পাও, আমি তার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করে রেখেছি। তবু যদি তুমি এমন অন্যায় অভদ্রতা করতে চাও, তাহ'লে জান্‌বো যে, আমরা ভুল ক'রে একজন ইতরের হাতে মেয়ে দিয়েছি। দেখ, একটা কথা বলি তোমায় শোন,—হয় ত তুমি যা ব'ল্‌ছ সব ঠিক্; কিন্তু আমরা কটা দিনই বা আছি?—এ বৃদ্ধ বয়সে আর আমাদের এত বড় আঘাতটা দিয়ো না। যে কটা দিন বাঁচি—আমাদের সুখে মর্‌তে দাও। আমি তোমার কাছে এইটুকু ভিক্ষে চাচ্ছি। এ বংশের কেউ কখনও কারুর কাছে এতটা হীনতা স্বীকার করেনি—"

কর্ত্তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া নরেশ বলিল, "আমাকে আপনারা মাপ করুন। অন্য কোন উপায় থাক্‌লে আমি কখনই এ কাজ করতুম না; কিন্তু আমি নাচার। হাজার অপ্রিয় হলেও এ কাজ আমাকে করতেই হবে। আজ যদি আপনাদের মুখ চেয়ে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে ইতস্ততঃ করি, তা'হলে জন্মের মতো আমাকে অসুখী হ'য়ে থাক্‌তে হবে। সুতরাং লীলাকে আমি আজ-কালের মধ্যে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো জানবেন,—এ বিষয়ে কারুর কোন আপত্তিই আমি শুনবো না স্থির করিছি।"

গৃহিণী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "না নরেশ, লীলাকে আমরা কিছুতেই যেতে দিতে পার্ব্বো না।"

কমলা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "নিশ্চয়, কখনই যেতে দেবো না। কার সাধ্য লীলাকে এ বাড়ী থেকে এক পা নিয়ে যায়!"

অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদারের মলিন মুখে একটা করুণ হাস্যের বিবর্ণ ছায়া দেখা দিল! মর্ম্মান্তিক হতাশের একটা বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি কমলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সে যে হয় না মা; লীলার স্বামী যদি তাকে এখানে রাখতে অসম্মত হয়—তাহ'লে জোর করে তাকে এখানে ধরে রাখবার আমাদের কোন আইনসঙ্গত অধিকার নেই! নরেশের সঙ্গেই ওকে যেতে হবে—তা সে যেখানেই হোক!"

লীলা তাহার উদ্গত অশ্রুজল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে মায়ের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, "না মা—আমি তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পার্ব্বো না!"

গৃহিণী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া প্রায় সরোদনে বলিতে লাগিলেন—"কি করবে মা, না পারলেও তোমাকে যেতেই হবে; হিঁদুর মেয়ের যে পতি ভিন্ন আর গতি নাই! আর শুন্‌লে তো মা,—উনি বললেন তোমাকে রাখবার আমাদের কোন অধিকারই নেই!' কর্ত্তব্য যতই কঠোর হোক্ না কেন, আমরা তা পালন করতে বাধ্য!"

লীলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কমলা তাহার চোক দু'টি মুছাইয়া দিতে দিতে নরেশকে ভর্ৎসনার সুরে বলিতে লাগিল, "ছিঃ! তুমি এতবড় শয়তান! তোমার শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? তোমার মনে কি একতিল বিবেচনা নেই? আমাদের সকলকে ব্যথা দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তুমি একে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও? কিন্তু—আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দিচ্ছি না জেনো! লীলা এখনও ছেলেমানুষ—নেহাৎ কচি বাচ্ছা! এই দুধের মেয়েকে আমি একলা পাঠাবো তোমার মতো একজন একগুঁয়ে লোকের ঘর করতে? সে তুমি মনেও

কোণেও ঠাঁই দিও না। আমিও যাবো ওর সঙ্গে—যেখানেই তুমি নিয়ে যাও না কেন ওকে। আমি কিছুতেই একে একলা তোমার মতো এক গোঁয়ারের হাতে ভরসা ক'রে ছেড়ে দিতে পারি না। যার মনে এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই, সে সব করতে পারে! কোন্ দিন রাগের মাথায় হয় ত একে মেরেই বস্‌বে! আমি থাকবো এর কাছে অষ্ট প্রহর পাহারা দিয়ে, দেখি তুমি এর কি করতে পারো?"

কমলার এতবড় ভৎর্সনাটা উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দিয়া, তাহার সমস্ত ভীতি প্রদর্শনকে এক মুহূর্ত্তে ব্যর্থ করিয়া, নরেশ খুব আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ তো বেশ ভাল কথা বৌদি! এই সবে প্রথম নতুন সংসার পাততে যাচ্ছি—আমরা দু'জনেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিছুই জানি না। তুমি যদি দয়া ক'রে গিয়ে আমাদের গোড়ার দিকটার সব গোছ-গাছগুলো ক'রে দাও, সে তো তা হ'লে খুব ভালই হয়!"

দ্বিতীয় অংশ

১

কমলা মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাজেও তাহাই করিয়াছে। নরেশ যেদিন সত্য সত্যই লীলাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিল, কমলাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। তারপর আজ প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল—কমলা কিন্তু এখনও লীলার নিকট হইতে চলিয়া আসিতে পারে নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পত্নীকে তাহার পরমাত্মীয় দু'টীর স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনায়, পতি-পত্নীর মধ্যে যে কঠিন ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, অসাধারণ সংযম ও অধ্যবসায়ের সহিত নরেশ তাহা দূর করিবার একান্ত চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সেদিনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে সন্ধি বা শান্তির কোনও পুণ্য প্রতিষ্ঠান ঘটিয়া উঠে নাই; তাই কমলাও আর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে পারে নাই।

শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্প দিন পরেই সৌভাগ্যক্রমে নরেশ গভর্মেণ্টের 'মিউনিশন' বিভাগে যুদ্ধসংক্রান্ত মাল সরবরাহের কাজ পাইয়াছিল। তাই আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই লীলার মনোরঞ্জনের জন্য সে একখানি প্রাসাদ-তুল্য নূতন বাড়ী কিনিয়াছে। প্রিয়তমার পিতৃগৃহের যে ঘরে যেখানে যে আস্‌বাবটি যেমন করিয়া সাজানো ছিল, নরেশ কলিকাতার সমস্ত দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হুবহু সেই রকমেরই সব জিনিসপত্র আনিয়া এ বাড়ীখানিকেও ঠিক তেমনিই করিয়া সাজাইয়াছে; কিন্তু তথাপি লীলার নিকট হইতে এখনও নরেশ তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা লাভ করিতে পারে নাই।

সেদিন সকালে নূতন বাড়ীর ড্রয়িংরুমে একখানি আরাম-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া লীলা কার্পেটের উপর পশমের নক্সা বুনিতেছিল; আর কমলা পাশের একখানি কৌচে বসিয়া লীলাকে নবপ্রকাশিত একখানি উপন্যাস পড়িয়া শুনাইতেছিল। গল্পটী শুনিতে শুনিতে হঠাৎ লীলার হাতের বোনার কাঠি কার্পেটের অসমাপ্ত ঘরে স্থির হইয়া গেল। কমলা তখন পড়িতেছিল—

"স্ত্রী এবার জোর করিয়া বলিল, 'না!' গোড়ায় বটে স্বামীর অপরাধ হইয়াছিল; কিন্তু এবার সম্পূর্ণ দোষ স্ত্রীর। প্রাণপণ যত্নে সে পত্নীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে স্ত্রী তাহার অপরাধ ভুলিয়া গিয়া হাসিমুখে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। যাহাতে অন্ততঃ করুণাপরবশ হইয়াও স্ত্রী তাহাকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, এই আশায় দিবারাত্রি বেচারী কত না কষ্ট, কত না মনোবেদনা সহ্য করিতেছে। যত বড় একগুঁয়ে মেয়েই হোক্ না কেন, পিতামাতার প্রতি যত বেশি টানই তার থাক্ না কেন, স্বামীর সে প্রাণপাত যত্ন, সে অগাধ অকৃত্রিম ভালবাসা যে এমন অযাচিত ভাবে পায়, সে কখনই তার অনুতপ্ত পতিকে মার্জ্জনা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুত এই মেয়েটীর চরিত্র! যে, সে কিছুতেই তার এমন স্বামীরও অনুরাগিণী হইতে পারিল না। স্বামী তার যেমন প্রতি দিন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার সহস্র হানি স্বীকার করিয়াও বিমুখ পত্নীর প্রেমনিষ্ঠ হইয়া তাহাকে সদয় দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, স্ত্রী কিন্তু তেমনিই নীচ স্বার্থপরের ন্যায় তার সুখ সুবিধার ঈষৎ ব্যতিক্রমটুকু কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। স্বামী যেমন তাহার অপরাধের তুলনায় শতগুণ বেশি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে—স্ত্রী কিন্তু

তেমনি নির্ব্বোধের ন্যায় তার নিজের অপরাধের বোঝা প্রতি দিন ভারি করিয়া তুলিতেছে! কাঁচা ঘুমটি ভাঙিয়া দিয়া শিশুকে জাগাইয়া তুলিলে, তার অভিমানের একঘেয়ে কান্না যেমন কিছুতেই থামিতে চাহে না, এ অভাগিনীর অভিমানের অন্ধকারও যেন তেমনি কিছুতেই দূর হইতেছিল না। সহস্র চেষ্টা করিয়াও স্বামী তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছে না।"

কমলার পড়ায় বাধা দিয়া লীলা চকিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদি! সত্যিই কি ও বইখানায় ওসব কথা লেখা রয়েছে?"

"সত্যি নয় ত কি আমি এসব বানিয়ে বলছি?"

"যা পড়লে তাই কি সব ঠিক অক্ষরে অক্ষরে লেখা?"

"অত কথায় কাজ কি বাপু, তুমি কেন নিজেই একবার স্বচক্ষে পড়ে দেখ না।" এই বলিয়া কমলা বইখানি লীলার হাতে তুলিয়া দিল। লীলা অনেকক্ষণ বইখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া কমলাকে ফিরাইয়া দিল। কমলা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া লীলার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল। বইখানি ফেরত পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এখন বিশ্বাস হ'লো তো?"

লীলা একটু চিন্তিত ভাবে বলিল, "দেখ, এ উপন্যাসখানার ঘটনাটা আমার জীবনের ব্যাপারের সঙ্গে যেন অনেকটা মিলে যাচ্ছে! কিন্তু কে লিখেছে—তার নাম নেই তো? গ্রন্থকারের নাম কি জানো?"

"কি ক'রে জান্‌বো বল? তুমি যা বল্‌লে, বইখানা পড়তে পড়তে আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল বটে! তা আমি ভাবলুম, বোধ হয় হঠাৎ কোন দৈবচক্রে এ উপন্যাসের ঘটনা সব তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর অবস্থার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে!"

লীলা অসহিষ্ণুর মত তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না বৌদি! তুমি জানো না, এ নিশ্চয় কেউ জানাশুনো লোক, আমাকে উপহাস কর্ব্বার জন্যে ইচ্ছে করেই এসব লিখেছে। কিন্তু কে সে বল ত?"

"তোমাদের ভেতরকার ঘরোওয়া কথা সব জানে অথচ বইটই লিখ্‌তে পারে—এমনতর আত্মীয় যে কেউ আছে, তা তো আমি জানি না!"

"দেখ, আমার বোধ হয় এ কোনও পুরুষ মানুষের লেখা, বন্ধুত্বের খাতিরে যাঁর কাণে এসব কথা কতকটা পৌঁছেচে!"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা কোন্ দিক থেকে আর একজনের কাণে পৌঁছেচে শুনি? তবে কি নরেশই মনের দুঃখে—"

বাধা দিয়া লীলা বলিল—"সে যেদিক থেকেই হোক্ না, —যে লোকটা কিন্তু লিখেছে, সে একটি একের নম্বর গাধা! পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্বাভাবিক টান, আর মেয়েছেলের প্রতি তাঁদের অগাধ স্নেহটাকে এ মূর্খের মত কেবল কদর্য্য বিদ্রূপ করেছে! তার মাধুর্য্য বা মহত্ত্বটুকু একবারও এই হৃদয়হীন লেখকটির চোখে পড়েনি, কিম্বা হয়ত' ইচ্ছে ক'রেই সেদিকটায় চোখ বুজিয়ে লিখে গেছে!"

কমলা এবার উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি যে দেখছি বইখানার অপ্রকাশিত লেখকটির ওপর একেবারে হাড়ে চটে গেলে!"

"যাবো না!—এক যায়গায় দেখলুম, নির্লজ্জের মত লিখেছে কি না—'সে স্ত্রী অসতী, যে স্বামীর চেয়ে তার পিতামাতাকে বেশি ভালবাসে!' সতীত্ব সম্বন্ধে লেখকটির কি চমৎকার ধারণা দেখেছো? সাধে কি মূর্খ বলছি,—পিতামাতাকে ভালবাসা ভক্তি করা যে সতীত্বেরই একটা আদর্শ গুণ—এ সাধারণ জ্ঞানটুকুও এ লোকটির মাথায় নেই!"

"না লীলা, এ কথায় আমি তোমার সঙ্গে সায় দিতে পারলুম না। কেন না, তুমি যা এতে নেই বল্‌ছো, তা কিন্তু ঠিক্ পরের পাতাটায়ই রয়েছে—সবটা পড়লে বুঝতে পারতে;—এই শোনো—"

কমলা পড়িতে লাগিল—"মেয়ে যখন অবিবাহিতা বালিকা, তখন পিতামাতার প্রতি তার সমস্ত স্নেহ ভালবাসা অর্পিত থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু যৌবনে সুযোগ্য স্বামীর সাহচর্য্যে চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনিই পতিপ্রেম তার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ ক'রে রাখে। তার পর যখন সে সন্তানবতী জননী হইয়া উঠে, তখন অবশ্য তার সেই মাতৃহৃদয় সমস্ত জগৎকেই অপরিসীম স্নেহধারায় অভিষিক্ত ক'রে দিতে চায়।"

দুই কাণে দুই হাত দিয়া লীলা বলিয়া উঠিল, "থাক্—থাক্, বৌদি ; বন্ধ কর, ও ছাই-ভস্ম আর তোমার পড়তে হবে না। আমি ও শুন্‌তে চাই না। যতই শুন্‌ছি, ততই বইটার ওপর আমার অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে—আর যে লোকটা লিখেছে তার ওপর আমার একটা ঘেন্না ধরে যাচ্ছে! ছিঃ! তুমি কি আর পড়বার মতো বই খুঁজে পেলে না বৌদি?"

কমলা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে নতমুখে বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। লীলাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কার্পেটখানার অসমাপ্ত ফুলটা শেষ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল ; কারণ, মন তার বোনার কাঠির অনুসরণ না করিয়া, তখনও সেই ছাই-ভস্ম বই-খানার কথাই তোলাপাড়া করিতেছিল। শেষটা আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ও বইখানা শেষ হয়েছে কি ভাবে বৌদি? ওদের পরিণামটা কি হ'লো শুনি?" কথাটা লীলা এমন তাচ্ছিল্য ভাবে জানিতে চাহিল, যেন এ বিষয়টা শুনিবার জন্য তার এমন কিছু বিশেষ আগ্রহ নাই। কিন্তু তাহার এ ছলনা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কমলাকে একটুও প্রতারিত করিতে পারিল না। লীলার মনের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া কমলা চুপটি করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। কোনও উত্তর দিল না, যেন কথাটা সে শুনিতেই পায় নাই।

লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "শেষটা ওদের কি হ'ল বৌদি?" যেন কতই অন্যমনস্ক ছিল, এমনি ভাবে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের?"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, ওই যে গো, তোমার হাতের ঐ জঘন্য বইখানায় যে স্বামী-স্ত্রীর কথা লিখেছে!"

কমলা তেমনিই অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "শেষটা তেমন ভাল নয়,—বড় করুণ আর বিয়োগান্ত ব্যাপার!"

লীলা এবার রাগিয়া উঠিল,—অনেকক্ষণ আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। তার পর কিন্তু আবার নরম হইয়া জানিতে চাহিল "কার পরিণামটা বেশি শোচনীয় করেছে দেখলে?"

কমলা এবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আন্দাজ করে বল দেখি কার? দেখবো বলতে!"

কার্পেট, কাঠি, পশমের গোলা সমস্ত পাশের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া লীলা বলিল, "এসব স্থলে মেয়ে মানুষকেই ভুগ্‌তে হয় বেশি। নিশ্চয় দুঃখ পেয়েছে শেষটা স্ত্রীই সব চাইতে ; কেন না, গোড়া থেকেই লেখক দেখিয়েছেন যে, সে কষ্ট পাচ্ছে কেবল নিজের দোষে!"

কমলা বইখানির শেষ পরিচ্ছেদটি খুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "ঠিক বলেছিস্ লীলা,—এ স্ত্রী দেখছি শেষটা আর একজনের প্রেমে পড়ে গেল!"

লীলা যেন চম্‌কাইয়া উঠিল, বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল "সে কি! আর একজনের প্রেমে পড়ে গেল?"

"হ্যাঁরে, এই যে এখানে লিখেছে শোন্ না—" বলিয়া কমলা পড়িতে লাগিল—'সকল নারীর জীবনেই এমন এক দিন আসে, যে দিন প্রেমের সবচিন্ ঠাকুরটি তাঁর সুরভিত পুষ্পধনুর আঘাতে তার হৃদয়ে প্রণয়ের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন। সে দিন যদি সে স্বামীকে না পায়, স্বামীকে ভালবাসতে না পারে, তাহ'লে অনিবার্য্য ভাবে অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার কাছে সে একটুও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে। অনাদিকাল থেকে জগতে প্রকৃতির এই নিয়ম চলে আসছে।'

লীলা এবার ভীত হইয়া উঠিল। সভয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়? সে কি বৌদি! হ্যাঁগা সত্যি?"

"তাই তো জানি। আর চোখেও দেখেছি অনেকগুলো এ রকম ঘটনা।"

লীলা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "বল কি বৌদি? স্বামীকে ছেড়ে অন্য একজনকে?—কি ভয়ানক!"—বলিতে বলিতে লীলা টেবিলের উপর হইতে বুনিবার সরঞ্জামগুলা তুলিয়া লইয়া আবার বুনিতে সুরু করিল ; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বোনার কাজ বন্ধ করিয়া আপন মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কমলাও আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে বই পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, তার স্বামীর কি হ'ল বৌদি?"

"তারও একটা কিনারা হয়েছে দেখলুম। সে বেচারি

২৪৭৯/তাং ১১/১০/১৩৮১

ভয়ানক অসুখে পড়েছিল। স্ত্রী তো ঐ রকম, দেখবার শোনবার আর কেউ ছিল না। শেষ পাড়ার একজন অনেক সেবা শুশ্রূষা ক'রে তাকে বাঁচালে। সে একটি গরীবের মেয়ে,—সুন্দরী, বয়সও হয়েছে ; কিন্তু পয়সার অভাবে বিবাহ হয়নি তখনও—"

"সে কি করে জুটলো?"

"তারা যে ওদের বাড়ীর পাশেই থাক্‌তো! বিধবা মা আর ঐ সোমত্ত মেয়ে, দুটীতে কায়ক্লেশে সংসার চালাতো। বড় গরীব, কোনও দিন খেতে পেতো, কোনও দিন পেতো না। ইনি তাদের দুঃখের কথা জানতে পেরে, সহানুভূতি জানিয়ে, প্রায়ই কিছু কিছু সাহায্য করতেন। তাই উপকারীর প্রত্যুপকার কর্ব্বার জন্যে, ওঁর প্রতি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেয়ে, তারা মায়ে-ঝীয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণপাত করে রোগশয্যায় তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। বিমুখ পত্নীর নিরবচ্ছিন্ন অবহেলায় স্বামীর মনটা এত দিন যেন শূন্য কুটীরের মতো হা-হা করছিল। পীড়িত অন্তরটি তার কাতর হ'য়ে এত দিন একটি প্রাণের মত মনের-মানুষের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ফিরছিল ; ঠিক সেই সময়ে এই মেয়েটি এসে, ধীরে ধীরে তার অক্লান্ত সেবা যত্ন দিয়ে, তার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রতিনিয়ত নিবেদন ক'রে, আর সুন্দর সর্ব্বাঙ্গে তার মুকুলিত যৌবন-সঞ্চারিত তরুণ লাবণ্যশ্রীর দুর্নিবার আকর্ষণ নিয়ে সেই শূন্য মন্দিরটি সম্পূর্ণ দখল করে ফেললে! তার পর এমন এক দিন এল, যেদিন সেই দু'টি অপূর্ণ জীবন একত্র মিলিত হ'য়ে পরস্পরের নিবীড় প্রেমে বিলীন হ'য়ে সার্থকতা ও সম্পূর্ণতায় চিরবাঞ্ছিত সুখস্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রইল।"

লীলা শুনিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ—সে মেয়েটা কি গো! তার একটা বিবাহিতা স্ত্রী রয়েছে জেনেও তাকে—"

মৃদু হাসিতে হাসিতে কমলা বলিল, "তাতে কিছু এসে যায় না বোন্! যে ভালবাসে সে তার প্রেমাস্পদের কাছে কণামাত্র প্রতিদান পেলেই জীবন ধন্য মনে করে। এ মেয়েটীও তার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীর কাছে তার প্রাণঢালা ভালবাসার আশাতিরিক্ত বিনিময় পেয়ে, তার ঐ বিবাহিতা পত্নী বর্ত্তমান আছে জেনেও, আপনাকে বিলিয়ে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেনি। কারণ, এ বুঝতে পেরেছিল যে, সে পত্নী স্ত্রীর কর্ত্তব্যে অবহেলা করে স্বামীর উপর তার সব অধিকার হারিয়ে ফেলেছে! সে সতীন বটে, কিন্তু স্বামীর হৃদয়ের ভাগ নিতে অক্ষম!"

লীলা আর কিছু বলিতে পারিল না ; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কি যেন অভোর চিন্তায় অকূল পাথারে সে তখন তলাইয়া যাইতেছিল। তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৌদি, ঠিক্ ক'রে বল, তুমি হলে কি এ রকম অবস্থায় ঐ দুঃখী মেয়েটার মতো করতে?"

কমলা সজোরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"কখনই না।" তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি চাই সবটা নিতে, পূরোপূরি একচেটে ক'রে—নইলে কিছুই নেবো না! খুচরো ব্যাপারী তোর বৌদি নয়, বুঝলি।"

কমলার জবাব শুনিয়া লীলা আর কোনও কথা কহিল না, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে আবার বোনার কাজ সুরু করিয়া দিল। কিন্তু গোটাকয়েক ফুল তোলা শেষ না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাল কথা, তার শেষ পর্য্যন্ত কি দুর্দ্দশা হ'লো বৌদি?"

"কার?"

"সেই বিবাহিতা স্ত্রীটীর?—সে তো আর একজনের প্রেমে পড়েছিল বল্‌লে—তার পর?—তার দুর্গতিটা কতদূর গড়ালো শুনি?"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুর্গতিই বটে! তার সেই একতরফা প্রেমের স্বপ্নটা যে দিন সেই হৃদয়হীন নবাগতের পঙ্কিল বাসনার কদর্য্যতায় ঠেকে চূরমার হ'য়ে গেল, সে দিন সে তার নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে, স্বামীর কাছে ধরা দিতে গেল। কিন্তু এসে দেখলে—যে দ্বার এক দিন তারই পথ চেয়ে উন্মুক্ত পড়ে ছিল, সে পথে আজ এক আগন্তুক প্রবেশ করে তার সমস্ত অধিকার দখল ক'রে বসেছে! যে মুহূর্ত্তে সে জান্‌তে পারলে যে, স্বামী তার আর একজনকে ভালবেসেছে, অমনি তার সমস্ত অন্তর যেন ক্ষুধিত হ'য়ে সেই হারিয়ে-ফেলা স্বামীর জন্যে লালায়িত হয়ে উঠ্‌ল! সে তখন প্রাণপণে নিজের স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল ;

৫/০৫/৫৫

কিন্তু তখন আর চেষ্টা করা বৃথা, অনেক বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল তার—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই লীলা হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। বোনার সাজ-সরঞ্জামগুলা সেই চেয়ারের উপরই রাখিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরের একধারের একটা আলমারীর কাছে গেল, এবং ব্যস্ত ভাবে চাবি খুলিয়া আলমারীর দেরাজগুলা টানিয়া টানিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁজ্‌ছিসরে!"

"সে 'ফটো'খানা কোথায় আছে, জানো বৌদি?"

"কোন্‌খানা?—সেই বরক'নের বেশে তোর আর—নরেশের 'যুগলমূর্ত্তি' যেখানাতে তোলা হ'য়েছিল?"

"যাও! তুমি ভারি দুষ্টু!"

"তবে কোন্‌খানা?—বে'র আগে নরেশ তার যে ছবিখানা তোকে উপহার দিয়েছিল?"

"না, দূর!—কিন্তু কি হ'লো বল তো সেখানা?"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল "বারে মেয়ে! মনে নেই বুঝি, সেখান থেকে চ'লে আসবার পর সেই এক দিন তুই বল্‌লি যে, তার ছবি পর্য্যন্ত ও কাছে রাখ্‌বিনি,—আমি তাই তোর কাছ থেকে সেখানা চেয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছি যে!"

"তুমিই লুকিয়ে রেখেছো-বুঝি?"

"কি আর করি! ছবিখানা কি নষ্ট হবে, তাই তুলে রাখ্‌লুম। যে তোমার তখন ল্যাজ-ফোলা রাগ!—জানি, রাগ পড়লে এক দিন না এক দিন তার খোঁজ হবে—"বলিতে বলিতে কমলা উঠিয়া গিয়া তার টেবিলের টানার ভিতর হইতে নরেশের একখানা বড় ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া লীলার হাতে দিল।

"তাই তো, এখানা সেই অবধি তোমার কাছেই রয়েছে বুঝি? আর আমি চারিদিকে খুঁজে মরছি—" বলিতে বলিতে লীলা ছবিখানা না দেখিয়াই, একেবারে আলমারীর ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া, চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্থির ভাবে আবার উঠিয়া গিয়া, চাবি খুলিয়া আলমারীর দেরাজ হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া আনিয়া, দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বৌদি, ইনি কি ওই নতুন বইখানা পড়েছেন?"

"কি জানি?—দেবো না কি তাকে এখানা পড়তে?"

লীলা প্রথমটা উদাস ভাবে বলিল, "তোমার ইচ্ছে!" কিন্তু তার পরই মুখ ভার করিয়া অভিমানিনীর মত অনুযোগের কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমার ভারি ইচ্ছে যাচ্ছে, তার কাছেও বসে এই যাচ্ছে-তাই বইখানা এই রকম চেঁচিয়ে পড়ে তাঁকেও শোনাতে—না? তোমার মনের ভাবটা কি আর আমি বুঝ্‌তে পারিনি মনে করেছো?—যাতে আমি অপদস্থ হই, তোমার কেবল সেই চেষ্টা!"

কমলা ইহার কোন উত্তর দিবার আগেই একজন ঝী আসিয়া লীলার হাতে একখানা ডাকের চিঠি দিয়া গেল। লীলা চিঠির খামের উপর ঠিকানাটার লেখা দেখিয়াই বলিল, "বাবা চিঠি লিখেছেন বৌদি!"

তাড়াতাড়ি লীলা খামখানা ছিঁড়িয়া যখন চিঠিখানা বাহির করিতেছে, এমন সময় নরেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। নরেশকে দেখিয়াই লীলা চিঠিখানি আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। নরেশ একবার সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ্‌লে বৌদি! আমি যখনই এসে ঘরে ঢুকি, অমনি ও আমার সাম্‌নে থেকে সরে যায়।—আজ এক বচ্ছর ধরে আমার সঙ্গে ও এম্‌নি লুকোচুরি খেল্‌ছে!"

কমলা সে কথার আর কোনও জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে আজ এমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন? শরীরটা কি ভালো নেই?"

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শরীর বেশ আছে বৌদি, কিন্তু মনটা আজ ভারি দমে গেছে! 'গরীবের মেয়ে' বলে একখানা নতুন উপন্যাস বেরিয়েছে, তুমি পড়েছো কি?"

"গরীবের মেয়ে? হ্যাঁ—হ্যাঁ,—আমি তো সেইখানাই এখন লীলাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলুম!"

"লীলাও জানে?—কি বল্‌লে সে বৌদি, গল্পটা শুনে?"

"সে বলে ওখানা যাচ্ছেতাই,—বটতলার বাজে বই।"

নরেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না বৌদি, নেহাৎ বাজে নয়; আমি তো পড়তে পড়তে প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিলুম! মনে হচ্ছিল, যেন আমারই বিবাহিত জীবনের চিত্রখানা

যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি! এ বইখানার ভেতর থেকে আমি এমন একটা কিছু পেয়েছি, যা সত্যিই আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে ভাই!"

কমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"ও কিছু নয়,—কোনও প্যাঁচওয়া বই পড়লেই খানিকক্ষণ মনের ওপোর তার একটা প্রভাব থাকে।"

"কিন্তু বইখানি পড়ে অবধি আমার ভারি ভয় হচ্ছে,—বুঝি আমার জীবনেও শেষটা ঠিক্ ঐ রকমই ঘট্‌বে!"

"কেন, পাশের বাড়ীতে কি কোনও গরীবের সোমত্ত মেয়ে আইবুড়ো থুবড়ী হ'য়ে আছে—সন্ধান পেয়েছো?"

"ঐ তো! তোমার সবেতেই ঠাট্টা! আমি নিজের বিষয় তত ভাবি না,—লীলার জন্যেই ভয় পাচ্ছি!"

"কিন্তু আমার ভয়টা যে তোমার জন্যেই বেশি হচ্ছে!—কেন জানো?—লীলার দাদা যখন ডাক্তারী শিখ্‌ছিল, তখন সে প্রায়ই বল্‌তো যে, দেখ, এই সব রোগের লক্ষণ ক্রমাগত পড়তে পড়তে আমার মনে হ'চ্ছে, যেন আমারও শরীরে যত কিছু রোগের লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি!—তাই ভাব্‌ছি যে, 'গরীবের মেয়ে' প'ড়ে শেষটা তুমিও না কোনও গরীবকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'রে বসো!" কথাটা শেষ করিয়া কমলা খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিল!

নরেশ কিন্তু অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল, "হাসির কথা নয় কমলা!—ওটা ভারি সত্য।—তবে তোমায় আজ স্পষ্টই বলি শোন,—আমারও বুকের ভেতর মাঝে মাঝে একটা দুর্দ্দান্ত লোভ এসে উঁকি মারে। আমি তার প্রবল শক্তির কাছে হয় তো কোন দিন পরাভূত হ'য়ে যাবো! তুমি জানো না, সে কত বড় লোভ!—আমার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার সফলতা দেখিয়ে, সে আমাকে প্রতি দিন এমন প্রলুব্ধ করছে যে, ক্রমেই তাকে দাবিয়ে রাখা আমার পক্ষে শক্ত হ'য়ে পড়ছে!"

কমলা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি নরেশ!—বইখানা তো আগাগোড়া পড়লুম। তাতে এমন কিছু নেই যাতে স্বামীর দল তোমার মতো এতটা ভড়্‌কে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় যে, বইখানার সার মর্ম্ম হচ্ছে—একগুঁয়ে মেয়েমানুষদের একটু সুমতি দেওয়া! বিশেষতঃ—যাদের কাঁচা বয়েস আর অল্পদিন বে' হয়েছে, তাদের স্বামী তো প্রায়ই কালকের ছেলে,—হয় ত' সবে টাট্‌কা কলেজ ছেড়েছে, নয় ত তখনও পর্য্যন্ত পাঠশালার সম্পর্ক চোকেনি। বের আগের দিন পর্য্যন্ত কেবল ছেলে-ছোকরার দলেই তার মেলা-মেশা ছিল। তার কাছে একেবারে অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে মেলা-মেশার আদব-কায়দা সম্বন্ধে নিখুঁত অভিজ্ঞতাটুকু আশা করা যায় না। বের পরদিনই সে কিছু একেবারে পাকা স্বামীটি হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। সেটা হ'তে তার কিছু দিন সময় লাগে। তার পুরোনো অভ্যাসগুলো ফস্ করে ছেড়ে দিয়ে, সে কিছু এক দিনেই বিবাহিত জীবনের সবস্ত দায়িত্বটুকু বুঝে নিয়ে, রাতারাতিই একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না! প্রথম প্রেমের একটা প্রবল মাদকতা, জীবনে নূতন নারী-সাহচর্য্যের একটা অভিনব আনন্দ,—তাকে প্রচুর শক্তি ও উৎসাহ এনে দেয় বটে, কিন্তু সেটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে তার যথেষ্ট সময় লাগে।"

প্রবল উৎসাহের সহিত কমলার ডান হাতখানি ধরিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া দিয়া নরেশ বলিল, "ঠিক্ বলেছো তুমি! সেদিনও পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারিনি যে, কোন্‌খানে আমার ত্রুটী! যেদিন পারলুম, সেদিন সে আমার কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেল! কিন্তু তুমি তো নিজের চক্ষে দেখেছো কমলা—আজ পর্য্যন্ত তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি কি না করিছি! প্রতি দিন সব দিক দিয়ে চেষ্টা করিছি, কিসে তার প্রাণের কাছটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি। কিন্তু কিছুতেই তাকে আপনার ক'রে নিতে পারলুম না; সে আমার নিকটতম হওয়া দূরে থাক্, আরও তফাতে সরে গেল! এ সব তো তুমি চক্ষের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছ!—সে কি আমার দোষ?—আমার চিন্তা, আমার আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুল হয়ে দিনরাত তার পিছনে ফিরছে; কিন্তু সে দেখো, পাথরের মতো নিরুত্তর হয়ে আছে। তার মনস্তুষ্টির জন্যে নিত্য নূতন উপায় খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হ'য়ে পড়িছি; কিন্তু তবুও তো তার আশা আজও ছাড়তে পারিনি! তার প্রতি আমার যে অগাধ ভালবাসা, তা যেন আরও গভীর, আরও গাঢ়তর হ'য়ে উঠেছে—অথচ তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রতি দিনের পুঞ্জীভূত

নৈরাশ্যের দল যেন ভিড় করে এসে হৈ হৈ শব্দে আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! মাঝে মাঝে তারা এমন প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, আমার সমস্ত আশা-ভরসাকে একেবারে আঁধার করে দেয়! আমি তখন নিতান্ত অসহায়ের মতো একজন ব্যথার ব্যথী, আপন জন খুঁজে বেড়াই; কিন্তু কাউকেই দেখ্‌তে পাই না—কেবল তুমি—তখন তুমিই তোমার সেবাপরায়ণ শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি নিয়ে, তোমার অসীম সমবেদনার অক্ষয় সৌন্দর্য্য নিয়ে, আমার মনের মধ্যে বারবার বরাভয় মূর্ত্তিতে জেগে ওঠো—" বলিতে বলিতে দুই হাত বাড়াইয়া কাঙালের মত ক্ষুধিত দৈন্য দৃষ্টি লইয়া নরেশ কমলার কাছে সরিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র বেগে কমলা তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ—তুমি আজকাল বড় মনকষ্টে আছ, দেখতে পাচ্ছি বটে!"

নরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আজকাল?—উঃ! তুমি জানো না, কী যন্ত্রণাই আমি সইছি এই গোটা বছরের প্রত্যেক দিনগুলোয়! যেন মনে হচ্ছে—কত অনন্তকাল ধরে আমি এই দারুণ কষ্ট ভোগ করছি! আর দিনকতক যদি এই ভাবে কাটাতে হয়, তাহ'লে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো! ওকে প্রসন্ন করবার জন্যে—ওকে সুখী করবার জন্যে—ওর মুখের প্রীতি-প্রফুল্ল হাসিটুকু দেখ্‌বার জন্যে আমি এত দিন ধ'রে যে প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে এসেছি, ক্রমে সেটা আমার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝার মত ঠেকছে,—আমি যেন আর সে গুরু ভার সহ্য করতে পারছি না! দিন দিন আমার উৎসাহ ক'মে আসছে! সে চেষ্টা—সে উদ্যম—যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে সুরু করেছে। এখন আমার কেবলই মনে হয়—মিছে—মিছে!—সব মিছে! ব্যর্থ এ বিপুল চেষ্টা—পণ্ড এ প্রাণপাত পরিশ্রম! কোনও ফল হ'ল না—উদ্দেশ্য সাধন হ'ল না। পরিণাম যতদূর দেখ্‌তে পেলেম—অন্ধকারের মত মলিন,—শূন্যের চেয়েও ফাঁকা! আশার একটু ক্ষীণ রেখাও কোনও দিন আমাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌লে না। দু'টো বাহবা, কি কিছু বখশিষ্ যা বাড়ীর চাকর-বাকরেও মাঝে মাঝে পায়—আমি যদি অন্ততঃ সেটুকুও পেতুম! একটু তৃপ্তির হাসি, দুটো সোহাগের বাণী—এও কোনও দিন আমার ভাগ্যে জোটেনি! এই যে না খেয়ে না দেয়ে এক হপ্তা, পনেরো দিন ক'রে সহরের বাইরে নানান অসুবিধে, হাজার কষ্ট সহ্য করেও ঘুরে আস্‌ছি—এ কি কেবল আমার ব্যবসার উন্নতির জন্যে? কারবারের সুনাম বজায় রাখবার জন্যে? না—তারই মুখ চেয়ে? এই যে প্রতি মাসের শেষে রাতের পর রাত বিনিদ্র ব'সে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ কষে মরি—এ কি কেবল ওই মাল-সরবরাহ কাজের খাতিরেই? এর সঙ্গে কি আমার আর কোনও বড় স্বার্থ জড়িত নেই? সে কি ভাবে—কেন আমি এত পরিশ্রম করি? সে কি বোঝে যে, তার জন্যেই আমার এই কারবার নেওয়া? সে কি জানে—তার মুখ চেয়েই আমার এ উপার্জ্জন? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা রোজগার ক'রে আনছি, তাই আবার জলের মতো অকাতরে ব্যয় করছি কার জন্যে বলো ত? এই যে বাড়ী—এই যে সব আস্‌বাবপত্র—আগাগোড়া সব অগাধ অর্থব্যয়ে ঠিক তার পিতৃ-গৃহের অনুকরণে সাজিয়ে তুলিছি—এ কি আমার সখের জন্যে? না—তারই মুখ চেয়ে? তার শৈশব কৈশোর যৌবনের সঙ্গে আজন্ম-বিজড়িত যে সব পরিবেষ্টন—তাকে সাধ্যমত অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই যে আমি প্রাণপণ যত্ন করছি, এর যে কতখানি মূল্য—কতটা মর্য্যাদা—এ যদি সে একটুও বুঝ্‌তো, তাহ'লে যত বড় দুর্জ্জয় অভিমানই হোক্ না তার, সে এমন করে আমার প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাক্‌তে পারতো না। সে নির্ব্বোধ, তাই আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে তো? আমারও সমস্ত দেহ-মন আজ সেই সীমায় এসে পৌঁছেচে। তাই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌তে চায়! সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আমি যখন ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে ঘরে ফিরি, কেউ তো ছুটে এসে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে না,—কারুরই সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত সস্নেহ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আমার তনু-মন অভিষিক্ত ক'রে আমাকে আনন্দে আপ্লুত ক'রে দেয় না,—কারুরই সেবারত ব্যগ্র বাহু প্রেমবিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে আমার সমস্ত অবসাদ দূর করে দেয় না—আমার তৃষিত তপ্ত পরিশ্রান্ত চিত্তে শান্তি ও আরামের চিরবাঞ্ছিত সুখমাটুকু সাগ্রহে ঢেলে দিয়ে আমাকে তৃপ্ত ক'রে দিতে আসে না। আমি যেন সংসার-স্বর্গ সৃষ্টি করেও অমৃত লাভে বঞ্চিত হয়েছি।"

নরেশের বুকফাটা অভাব ও অভিযোগের এই মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী কমলার ডাগর আঁখি দু'টিকে অশ্রুজলে ভরিয়া তুলিয়াছিল। গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে কমলা বলিল, "মাভৈ, নরেশদা, এইবার তুমি অমৃত লাভ করে অমর হবে,—আমি তোমায় বর দিলুম।"

"অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ লীলার মতিগতি এইবার ফিরেছে ব'লে বোধ হচ্ছে,—কাজে কাজেই সেই সঙ্গে তোমার কপালও ফিরতে সুরু হচ্ছে—"

"কি বল্‌ছ তুমি, কমলা?"

"বলছি ঠিক্। ঐ দেখ লীলা আস্‌ছে—"

(ক্রমশঃ)

অন্ধ ভিখারী

শিল্পী—শ্রীসুধীরঞ্জন খাস্তগির]

বাংলার ভদ্রলোক

পরশুরাম

ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হোক, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না নিশ্চিত। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে; ঔষধপ্রয়োগ মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য্য চাই, ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্ব্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া রোগভোগের কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দ্দশা কেবল ভদ্র-সমাজেই বর্ত্তমান এমন নয় কিন্তু সমগ্র সমাজের অবস্থার বিচার আমাদের বিষয়ের অন্তর্গত নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিলে যে শ্রেণী বুঝায়, তাহাতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। মুসলমান ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। তবে প্রতিকারের পন্থা যে উভয়ের পক্ষেই এক, তাহা বলা বাহুল্য।

শত বৎসর পূর্ব্বে 'ভদ্র' বলিলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানতঃ জন্মগত হইলেও একটা গুণ-কর্ম্ম-বিভাগজ বিশেষত্ব সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপসত্বভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি, অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন এবং অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন; অধিকাংশ বৈদ্যই চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য্য করিতেন এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরাজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিক গৃহস্থকে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন; উভয় গৃহস্থের মধ্যে সামাজিক সদ্‌ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা পাটোয়ারী বুদ্ধি এবং মামলা পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জ্জিত আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইত। এইপ্রকার সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনো বর্ত্তমান; কেবল প্রভেদ এই যে বাঙালী বণিকও তাঁহাদের বংশ-পরম্পরা-লব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য, তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে ব্যবসায় না শিখিলে তাঁহাদের চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, অভাব কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইত। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। বাঙালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমেরও সুবিধা হয়। কেরাণি-যুগের সেই আদিকালে সামান্য ইংরাজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল; সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকত অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সরকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্যোগী, তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি

অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙালী ভদ্রসন্তানই ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরাজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতার মাত্রা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইঁহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণ যাহাই হোক, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চাল-চলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল; কিন্তু একান্নবর্ত্তী সংসারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণ-পোষণ হইত। সভ্যতা এবং বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জ্জকের নিজস্ব খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারাও চাকরির উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্ভ্রম বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবন-যাত্রার প্রণালী-বিশেষ। ভদ্রতা লাভের উপায় হইল—বিশেষ প্রকার জীবিকা-গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটী ভদ্রমণ্ডুক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,—মাঠের মণ্ডুক হাটের মণ্ডুক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতা লাভ করিল। কূপ-মণ্ডুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আহার্য্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই তাঁহার সম্ভ্রম বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা, অর্থাৎ স্কুল কলেজে লব্ধ বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়। কেরাণি-গিরির বেতন যতই সামান্য হোক, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই অল্প হোক, তথাপি এ সকলে একটু কেতাবী বিদ্য খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি, পুরাতন লোহা বিক্রয় বা গরুর গাড়ির ঠিকাদারিতে বিদ্যা-প্রয়োগের সুযোগ নাই, সুতরাং এ সকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না, তখন অপর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙালী ভদ্র ক্রমশঃ অকেতাবী বৃত্তিও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি এদেশে পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত, তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহা নূতন আমদানি হইয়াছে, কিম্বা যাহার ইংরাজী নামই প্রচলিত, এরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, সেলাইএর কাজ, কোচমানি, মুদিগিরি, ময়রার দোকান চলিবে না; কিন্তু ঘড়ি মেরামত, বাইসিক্‌ল্ মেরামত, নক্সা আঁকা, দর্জির দোকান, চায়ের দোকান, মাংসের হোটেল—এ সকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক অথবা ইংরাজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এই সকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগারের আশা নাই। দরিদ্র ভদ্র সন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনো রকমে সংসার চালাইতে পারে; কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা, তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকীলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পসার অনিশ্চিত, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদ্রি হয়, সেনা-নায়ক হয়, নাবিক হয়; কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এ সকল বৃত্তি নাই।

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে গণ্ডী। গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শেখাও, ইউ-নিভার্সিটির পাঠ্য পরিবর্ত্তিত কর। ছেলেরা অল্প বয়স হইতে হাতে-কলমে কাজ করিতে শিখুক। তার পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য্যকরী বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করুক। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না, তাহারা banking, accountancy, economics ইত্যাদি বাণিজ্য এবং ধন-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিখুক। দেশে শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সংখ্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দ্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রা স্থির হয় নাই,—রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। ঔষধ সেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয়, তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক উপকরণের ফলাফল বিচার করা কর্ত্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। আমার যতদূর জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দর্জির কাজ, সূতাকাটা, তাঁত বোনা, নক্সা করা এবং কৃষি। যে সকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিম্বা যাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয়ই হিতকর। যাহারা অবস্থাপন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্য্যা এবং ব্যায়ামশিক্ষা প্রয়োজন, হাতের নিপুণতাও তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষা কেবল গৌণভাবেই হিতকর,—মুখ্যভাবে উপার্জ্জনের কোনো সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—কার্য্যকরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষা। Mechanical এবং electrical engineering, agriculture, surveying, banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্প-বিস্তর আছে। এখন কয়েক প্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে,—যথা, চামড়া সাবান কাচ চিনামাটির জিনিষ এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, সূতা ও কাপড় রং করার প্রণালী, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা—যথা engineering, accountancy ইত্যাদি—শিখিলে চাকরীর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণতঃ সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদিই বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন, যে, কেবল এই প্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্য্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া দলে-দলে ছাত্রগণ বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল, বি-এস্‌সি, এম্-এস্‌সিতে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয় স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরাণি বা উকীল্ হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে? বিজ্ঞান ও কার্য্যকরী বিদ্যা এক নয়; কেমিষ্ট্রি ফিজিক্‌স্ পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনো গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহারে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা,—যাকে বলে technical education. অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্ব্বাচনে ভুল করিয়া পূর্ব্বে হতাশ হইয়াছি,—এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরাণিগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্ব্বেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসঙ্গত ছিল, তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই এবং এবারেও হয় ত সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল-কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে, তাহা

উদাহরণ রূপেই থাকে; উৎপাদনের তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞান পাঠে শিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়,—এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয়, শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যে সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলে দেশে শিল্পবৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞান শিক্ষা তাহার অন্যতম, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্পশিক্ষা। ইহার অর্থ—যে প্রণালীতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রণালীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না,—সেজন্য উপদেষ্টার কাছে হাতা-খুন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। ইহাই রন্ধন-শিল্পের technical education। এই শিক্ষা লাভ হইলে চাকরি মিলিতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুশী করা যায়। আয় ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না,—তাহা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনো উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধন-বিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধন-শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই তাহার কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত যায়গায় বাড়ী চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাসময়ে বহুলোকের আহার্য্য প্রস্তুত চাই,—হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়-ব্যয় খতাইয়া লাভ লোকসান নির্ণয়,—প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনো নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বপ্রকার শিল্প এবং ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অল্পাধিক দুর্গম। শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের ভীষণ প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়-বুদ্ধি জন্মিবে না এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল, তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্যোগী ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া কিম্বা বিজ্ঞানের কোনো চর্চ্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং কার্য্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এইরূপ সুযোগ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি একলক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, এখন হয় ত দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আমরা এইমাত্র আশা করিতে পারি যে, কয়েকজনের নূতন প্রকার চাকরি মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে আপাততঃ কোনো প্রকার সুবিধা লাভ হইবে না।

Technical educationকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাই—যদি ছাত্রগণ অত্যধিক সংখ্যায় নির্ব্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন, তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফল-মনোরথ হইবেন; কারণ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এবং এদেশে কারখানাও এত নাই, যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। অতএব জীবিকা লাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কি না দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের একদল এদেশের কুলী মজুর ধোপা নাপিত কামার কুমার মাঝি মিস্ত্রিকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর একদল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপনেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্ত্তি দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এই সকল পরদেশী ইংরাজী বিদ্যা জানে না, economics

বোঝে না, ইহাদের হিসাব-প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট,—অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও ব্যস্ত নয়,—কারণ ইহারা মনে করে পণ্য প্রস্তুত অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনা-বেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্ব্বিচারে দেশী, বিলাতী, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, উপকারী, অপকারী, সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঋজু-কুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী, কতক ঈর্ষার জন্য, কতক অজ্ঞতার বশে, এই সকল পরদেশীর কার্য্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্ব্বর, অশিক্ষিত, দুর্নীতি-পরায়ণ,—টাকার জন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে; যা-তা খাইয়া, যেখানে-সেখানে বাস করিয়া, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের মত অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদ্ বর্জ্জিত। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে পারে না; তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না;—অতএব দক্ষোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরাজের আচার ব্যবহার অনুসরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে; বাঙালী বুঝিয়াছে—মোটা চাল-চলনের সহিত বিদ্যা-বুদ্ধি-উদ্যমের কোনো সম্পর্ক নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ মনে করার কোনো হেতু নাই যে, ঐ সকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই সাব্যস্ত হইবে যে, বাঙালীর পরাজয় তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এই সকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন-অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিগ্‌বৃত্তির আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হইয়াছে এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙালী কেরাণি মার্চ্চেণ্ট আফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice, voucher, day-book, ledger লিখিয়া দিনগত-পাপক্ষয় করিয়া আসে। মনিবের সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র,—মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই, স্বার্থও নাই। পরদেশী বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। এবং তাহার সহায়তা করিয়া বণিকপুত্র অল্প বয়সেই পৈত্রিক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শিখে; এবং কেনা বেচা আদায় উসুল জাব্‌দা রোকড় খতিয়ান হাতচিঠা হুণ্ডি মোকাম বাজারের গূঢ় তথ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙালী ভদ্রের গৃহে দুর্লভ। উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার কেরাণির পুত্র ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে, কিন্তু অভিভাবকের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল, আড়তদার, ব্যাপারী, পাইকার, দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্ত্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে পৌঁছায়। পণ্যের এই পরিক্রম পথে অগণিত ব্যক্তির অন্ন সংস্থান হয়। এই মহাজন-অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রসন্তানকে এই পথের বার্ত্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে ঐ সুযোগ নাই, সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয়, তাহারই কিয়দংশে ব্যবসায়-শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বাঞ্ছিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও

হয় ত অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকল সময় সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না। কিন্তু যে হইতে চাহিবে, তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া পঠদ্দশাতেই বণিগ্‌বৃত্তির সহিত পরিচয় আরম্ভ করা ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। আগে ধন-বিজ্ঞান শিখিব, তার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব, এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না। আগে ভাষা তার পর ব্যাকরণ—ইহাই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট রীতি। দোকান, হাট, বাজার, আড়ৎ ব্যবসায়-শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ;—এই সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে। আমদানি, রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়-প্রথা, পণ্যের ক্রয়-মূল্য, বিক্রয়-মূল্য, হিসাব-প্রণালী, টাকা আদায়ের প্রথা—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এই সকল সংবাদ গ্রহণ করেন, তবে তিনিও উপকৃত হইবেন এবং ছাত্রকেও সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা (অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষা) শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকতক কোনো ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী হইয়া হাতে-কলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য Premium দেওয়ার প্রথা নাই; কিন্তু যদি দিতেও হয়, তবে তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যে কোনো সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশি করায় লাভ আছে,—কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূল সূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা হইবে না,—সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবীশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চ শিক্ষা বা কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। প্রথমে যে ছোট ব্যবসায় আরম্ভ হইবে, তাহা 'হাতে-খড়ি' বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তার পর অভিজ্ঞতা এবং আত্মনির্ভরতা জন্মিলে কারবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই প্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সৌখীন বাঙালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত টিনের ঘরে জ্বলন্ত হাপরের কাছে লোহা পিটাইয়া এঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সর্ভেয়িং শেখে। ভোরে অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন কলম পিষিয়া বাড়ী ফেরে। এ সকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে, সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে—বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে,—সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনো কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্ব্বের তুলনায় বাঙালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন দিয়াছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটীর-শিল্প, উন্নত কৃষি এবং কার্য্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মনোযোগ দেন, তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রামিত হয়। জনকতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্ত্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই; নিপুণতা এবং সৌষ্ঠব-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এই সকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবি বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে, তাহা কলম পিষিয়া উৎপন্ন হয় নাই। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে, তাহাও তাহার বৃত্তির ফল নয়। অনেক বাঙ্গালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়ি পাল্লা নিজের হাতে লইলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুখাইবে না।

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(২৫)

আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহা ফলিয়া গেল। আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, নরেন্দ্রবাবু আসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আমি তাঁর কাছে সব কথা খুলিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছিলাম। তার পর দলিল হইয়া গেলে তাঁর কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। কাজেই তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিব-হাল হইয়াই ছিলেন।

কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাঁহাকে লইয়া অন্দরে গেলাম। খাইবার ঘরে সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমি আসিতেই সে আমার পায়ে নত হইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "ইনি আমার গুরু নরেন্দ্র বাবু।" সে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও রকম অভিবাদন করিল না।

বামনের মেয়ে হইয়া যে সে কায়স্থকে প্রণাম করিতে পারিল না, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহাতে আমার মনে হইল যে, সাবিত্রীর সঙ্গে আমার কোনও খানেই যোগ নাই,—সে এক দেশের লোক, আমি সম্পূর্ণ অন্য দেশের।

আহারাদির পর আমি নরেন বাবুকে লইয়া বাহিরে গেলাম। তার পর সমস্ত দিন ধরিয়া তাঁর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তাঁর নামে আমি যে সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছি, নবাবগঞ্জ মৌজা তার মধ্যে একটি। এই মৌজার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া তিনি তথ্য সংগ্রহ করিলেন; সমুদায় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ঘুরিয়া তার একটা মোটামুটি নক্সা করিতে লাগিলেন; এবং কার কোন্ জমীতে কত অংশ, তার হিসাব টুকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "এ সব বিস্তারিত খবর আপনি আমার বাড়ীতে ব'সেই পাবেন। সেটলমেণ্টের নক্সা ও চিঠার নকল আমার কাছে আছে, তাহা হইতেই সব জানা যাইবে।"

তবু সমস্ত দিন ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরিয়া আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় নরেন বাবু বলিলেন, "যা ভেবেছিলাম তাই। কাজটা মোটেই সহজ নয়। এই সব জমীগুলো এত ছোট ছোট টুকরা টুকরা হ'য়ে র'য়েছে,—একজনের এক ক্ষেত এখানে, আর এক ক্ষেত বিশ বিঘা দূরে। এতে চাষের অসুবিধা হয়। আর কারো কারো দেখছি, জমী এত ছোট যে, তা' থেকে তার লাভ হ'তে পারে না। এদের মালিক ক'রবার আগে এদের টুকরোগুলো consolidate করে বড় বড় জোত করে দিতে হ'বে। তার পর আস্তে আস্তে এদের সম্পূর্ণ স্বত্ব দিতে হ'বে। তা ছাড়া আর এক আপদ এই যে, তোমার সম্পত্তিটা এক টানা নয়। এত লক্ষ কোটি মালিক, এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকী অংশ,—এর ভিতর consolidation হওয়াও কঠিন। কি রকম করে কি করা যায়—ভেবে চিন্তে স্থির ক'রতে হ'বে।"

তিনি বাড়ী আসিয়া সেট্‌লমেণ্টের নক্সা ও চিঠা এবং কাগজ পত্র লইয়া নানারকম হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন। আমি তখন একবার অন্দরে গেলাম।

দোতালার বারান্দায় ঠিক আমার স্ত্রীর শুইবার ঘরের সামনে দেখিলাম—বসিয়া আছেন আমাদের গুরুপুত্র। কন্দর্প-কান্তি সৌখীন যুবাপুরুষ! তাঁর মাথায় দীর্ঘ শিখা ও গলায় কতকগুলি মালা ছাড়া তাঁর ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের বিশেষ কোনও লক্ষণই নাই। তাঁর সম্মুখে মাটিতে বসিয়া আছে আমার স্ত্রী সাবিত্রী,—একাগ্র চিত্তে গুরুপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে তদ্গত চিত্তে তাঁর কথা শুনিতেছে। আমার স্ত্রীর কঠোর সৌন্দর্য্যের ভিতর এতখানি ভাবাবেশ দেখার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই।

ঈর্ষার তীব্র বিষে আমার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। আমার গভীর সন্দেহ হইল। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া আমি

আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাবিত্রী আমার আসা বন্ধ্য করিল কি না, বুঝিতে পারিলাম না। আমি আমার ঘরের ভিতর বসিয়াই ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

গুরুপুত্র বলিলেন, "তা বৌরাণী, এখন অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা না হ'লে তো কিছুতেই চলে না। কলকাতা থেকে জয়েষ্ট আর বরগা সব এসে র'য়েছে—টাকা দিয়ে নিতে হ'বে, নইলে মাশুল বেড়ে যাবে। ঢাকা থেকে আরও এক নৌকা চুণ আনাতে হ'বে—তারও সময় তো র'য়ে যায়। আর রাজ-মজুরেও মাইনা চাচ্ছে। বড়ই ঠেকে পড়েছি বলেই চাইতে হ'চ্ছে; নইলে বাবা বল্লেন, দ্বিজেশের এই দুঃসময়—এর ভিতর টাকা চাইতে মন চায় না।"

আমি দেখিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী ভয়ানক বিব্রত ও লজ্জিত ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কি বলিল। কথাটা ঠিক ধরিতে পারিলাম না। তবে বুঝিলাম যে, টাকা নাই—এই অপ্রিয় কথাটাকে লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে বলিতে হইতেছে। যতটা লজ্জা ও যতটা বেদনা এ কথায় সাবিত্রীর মুখে ফুটিয়া উঠিল, সবটাই যে টাকা না দিতে পারার সঙ্কোচের জন্য, এমন আমার মনে হইল না।

আর বেশী অপেক্ষা করিতে আমার সাহস ছিল না। আমার বুক আশঙ্কায় কাঁপিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, হয় তো এখনি এমন একটা কিছু দেখিয়া ফেলিব, যাহাতে আমার সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়া যাইবে। কেন এ আশঙ্কা? কেন এ ঈর্ষা? সাবিত্রী তো আমার কেউ নয়। জন্মের মত তো আমি তাকে ছাড়িয়া যাইতেছি। তবে তার ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ায় আমার কি আসে যায়?

কি আসে যায়? কিন্তু এ যুক্তিতে মন মানিল না। আমি শঙ্কিত হইয়া সাবিত্রীকে ডাকিলাম।

সাবিত্রী আমার ডাক শুনিয়াই চমকিত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া ত্রস্তব্যস্তে উঠিয়া আসিল। কেন এ চমক? অতটা ব্যস্ততা কেন? হায় রে, এই নারীকে আমি পবিত্র পাষাণ দেবতা মনে করিয়াছিলাম!

সাবিত্রী উঠিতেই গুরুপুত্র বলিলেন, "তবে এখন একটু নীচে যাই। এখন যদি টাকাটা দেওয়ার সুবিধা নাই হয়, তবে কাল সকালে দিও।" বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

সাবিত্রী আসিয়া বলিল, "কখন এলে তুমি? ঠাকুর-কুমারকে প্রণাম ক'রলে না?"

আমি উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "তুমি আমার গুরুকে প্রণাম ক'রেছিলে?"

সাবিত্রী অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "থাক সে কথা,—তোমার এখন পাঁচ হাজার টাকা চাই?"

সাবিত্রী আর একটু বিস্ময় ও বোধ হয় একটু উদ্বেগের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি সে দৃষ্টির ভীষণ অর্থ করিলাম। আমার মনে হইল যে, গুরুপুত্রের সঙ্গে তার গোপন সম্ভাষণ আমি শুনিয়াছি, তাহাতেই সে বিস্মিত হইয়াছে। ভাবিলাম, না জানি আরও কত গুরুতর কথা আমি আসিবার আগে হইয়া গিয়াছে। আমি সে সব শুনিয়াছি ভাবিয়া সাবিত্রী চমকিত হইয়াছে। আমার মনের ভিতর কে যেন তীব্র হলাহল ঢালিয়া দিল।

শান্ত ভাবে আমি বলিলাম, "হাজার দশেক টাকা বোধ হয় খাজাঞ্চীর কাছে আছে, তুমি চিঠি লিখে আনিও যখন যা' দরকার।" তার পর বুকের ভিতর হইতে দানপত্রখানা লইয়া তাহাকে বলিলাম, "এই নেও। এখানা ভাল ক'রে সিন্দুকে রেখে দেও গে। তুমি আমার কাছে অর্দ্ধেক সম্পত্তি চেয়েছিলে। আগে চাইলে ভালো ক'রতে। তখন আমার অনেক বেশী ছিল। এখন আমার যা কিছু আছে, তার ঠিক অর্দ্ধেক তোমাকে এই দানপত্র করে দিয়েছি। তার উপর এই বাড়ী মায় আসবাব সরঞ্জাম সব দিয়েছি। সম্পত্তির পরিমাণ বড় কম হ'ল। তবে এসব দায়মুক্ত—আর ধার টার কিছু নেই। যে পোনেরো হাজার টাকা পাবে, সবই তুমি খরচ ক'রতে পারবে।

"তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের একটা দায় আমি এতদিন ব'য়ে এসেছি,—সে দায় আজ শোধ ক'রলাম। এখন আমি মুক্ত। এখন আর তোমার আমার উপর কোনও দাবী-দাওয়া রইলো না। দাবী ক'রলেও তুমি কিছু

পাবে না, কেন না আমার আর কিছুই নেই। সম্পত্তির আর অর্দ্ধেকটা আমি দান ক'রে ফেলেছি।

"আর, এও ব'লে রাখি যে, তোমার উপরও আমার কোনও দাবী-দাওয়া রইলো না। তোমার সম্পত্তি তুমি যা' ইচ্ছা তাই ক'রতে পার; তোমার শরীর, মন, ধর্ম্ম, প্রেম, যাকে ইচ্ছা তুমি দিতে পার—তোমার কোনও কিছুতেই আমার বলবার কিছু রইলো না।

"পরশু দিন আমি চাকরী ক'রতে ক'লকাতা যাচ্ছি। আর বোধ হয় দেখা হ'বে না।"

নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়াইয়া সাবিত্রী আমার হাত হইতে দানপত্রখানি লইয়াছিল। তার সেই কঠিন পাথরের মত দৃষ্টি স্থির করিয়া আমার দিকে চাহিয়া, সে আমার সব কয়টা কথা শুনিল—এক-টুকুও সে বিচলিত হইল না। মুখে তার এক ফোঁটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল না।

আমার কথা শেষ হইবামাত্র সে চট করিয়া ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কেন যাইবে না? আর তো দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই; তার অর্দ্ধেকের অধিকার তো সে পাইয়াছে।

আমি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

(২৬)

রাত্রে নরেনবাবুকে লইয়া অন্দরে খাইতে গেলাম। সাবিত্রীকে খাইবার ঘরে দেখিলাম না। তার কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। সে কেন আর আসিবে? আমাকে সেবা করিবার যে প্রয়োজন ছিল, সব তো মিটিয়া গিয়াছে। আর তার আমাকে দিয়া কি প্রয়োজন?

নরেন্দ্রবাবুকে অন্দর ও বাহিরের মাঝামাঝি একটা ঘরে শোয়াইয়া দিয়া, আমি আমার শুইবার ঘরে ফিরিলাম। পথে দেখিলাম, একটা ঘরে গুরুপুত্র শুইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া আমার সমস্ত অন্তরে যেন বিষের জ্বালা উপস্থিত হইল। এ হতভাগা ঠিক অন্দরের ভিতর আসিয়া শুইয়াছে দেখিয়া, আমার দারুণ সন্দেহ হইল। আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার ঘরে চলিয়া গেলাম।

আমার ঘরের দরজা রোজ খোলাই থাকে; কিন্তু আজ ঘরে গিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম—পাছে সাবিত্রী আসিয়া জ্বালাতন করে। তার মুখ দেখিবার আর আমার এক ফোঁটাও ইচ্ছা ছিল না।

আমি অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে শুইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিনের ক্লান্তির ফলে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম, গভীর রাত্রে গুরুপুত্র নীরবে সাবিত্রীর ঘরের দিকে চলিয়াছেন। ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া যেন আমি শুনিলাম, বারান্দায় পায়ের শব্দ। তার পর কে যেন সাবিত্রীর ঘরের দিকে চলিয়াছে। তার পর যেন সাবিত্রীর দরজা আস্তে বন্ধ হইল। সে ঘরে এমন কতকগুলি শব্দ শুনিলাম, যাহাতে সন্দেহ রহিল না যে, ঘরে মানুষ নড়িতেছে।

আমি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। আমার মাথার ভিতর খুন চাপিয়া গেল। কিন্তু খুব সন্তর্পণে পা টিপিয়া অগ্রসর হইলাম।

সাবিত্রীর ও আমার ঘরের মাঝখানে একটা দরজা ছিল—সেটা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। তার উপর কাণ পাতিয়া শুনিলাম—ভয়ানক সন্দেহজনক শব্দ। আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, দরজাটা আমার দিক হইতেই বন্ধ। আমি আলগোচে হুড়কা খুলিয়া দরজা খুলিলাম।

ঘরে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; কিন্তু এক কোণায় খুব নামান ছিল। খুব অস্পষ্ট আলোতে কিছুই ভাল করিয়া দেখা গেল না। খাটের উপর কাহাকেও দেখিলাম না; কিন্তু ঘরের আর এক পাশে, যেখানে সাবিত্রীর বিছানা তারই পাশে নড়াচড়ার শব্দ, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ পাইলাম। আমি পা টিপিয়া অগ্রসর হইয়া লণ্ঠনের কাছে গেলাম। চট করিয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেই দিকে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, আমার সেই ফটোগ্রাফ মাথায় ঠেকাইয়া সাবিত্রী মাটির উপর শুইয়া মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে—ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। সমস্ত সুন্দর দেহখানি তার গভীর বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইতেছে।

কি বিশ্বজোড়া ব্যথা এ নারীর প্রাণে, যাতে সে এমন করিয়া দীন হইয়া কাঁদিতেছে! গর্ব্বিতা দৃপ্তা সাবিত্রী—যে তার স্বামীর কাছে একটি দিনের তরে সামান্য হীনতা স্বীকার করে নাই, একটি অনুরোধ করে নাই, এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে নাই, সারা জীবন কেবল দর্পের উপর কাটাইয়াছে—সে আজ দীনা হীনা সামান্য নারীর মত মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে!

আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটা পুরু পরদা পড়িয়া গেল। আমি আজ দিব্য আলোকে দেখিতে পাইলাম—কি ঘোর অবিচার আমি করিয়াছি সাবিত্রীর উপর! আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সাবিত্রীর মাথার কাছে বসিয়া ডাকিলাম "সাবিত্রী!"

সাবিত্রী চমকাইয়া উঠিয়া বসন সংবৃত করিয়া বসিল। তার বুকের তলা হইতে বাহির হইল কুঞ্চিত লাঞ্ছিত অশ্রুসিক্ত আমার সেই দানপত্র।

সাবিত্রী এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখে ফুটিয়া উঠিল সেই কঠোর গর্ব্বিত দৃষ্টি! তার পর সে দৃষ্টি মিলাইয়া গেল,—অশ্রুর ধারায় সে দৃষ্টি গলিয়া গেল।

সাবিত্রী আমার দুই পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িয়া পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমায় ক্ষমা কর, দয়া কর! আমায় প্রাণে মেরো না। আমার দিকে চেয়ে দেখ—আমার সব দর্প চূর্ণ হ'য়েছে। আর আমার কোনও অহঙ্কার নেই। তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছি,—তুমি আমায় দয়া কর।"

আমি সাবিত্রীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহার অধরোষ্ঠে গভীর চুম্বন দিলাম। এই তাহাকে আমার প্রথম চুম্বন—আমার সমস্ত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল।

সাবিত্রীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আবার আমার পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "ওগো দেবতা—দেবতা—দেবতা আমার!"

আমি আবার তাহাকে উঠাইয়া বুকে লইলাম। সে পরম সার্থকতার সহিত আমার বুকের উপর সম্পূর্ণ এলাইয়া পড়িল।

সাবিত্রী বলিল, সব মানের মাথা খাইয়া, আমার পায়ের উপর পড়িয়া ক্ষমা চাহিবার জন্য, সে-ই গিয়াছিল আমার ঘরে। কিন্তু বন্ধ দুয়ার দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে,—ডাকিতে সাহস হয় নাই। তারই পদশব্দে আমি চকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

তার খাটের উপর আমি তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। তার ঘন স্নিগ্ধ চিকুররাশি এলাইয়া দিয়া আমি তাহা লইয়া খেলা করিলাম। তার অঙ্গে আমি সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলাম। শিশুর মত সরল আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত হইল, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সেই আশ্চর্য্য পাথরের চোখের ভিতর এখন অপূর্ব্ব প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে; অশ্রুর বন্যায় পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া রুদ্ধ নির্ঝরিণী ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। সেই অপূর্ব্ব সুন্দর চক্ষু দুটির উপর আমি দুটি চুম্বন দিলাম।

* * * * *

আমার সম্পত্তি আমি বিলাইয়া দিয়াছি, কিন্তু সাবিত্রীকে পাইয়াছি; আমি এক ফোঁটাও ক্ষতি বোধ করিতেছি না। সারারাত্রি আমরা পরস্পরের জীবনের সব কথা বলিলাম। আমি অকপট চিত্তে আমার সমস্ত জীবনের গুপ্ত ইতিহাস খুলিয়া বলিলাম।

* * * * *

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া আমার চুলগুলি আস্তে আস্তে পাট করিতেছে, আর আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি চক্ষু মেলিতেই সে লজ্জায় লাল হইয়া আমার বুকের ভিতর মুখ লুকাইল। আমি তার মুখখানা সাপটিয়া আমার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলাম।

একটু পরে সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। সাবিত্রী নববধূর মত লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "তোমার পায় পড়ি, এখন আমাকে ছেড়ে দেও। লোকে ভাববে কি?"

আমি তাকে রাত্রে আমার ঘরে আনিয়াছিলাম, কেন না, তার ঘরে ভাল বিছানা নাই। সকালবেলায় যদি কেহ আসিয়া দেখিয়া ফেলে যে, সে আমার ঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, তবে সে লজ্জা পাইবে! আমার ভারি কৌতুক বোধ হইল। আমি বলিলাম, "লোকে ভাববে,

তুমি ভারি অপকর্ম্ম ক'রেছ—এত বড় অপকর্ম্ম জীবনে কখনও কর নি।"

সাবিত্রী ভারি বিব্রত হইল, কিন্তু এ কথায় আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি তার মনের ভাব যেন দর্পণের মত আমার অন্তরে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম। লোকে এ কথা জানিবে ভাবিয়া তার লজ্জা হইতেছে; কিন্তু সেই লজ্জাই তো সে চায়। আজ যে তার সমস্ত লোককে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে যে, সে স্বামী-সোহাগিনী! এ সৌভাগ্য যে সে লুকাইয়া ভোগ করিতে পারে না। এত দিন এত ঐশ্বর্য্যের ভিতর সুধু সে এইটি পায় নাই বলিয়াই কাঙ্গালিনী হইয় ছিল।

সে বলিল, "লক্ষ্মীটি আমার, আমায় ছাড়; আমার পূজোর বেলা বয়ে' যাচ্ছে। পূজো করে' তবে আমার ভাঁড়ার দিতে হ'বে।"

আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম,—তার সেই পূজারিণীর মহিমময় মূর্ত্তি দেখিবার আশায় তাহাকে ছাড়িলাম। সে কিন্তু ঠিক তখনি গেল না। একটু দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সে হঠাৎ আমার মুখের উপর একটি চুম্বন দিয়া লজ্জায় ছুটিয়া পলাইল।

দুয়ারের কাছে গিয়া সে ডাকিয়া বলিল, "তুমি একটু পরে একবার আমার ঘরে এসো কিন্তু।"

আমি তখনই উঠিলাম না। বিছানায় আলস্যে গা ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া রহিলাম,—একটা অপূর্ব্ব পুলকের আবেশে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া গেল। এত সুখ আমার ঘরে থাকিতে, মূর্খ আমি, বেদনায় আকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া সুখের ক্ষুদ-কুঁড়া কুড়াইয়া বেড়াইয়াছি,—সতী সাধ্বীর মনে দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তুষানল জ্বালাইয়াছি! মনে হইতে আপনাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু বর্ত্তমানের সৌভাগ্য আমার অতীতের সব দুঃখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমি আরাম করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া স্নান করিলাম। বেশ পরিপাটী করিয়া বেশভূষা করিলাম। আজ যে আমার মহা উৎসবের দিন! তার পর সাবিত্রীর ঘরে গেলাম।

দেখিলাম—সে সাবিত্রী নাই। সে আজ খুব দামী একখানা বেনারসী শাড়ী পরিয়াছে। সিন্দুক উজাড় করিয়া সে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়াছে। এই সাজসজ্জার ভিতর দিয়া তার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। গহনা তার অনেক ছিল, কোনও দিন সে তাহা পরে নাই। আজ সে সব অলঙ্কার পরিয়া রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে তার দীর্ঘ ও কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনের পূজা করিতে বসিয়াছে। শিবের মাথায় শেষ বিল্বপত্র দিয়া সে প্রণাম করিয়া উঠিল। তার পর আমার দিকে ফিরিয়া সে আমাকে ডাকিল।

তার পূজার আসনের সামনে একখানা জলচৌকীর উপর পুরু গালিচার একটা আসন পাতা ছিল। আমার হাত ধরিয়া সে আমাকে সেখানে বসাইল। তার পর আমার রীতিমত পূজা আরম্ভ করিল। কৌতুকভরে আমি-হাসিমুখে তার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে একবার আমার দিকে চাহিতেই, আমার হাসি দেখিয়া, লজ্জায় হাসিয়া মুখ নত করিয়া মনে মনে মন্ত্র পড়িতে লাগিল,—হাসিটুকু তার মুখে লাগিয়াই রহিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার সে সৌন্দর্য্য চক্ষু দিয়া পান করিলাম।

শেষে সে বাছা বাছা সুন্দর সুগন্ধ ফুল তুলিয়া লইয়া আমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। সাবিত্রী মাথা তুলিতেই, আমি বলিলাম, "রোস, আমার একটা কাজ আছে; আমি তোমার পূজা করবো।"

সে অবাক হইল; আমার কথা বুঝিতে পারিল না। আমি তখন আমার পায়ের উপরকার ফুলগুলি হইতে কয়েকটি বাছিয়া লইয়া তার চুলের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলাম। সে আবার আমাকে প্রণাম করিল।

তখন সাবিত্রী বলিল, "আজ আমার ব্রত উদ্‌যাপনের পূজা। আজ আট বৎসর ধরে এই দিনের জন্য রোজ পূজার পর দেবতার কাছে আর তোমার উদ্দেশে মাথা খুঁড়ছি। দেবতার দয়ায় আজ আমি তোমার পূজা করতে পেয়েছি। তোমাকে আজ আর একটু দয়া করে আমার পূজাটা সম্পূর্ণ ক'রতে দিতে হ'বে; একটু দক্ষিণা নিতে হ'বে।" বলিয়া সে বুকের কাপড়ের তলা হইতে সেই দানপত্রখানা বাহির করিয়া আমার পায়ে রাখিল।

আমি কিছু বলিবার আগেই সে বলিল, "দয়া করে তুমি এটা নেও, তোমার সম্পত্তি ফিরে নেও। আমি তোমাকে পেয়েছি, আর কিছুই আমার চাই না। এ বোঝা দিয়ে আমাকে আর শাস্তি দিও না। আমার বড় অহঙ্কার! আজ আট বৎসর ধরে তোমার জন্য মনে মনে মাথা খুঁড়ছি, কিন্তু তোমার কাছে মাথা নোয়াতে পারি নি, বড় অপমান বোধ ক'রেছি। তার শাস্তি এমন পেয়েছি যে, আমার অতি বড় শত্রুরও যেন সে সাজা না হয়। আর যেন আমার অহঙ্কার না হয়—আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর। আর যেন কোনও কিছুতে নিজেকে তোমার সঙ্গে স্বতন্ত্র করে' না দেখি, তুমি ছাড়া যেন আমার কিছুই না থাকে। এ সম্পত্তি আমি চাই না। কিছুই আমি চাই না; আমি শুধু যেন চিরদিন তোমার পায় ঠাঁই পাই।"

সাবিত্রীর দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিয়াছিল; কিন্তু তার হৃদয়ে বুঝি বেদনা ছিল না। তার এ দশ বছরের ব্যথা যেন এই অশ্রুধারায় গলিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু তার মুখ ছিল আনন্দে উজ্জ্বল।

আমার বুক ভরিয়া উঠিল, কথা কহিতে গলায় বাধিল। কিছুই বলিতে পারিলাম না। আমার নিজের অপরাধের অনুভূতি এমন তীব্র ভাবে কখনও আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। আজ আমি পরম দীনতার সহিত অনুভব করিলাম যে, সাবিত্রী দেবী—সাবিত্রী প্রেমিকা! আমি কত হীন, কত অযোগ্য তার! তার পূজা, তার শ্রদ্ধা, তার ভক্তি আমাকে ভয়ানক কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিল; কিন্তু আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না,—শুধু দুই চক্ষু বাহিয়া আমার অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নীরবে সেই দলিলখানা হাতে লইয়া তার হাতে দিয়া অনেক কষ্টে শুধু বলিলাম, "আচ্ছা নিলাম, এখন তুমি এটাকে রেখে দেও।"

তার পর সে আমার কাছে বিদায় লইয়া গেল সংসারের কাজে। আমি চলিলাম বাহিরে। আমার অন্তর যেন স্বর্গের সুরভিতে ভরিয়া উঠিল,—অপূর্ব্ব উল্লাসে হৃদয় নাচিতে লাগিল। আমি উৎফুল্ল হৃদয়ে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

এসেছে আষাঢ়

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

এসেছে আষাঢ়
তরুলতা ভানুতাপে বিকল অসাড়
কত দিন ছিল মুখ বুজে,
বনের মনের গান গিয়েছিল মরে'
এত দিনে দিন পেল' বুঝে
অই শোন দিকে দিকে ফের মর্‌মরে।

কেঁদেছে চাতক,
ফটিক-জলের তরে, আজ পলাতক
ডুবে পাছে মরে ধারা-জলে,
চকোর ফুকারি ফেরে আঁধার-আকাশে,
হায় চাঁদ কোথা গেল চলে?
সুধা তো দুরাশা, আলো নাহি পরকাশে।

বিক্রমপুর

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

যোজন-বিস্তৃত মেঘ-গম্ভীর-নির্ঘোষ নবজলধররুচির ভীমতরঙ্গ মেঘনাদ নদে রাহার পশ্চিম প্রান্ত অহর্নিশি লালিত, উদ্দামবেগা পদ্মা, ধবলতোয়া ধবলেশ্বরী এবং ক্ষীণাঙ্গী ইচ্ছামতী স্নেহশালিনী জননীগণের ন্যায় তিন দিক হইতে যাহাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে, প্রকৃতির আদরের দুলালী সেই বিক্রমপুর ভূমি বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্নৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধা। কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ তীক্ষ্ণধী রাজনৈতিক রাজা এই নদনদী দ্বারা সুরক্ষিত স্থানে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে বিক্রমপুর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও সেই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের প্রভুত্ব পূর্ব্বে ত্রিপুরার সমভূমি ও দক্ষিণে সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। দশম শতাব্দীর শেষাংশে এই শতাব্দদ্বয়ব্যাপী প্রভুত্ব শিথিলমূল হইয়া উঠে। ৯৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাম্বোজবংশজ এক রাজা* পালরাজগণকে অল্পকালের জন্য উত্তরবঙ্গ হইতে স্থানচ্যুত করেন। পালরাজগণ আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম মহীপাল দেবের রাজত্ব পূর্ব্ববঙ্গেই আরব্ধ হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তিনি অবশেষে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে এবং 'জনকভূ'তে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই যে প্রথম মহীপাল পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া গেলেন, তাহার পরে আর পালরাজগণের প্রভুত্ব পূর্ব্ববঙ্গে তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না। বিক্রমশালী বীরগণ পূর্ব্ববঙ্গে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত এইরূপ যতগুলি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ কান্তি দেব প্রতিষ্ঠিত বংশই তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়। কান্তিদেব ধর্ম্মে সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার একখানা মাত্র অসমাপ্ত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি চট্টগ্রামে এক বৈষ্ণব আক্রায় রক্ষিত ছিল। কত দিন ধরিয়া এখানি এখানে আছে, কি করিয়া ওখানে গেল, কেহ বলিতে পারে না। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শিকদার মহাশয়দ্বয় খবর পাইয়া এই তাম্রশাসনখানি পরীক্ষা করিয়া দেখেন; এবং গত বৎসরের Modern Reviewতে উহার পাঠ প্রকাশিত করেন। এই তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশের পূর্ব্বে কান্তিদেবের নাম কেহ জানিত না। ঐতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে, পূর্ব্ববঙ্গের স্বতন্ত্র রাজবংশের মধ্যে চন্দ্র-উপনামযুক্ত রাজবংশই আদি। এখন দেখা যাইতেছে যে, কান্তিদেবের বংশ চন্দ্ররাজগণের বংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর।

কান্তিদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর এবং শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনামূলক বিচার দ্বারাই প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাম্রশাসনটির মুসাবিদাও ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষী। চন্দ্র-বর্ম্মসেনদের তাম্রশাসন সব এক ছাঁচে ঢালা। প্রথমে ভগবদ্বন্দনা, পরে রাজবংশের গুণানুকীর্ত্তন। এই পর্য্যন্ত পদ্যাংশ। পরে যে রাজধানী হইতে তাম্রশাসন প্রদত্ত হইতেছে তাহার উল্লেখে পিতৃনাম সহ প্রদাতা মহারাজার নাম উল্লেখ ও রাজকর্ম্মচারিবর্গের বিস্তৃত তালিকা এবং তাহাদের নিকট মহারাজের দানাদেশ ঘোষণা। পরে প্রদত্ত গ্রাম ও তাহার সীমা নির্দ্দেশ, গৃহীতার তিন পুরুষের নাম, বেদ ও গোত্র নির্দ্দেশ, এবং সর্ব্বশেষে ভবিষ্য রাজগণ যাহাতে এই দান মান্য করেন, সেই উদ্দেশ্যে

* সম্প্রতি অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেখাইয়াছেন (রঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩৩০) যে এই কাম্বোজ রাজার নাম বা বিরুদ কুঞ্জরঘটাবর্ষ হওয়া সম্ভব। স্থানান্তরে (Dacca Review আষাঢ়, ১৩২২, ১০৮ পৃষ্ঠা) আমি অনুমান করিয়াছিলাম, এই রাজার নাম বাণ হইতে পারে।

অনুরোধ ও অভিশাপে শাসনের পরিসমাপ্তি। কান্তিদেবের শাসনে কিন্তু প্রাচীন শাসনাবলির অনুসরণে প্রথমেই রাজধানীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

ৎ স্বস্তি শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত বর্দ্ধমান পুরবাসকাত্।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাম্রশাসনখানি সম্পূর্ণ নহে, দানাংশ উহাতে নাই। যে অংশ সকল তাম্রশাসনেই থাকিবে সেই অংশ, অর্থাৎ ভগবদ্বন্দনা, রাজবংশ-গুণানুকীর্ত্তন এবং রাজার আদেশ বিজ্ঞপ্তি পর্য্যন্ত অংশ খোদাই করিয়া অনেকগুলি তামার পাত রাজার দপ্তরখানায় রাখা হইত, দরকার মত দানাংশ খোদাই করিয়া ভূমি দানের দলিল স্বরূপ গৃহীতা ব্রাহ্মণকে প্রদান করা হইত। এইরূপ অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন চন্দ্রবংশের শ্রীচন্দ্র দেবেরও একখানা পাওয়া গিয়াছে। ১৩২৬ সনের আশ্বিনের 'প্রতিভায়' আমি তাহার সূচি ও পাঠ প্রকাশিত করিয়াছিলাম, বিশুদ্ধতর পাঠ Epigraphia Indica পত্রের XVII খণ্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। কান্তিদেবের শাসনের তামার পাতখানা নানারূপ খুঁত-ওয়ালা,—শ্রীচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ শাসনখানাও খনৎকারের দোষে ভ্রমে পরিপূর্ণ। হয়ত এই জন্যই এই পাত দুখানা কাজে লাগান হয় নাই। আবার এই অনুমানও অসঙ্গত নহে যে, এই উভয় বংশই অল্পকাল স্থায়ী হওয়াতে খোদিত তামার পাত শাসন রূপে পরিণত করিবার সময়ই হয় নাই।

যাহা হউক, এই দুইখানি অসম্পূর্ণ শাসনই ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য। কান্তি দেবের শাসনে আমরা এক নূতন রাজবংশের পরিচয় পাইলাম। শ্রীচন্দ্রের শাসনও চন্দ্রবংশের ইতিহাস উদ্ধারের কাজে অনেক সহায়তা করিয়াছে। কান্তদেবের শাসনখানি বর্দ্ধমান পুরবাসক হইতে প্রদত্ত হইবার কথা ছিল, অর্থাৎ বর্দ্ধমানপুর নামক স্থানে কান্তিদেবের রাজধানী ছিল। এই বর্দ্ধমানপুর কোথায়? বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করিয়াছেন যে, উহা রাঢ়ে অবস্থিত বর্ত্তমান বর্দ্ধমান হইতে অভিন্ন। কান্তিদেব কিন্তু তাঁহার তাম্রশাসনে হরিফেলা মণ্ডলের ভাবী ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা হইতে সাধারণ অর্থ এই বুঝা যায় যে, তিনি নিজেও হরিফেলা মণ্ডলেরই রাজা ছিলেন। অসাধারণ অর্থ অবশ্য তর্ক করিয়া অনেক বাহির করা যাইতে পারে। হরিফেল বঙ্গেরই নামান্তর, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এবং কান্তিদেবের শাসনে নামটি যদিও হরিফেলা রূপে পাওয়া গেল, তবু হরিফেল ও হরিফেলা অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও বিশেষ আপত্তি হইবার কথা নহে। বঙ্গ বলিতে প্রাচীন কালে নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ ভূভাগ বুঝাইত বলিয়া আমার মত,—অন্য ঐতিহাসিকগণেরও মোটামোটি ঐরূপই ধারণা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রাচীন বঙ্গের পূর্ব্বে মেঘনাদ, পশ্চিমে মধুমতী, উত্তরে ধবলেশ্বরী এবং দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। প্রাচীন বঙ্গের বিস্তৃতি এই সীমার বাহিরেও ছিল, এইরূপ কেহ সপ্রমাণ করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

কান্তিদেব যদি এই সীমাবদ্ধ স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে রাঢ়ের বর্দ্ধমানে তাঁহার রাজধানী থাকা একেবারেই অসম্ভব, ইহা না বলিলেও চলে। কাজেই এই সীমার মধ্যেই বর্দ্ধমানপুর রাজধানীর প্রাচীন সংস্থান খুঁজিতে হইবে। বিক্রমপুরের উত্তর পূর্ব্বাংশে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও ইচ্ছামতী সঙ্গমে অবস্থিত বর্ত্তমানে রামপাল নামে পরিচিত স্থানে এক বৃহৎ নগরীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়। ইহা ছাড়া ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া নামক স্থানে আর একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। কিন্তু কোটালিপাড়ার নগর যে গুপ্ত রাজগণের আমলের তাহার প্রমাণ অন্যত্র দিয়াছি। রামপালের আশেপাশে যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাহাই যে প্রাচীন বিক্রমপুর নগরীর ভগ্নাবশেষ ইহাও অন্যত্র বলিয়াছি (প্রবাসী ১৩২১ শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ)। এই ভগ্নাবশেষ নগরকস্‌বা, কাজিকস্‌বা, বিনোদপুর, কাগজিপাড়া, পানাম, দালানপাড়া, পঞ্চসার, দেওভোগ জোড়া-দেউল, দেবসার, সুখবাসপুর, বজ্রযোগিনী ইত্যাদি বহু গ্রাম ব্যাপিয়া, প্রায় ৫×৫ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। এই সুবিস্তৃত নগর কান্তিদেবের বংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই অনুমিত হয়। ইচ্ছামতী-ব্রহ্মপুত্র সঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত এই নগর বাণিজ্য প্রভাবে দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং সার্থকনামা বর্দ্ধমানপুর হইয়া উঠিল।

এই বিক্রমপুর নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে শ্রীচন্দ্র

দেবের একখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাক মহাশয় Epigraphia Indica পত্রের xii খণ্ডে উহার পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই শাসনে শ্রীচন্দ্রদেবের পিতা ত্রৈলোক্য চন্দ্রদের সম্বন্ধে একটি রহস্যময় কথা লিখিত আছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র—

চন্দ্রানামিহ রোহিতাগি (রি)
ভুজাং বংশে বিশাল শ্রীয়াম্

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ চন্দ্রদের অনেকগুলি বংশ ছিল, ইহাদের মধ্যে রোহিতাগিরির মালিক যাঁরা ছিলেন, সেই বংশে ত্রৈলোক্যচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশ বিশালশ্রী ছিল, অর্থাৎ বেশ টাকা পয়সাওয়ালা ছিল। রোহিতাগিরি স্পষ্টই ত্রিপুরা জেলার লালসাই পাহাড়ের নাম। অতঃপর রহস্যের কথা এই যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র—

আধারো হরিফেল রাজককুদছত্রস্মিতানাং শ্রীয়ম্
যশ্চন্দ্রোপপদে বভুব নৃপতি দ্বীপে দিলীপোপমঃ।

হরিফেলের রাজার ককুদ্ ছত্রে হাস্য করিতেন যে রাজলক্ষ্মী, ত্রৈলোক্যচন্দ্র সেই রাজলক্ষ্মীর আধার স্বরূপ ছিলেন। এবং পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপে রাজা হইয়াছিলেন। নিহিতার্থ একটু প্রণিধান করিয়া দেখা যাক্।

চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জিলার অধিকাংশের প্রাচীন নাম। উহা হরিফেল রাজ্যের অন্তর্গত। কাজেই ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিফেলের রাজার অধীনে সামন্তরাজা হইয়াছিলেন। এ দিকে কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিফেল রাজলক্ষ্মীর আধার স্বরূপ ছিলেন। অর্থাৎ হয় অর্থবলের জন্য অথবা বাহুবলের জন্য হরিফেল-রাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উপর নির্ভর করিতেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র যে সমগ্র হরিফেলের রাজা হইয়া শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ তাম্রশাসন প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা হইতেই হরিফেল-রাজের পর-নির্ভরতার ফল কিরূপ ফলিয়াছিল, তাহা বেশ পরিষ্কারই বুঝা যায়। ধনবল বা বাহুবলের সাহায্য দিয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপটি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র প্রভুবংশকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেই হরিফেলের রাজা হইয়া বসিলেন। রোহিতাগিরি ও তাহার আশে পাশের যায়গা তো আগে হইতেই চন্দ্রদের হাতে ছিল। শ্রীচন্দ্র তাই এইবার ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের মালিক হইয়া বসিলেন। প্রাচীন নাম বলিতে গেলে, তিনি সমতট ও বঙ্গের একছত্র রাজা হইলেন।

এই ককুদ-ছত্র-ওয়ালা হরিফেলের রাজাটি কে? অভিধান খুলিয়া দেখুন, ককুদের নানা রকম মানে আছে। একটি অর্থ সর্প। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই হরিফেল রাজের রাজছত্র সর্প-চিহ্নিত ছিল। অবশ্য অন্য রকম মানেও করা যায়। এখন কান্তিদেবের তাম্রশাসনখানা দেখুন। উহার মাথায় যে রাজমুদ্রা সংলগ্ন আছে, তাহাতে দেখা যায়, একটি ত্রিভঙ্গ খিলানযুক্ত মন্দিরের মধ্যে চতুষ্পদ সিংহ-মূর্ত্তি,—শাসনের মধ্যে হিরণ্যকশিপু-বধের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, নৃসিংহ-মূর্ত্তি। তাহার নীচে উঁচু অক্ষরে লেখা—শ্রীকান্তি-দেবঃ। সমগ্র মুদ্রাটির নিম্নাংশ বেষ্টন করিয়া লাঙ্গুলে লাঙ্গুলে জড়াইয়া দুইটি বৃহৎ সর্প ফণা ধরিয়া আছে।

এই সর্প দুইটি এত বড় ও স্পষ্ট রূপে উৎকীর্ণ যে, উহারা যে শুধু শোভার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন মনে হয় না। আমার মনে হয়, ইহাই হরিফেল-রাজের রাজচ্ছত্রের ককুদ চিহ্ন। এবং এই কান্তিদেবের হাত হইতেই শ্রীচন্দ্র-দেব হরিফেল কাড়িয়া লইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্র-শাসন বিক্রমপুর নগরী হইতে প্রদত্ত। কান্তিদেবের সময়ে যাহার নাম বর্দ্ধমানপুর ছিল, বিক্রম পণ্যে লব্ধ হইয়া তাহা বিক্রমপুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বর্ম্মরাজগণ আনুমানিক ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপণ্যেই চন্দ্রগণের নিকট হইতে বিক্রমপুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। শেষ বর্ম্মরাজের নিকট হইতে এই বিক্রম-পণ্যেই বিজয়সেন আনুমানিক ১০৯০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। চন্দ্র ও বর্ম্মরাজগণের সমস্তগুলি এবং সেনরাজগণের অনেকগুলি তাম্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত।

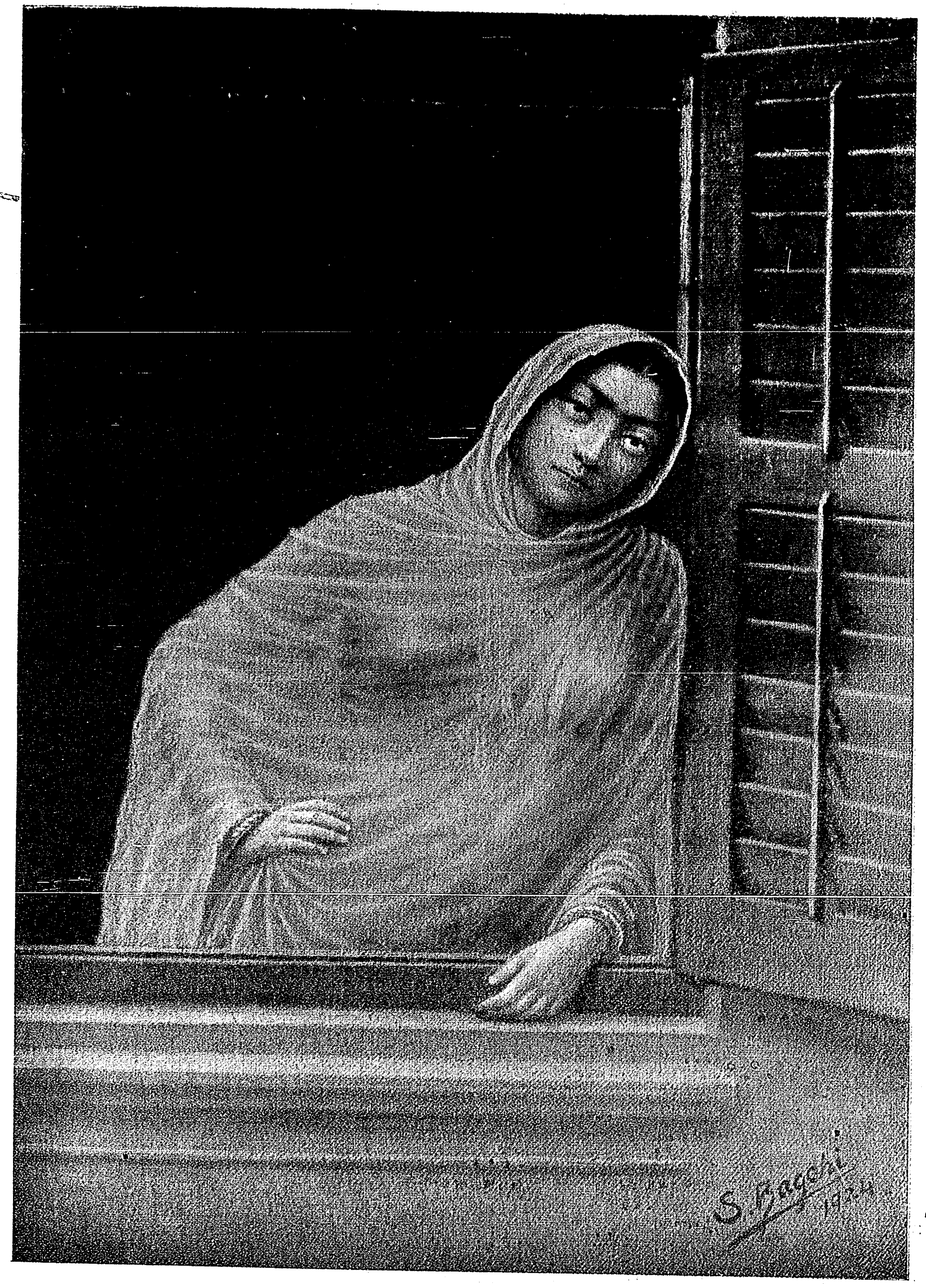

বাতায়ন বক্ষে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATIO

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

কিরণ তাহার কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার হলঘরের বারাণ্ডায় লীলা একা দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে! কতক্ষণ এসেছো? দেখা হলো অরুণের সঙ্গে?" হাসিমুখে নিকটে আসিয়া কিরণ প্রতিদিনের মত তাহার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

লীলা কিন্তু আজ আর তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। কিরণকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে অত্যন্ত কাঁপিতেছিল। তাহার মুখ একেবারে রক্তশূন্য, সাদা! সে মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নামাইয়া কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিরণ! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এসো—একটা নিরালা জায়গায় বসে সব বোলবো!"

কিরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। লীলার তেজোময় মূর্ত্তিই তাহার চির-পরিচিত,—লজ্জা ও সঙ্কোচে-ভরা নতশির, এ রূপ তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। তাহার হাসিমুখ শুকাইয়া গেল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সে বলিল, "ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে—লিলি?"

মুখ নীচু করিয়া লীলা বলিল, "আমি একটা বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি! তুমি যে আমায় কি বলবে, আর সকলেই বা কি বলবে, আমি তাই ভাবছি।"

কিরণ অস্থির হইয়া উঠিল। লীলা অন্যায় কাজ করিয়াছে! এ কি সম্ভব? এমন কি কাজ সে করিতে পারে, যাহার জন্য সে নিজে এমন কুণ্ঠিত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছে? অত্যন্ত আকুল হইয়া সে বলিল, "এমন কি অন্যায় করেছ তুমি? এসো—এইখানে বসে সব বলা দেখি? কি হয়েছে?"

দুজনে বারাণ্ডার শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চের উপর বসিল। সামনে একটা অশ্বত্থ গাছের মোটা ডালে দড়ীর দোলনা ফেলিয়া মালীর পুত্র গিরিধারিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে দুলিতেছিল। লীলা তাহার ম্লান নেত্রের কুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, "আমি সত্যই বড় অন্যায় কাজ করেছি, কিরণ! কিন্তু কেন যে করেছি, সে সবই তোমায় বুঝিয়ে বলছি—সব কথা শুনে তুমি আমার অবস্থাটা বুঝে দেখো। আজ সকালে অরুণের সঙ্গে আমার দেখা করতে আসবার কথা ছিল—সে তো তুমি জানই। আমি নিজেই ইচ্ছে করে এ দুঃসাহসের কাজ করতে সঙ্কল্প করেছিলুম,—কারো বারণ বা যুক্তি কিছুই শুনি নি। কিন্তু যখন তোমার বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম, তখন কেমন একটা অজানিত কুণ্ঠা ও সঙ্কোচে আমার বুকের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি ভাবছিলুম, জীবনে কোন দিন যাকে চোখেও দেখি নি, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই নেই, সেই একজন অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি, এমন অদ্ভুত খেয়াল্ কোথা হতে আমার মাথায় ঢুকলো! আজকের এ খেয়ালের শেষ ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তখন মনে হচ্ছিল, কেন তোমার বারণ শুনলুম না? তার পর আর একটা কথা এই যে, আমাদের প্রথম পরিচয়টা কি ভাবে হবে? আমি যে কি বলে নিজের পরিচয়টা দেবো—তার অনেক রকম মহড়া দিতে দিতে যাচ্ছিলুম। হেসো না তুমি—আমি সব কথাই বলছি তোমায়, ভাবলুম। বোলবো—'আমি বীণার বোন—লীলা। আপনি আমায় কখন দেখেন নি, তবু আপনি এখানে এসেছেন শুনে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। পরে হয় ত আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে।' আবার ভাবলুম—এই রকম বলি—'আমার অনধিকার-প্রবেশের জন্য মাপ করবেন। বীণার কাছ থেকে আপনার জন্যে একখানা চিঠি এনেছি।' প্রথম পরিচয়টা যে কি ভাবে দেবো, সেটা অনেকবার অনেক রকম করে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে মুখস্থ করতে করতে যাচ্ছিলুম। ভাঙা-গড়া সমানে চলছিল, কারণ, কোনটাই মনের মত হচ্ছিল না। যা হোক, বাড়ীর কাছাকাছি আসতে একটা কিছু স্থির করে ফেলা গেল। কিন্তু তখন আর একটা বিপদ এই হলো যে, যতই তোমার বাড়ীর কাছে আসি, ততই ব্যাপারটা এত অদ্ভুত ও লজ্জাকর মনে হতে লাগলো, যে, আমি ভাবতে লাগলুম, ফিরে যাই—আর গিয়ে কাজ নেই।"

বলিতে বলিতে লীলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সামনের বাগান হইতে পাখীদের গান শোনা যাইতেছে। গাছের পাতা কাঁপাইয়া শির-শির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। তাহার মৃদু হিল্লোলে বাগানের পুষ্পিত লতা ও লম্বা ঘাসের শ্রেণী কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিতেছিল। কিরণ কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে স্থির করিতে পারিল না—এবার তাহাকে কোন্ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অনেকক্ষণ পরে লীলা আবার বলিতে লাগিল, "হয় ত ফিরে গেলেই ভাল করতুম। কিন্তু তুমি ত আমার স্বভাব জানোই—যা ধরবো, তা আমায় করতেই হবে; না হলে আমার নিজের কাছ থেকে নিজেরি নিষ্কৃতি নেই। তাই, সব লজ্জা সঙ্কোচ চেপে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এসে পৌঁছলুম। একজন সহিস এসে আমার ঘোড়াটা ধরতে, আমি তাকে অরুণের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে আমায় তার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় উঠে, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সে তখন টেবিলের ধারে বসে মাথায় হাত রেখে হয় তো কিছু ভাবছিল।

আমি খুব আস্তেই ঘরে ঢুকেছিলুম, কিন্তু আমার সেই মৃদু পায়ের শব্দ তার কাণ থেকে এড়ায় নি। সে চমকে উঠে, কে এসেছে, জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো—'কে—বেহারা?' আমি তখন থতমত খেয়ে গেলুম। বুকের ভিতর তখন এত কাঁপছিল, যে, কোন কথা বলতে পারলুম না! সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বল্লে—'কে ওখানে? সাড়া দিচ্ছ না কেন?' কিন্তু আমি তখন কি বোলবো? আমি যা কিছু মুখস্থ করে এসেছিলুম, সে সবই ভুলে গেলুম। শুধু আত্মবিস্মৃত হয়ে নিস্পন্দের মত তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার তরুণ যৌবনের শোভা-সম্পদে-ভরা মুখ, আর সেই মুখে—সেই বড় বড় কালো চোখে কি শূন্য লক্ষ্যহীন দৃষ্টি! সে যখন—কে এসেছে, জানবার জন্যে তার অন্ধ নয়নের ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাইছিল, তখন একটা অব্যক্ত যাতনায় আমার চোখ ফেটে জল ঝরতে লাগলো! এদিকে আমায় নীরব দেখে সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো, 'কিরণ! তুমি কি এখনি ফিরে এলে! কথা বোলছো না কেন?' এবার আমি থতমত খেয়ে বলে ফেল্লুম, 'কিরণ এখনো ফেরে নি, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি?' আমি এই কথা বলবামাত্র সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠলো, 'এ কি? বীণা! তুমি আমায় দেখতে এসেছো!' এই কথা বলেই চক্ষের নিমেষে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো!

কিরণ এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। সে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "সে কি! তোমাকে বীণা বলে সে কি করে ভুল করলে? এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

লীলা বলিল, "সেই ভুলেই তো এত কাণ্ড ঘটলো! সে আমায় কাছে বসিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো! আমার আগে থেকেই মন বিপর্য্যস্ত হয়েছিল। তার পর এই আকস্মিক ব্যাপারে আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম, যে, তাকে কোন কথা বলবার বা বাধা দেবার আমার কোন শক্তি থাকলো না। খালি মনে হচ্ছিল—অরুণ এ কি করল! তার পরে ক্রমশঃ আমার মনে পড়তে লাগলো, বীণার ও আমার আকৃতি, গঠন, ও গলার স্বর প্রায় একই রকম। অন্ধকারে থাকলে বাড়ীতে প্রায়ই একজনকে আর একজন বলে লোকে ভুল করতো। দরজার বাইরে থেকে কথা বল্লে—কে লীলা, আর কে বীণা অনেক সময় বোঝা যেত না।"

কিরণ অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "যাক্‌গে সে কথা। তার পরে তুমি নিজের পরিচয় দিয়ে তার সে ভুলটা ভেঙে দিয়েছ তো? তা হলেই হলো। তার পর কি বলছিলে বলো—কি হলো তার পর?"

লীলা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "সেই কথাই তো বলছি, তুমি শুনে যাও। তার পরে আমি নিজে একটু প্রকৃতিস্থ হতেই, তার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে

বসলুম। তাকে নিজের পরিচয় দেব বলে তার মুখের দিকে চাইতেই হঠাৎ আমার স্বর বন্ধ হয়ে এলো!

"আমি দেখলুম, আমাকে বীণা বলে ভুল করে তার মনে কি বিপুল আশা ও আনন্দ আবার জেগে উঠেছে! যখন প্রথম তাকে দেখি, তখন দেখেছিলুম, যেন সে মুখে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না,—হতাশা ও বেদনায় মণ্ডিত সে কি বিষণ্ণ, কি মলিন সে মুখ! কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, সে আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না কিরণ! সে যেন নতুন জীবনে, স্ফূর্ত্তিতে, নতুন উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠলো! সে নিজে নিজেই পাগলের মত বকছিলো—'ওঃ! তুমি তা'হলে আমায় ভোল নি বীণা? আবার তবে তুমি আমার কাছেই ফিরে এলে? তুমি বোধ হয় আমার সে চিঠিখানা পেয়ে কত ব্যথা পেয়েছ, আমাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভেবে হয় তো কত কেঁদেছ! কিন্তু সত্যি বলছি বীণা, সে চিঠিখানা আমি লিখেছিলুম, শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে, আর ঘোর নিরাশায়। তোমাকে এ অবস্থায় নিজের সঙ্গে জড়িত করে কষ্ট দিতে কিছুতেই ইচ্ছে ছিল না তাই। না হলে মন যে আমার তোমায় কাছে পাবার জন্য কি তৃষিত, কি আকুল হয়েছিল, সে আমি তোমায় কি করে বোঝাবো? তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এসেছো, এতে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে, সে অন্তর্যামী যিনি—তিনিই জানছেন!'

সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে এই রকম পাগলের মত বকে যাচ্ছিল। আমি তাকে কি করে তখন বলি, 'ওগো! তোমার ভুল হয়েছে! বীণা আর তোমায় চায় না, সে তোমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তার কাছে আর কিছুর আশা করো না তুমি!' যে জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে,—এই ক্ষীণ আশার আলোটুকু তার কোন্ প্রাণে আমি নিবিয়ে দেব? আমি জানি, আমার অন্যায় হচ্ছে, তবু আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি, কিরণ! আমি তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেছি, যে, সে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বীণা বলেই জেনেছে ও সেই আনন্দে বিভোর হয়ে আছে!"

"লিলি!" কিরণ সহসা উদ্দীপ্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া লীলার মুখের দিকে চাহিল।

লীলা একবার তাহার দিকে চোখ তুলিয়াই তখনি মাথা হেঁট করিল। তাহার মুখ তখন একেবারে রক্তশূন্য, বিবর্ণ। কেবল তাহার পাতলা লাল ঠোঁট দুটি অত্যধিক আবেগে কাঁপিতেছিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কিরণ অত্যন্ত কঠোর স্বরে বলিল, "আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, তুমি কি করে এমন কাজ করলে?"

লীলা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না; কিরণ। তুমি আমার উপর রাগ করতে পাবে না! আমি মায়ের মুখের সামনে এর জবাবদিহি করতে পারবো, বাবার মুখের উপর তর্ক করতে পারবো, কিন্তু তুমি—তুমি—আমার একমাত্র বন্ধু,—আমার বড় প্রিয় তুমি; আমার উপর তুমি রাগ করে থাকবে, সে আমি কোন মতে সহ্য করতে পারবো না!"

কিরণ লীলার এ আকুলতায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কি করে তুমি এমন নির্লজ্জ কাজ করলে? একবার ভেবে দেখলে না,—সে কত বড় দুঃখী—কত বড় অসহায়, ভাগ্যবঞ্চিত! সে কারু খেয়াল বা খেলার পাত্র নয়। এত বড় প্রতারণা তাকে করতে পারলে তুমি? তোমার নিজের মুখে শুনেও এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে আমার! তুমি এমন কাজ করলে?"

লীলা তাহার সজল চোখ দুটি তুলিয়া করুণ দৃষ্টিতে কিরণের মুখের দিকে চাহিল; "বলিল, আমি তোমায় বড় উত্যক্ত করেছি কিরণ! তোমার তিরস্কার এখন আমায় সহ্য করতেই হবে।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। কিরণ ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও দারুণ বিরক্তিপূর্ণ হৃদয়ে লীলার এই বিসদৃশ আচরণের কথা ভাবিতেছিল। আর লীলা তাহার নিজের হৃদয়ের এ দীনতা দেখিয়া নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! সে যে চিরদিন নিজের ইচ্ছামত চলিয়া নিজের খেয়ালমত কাজ করিয়া, নিজের দর্পে চলিয়া, আসিতেছে,—সে তু কোন দিন কাহারও বিরাগ বা অসন্তোষের কিছুমাত্র ধার ধারিত না,—আজ তাহার এ কি হইল? কিরণের সুমুখে সে যে মুখ তুলিতে পারিবে না, তাহার বিরক্তির ভয় যে তাহাকে এমন আকুল করিয়া তুলিবে, তাহাই কি সে পূর্ব্বে ভাবিতে পারিয়াছিল?

মৃদু দোলায় অলস নিশ্চিন্ত ভাবে গিরিধারীকে দুলিতে দেখিয়া তাহার বন্ধু মুখনের মনে অনিবার্য্য কৌতুকস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে পিছন দিক হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া সহসা প্রাণপণ বলে গিরিধারীকে এক ঠেলা দিয়া বিষম জোরে দোলাইয়া দিল।

গিরিধারী তখন অতি আরামে দুলিতে দুলিতে চক্ষু মুদিয়া বয়স্কদিগের অনুকরণে একটি প্রচলিত ঝুলনের গান গাহিতেছিল—'পিয়া গয়ে পরদেশীয়া, না লিখে পাতি রে-হয়ি'!

অকস্মাৎ প্রবল দোলায় সবেগে দুলিয়া উঠিয়া, সে পতনের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, তাহার বিরহ-গীতি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই, তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—মায়ী-রে মায়ী!

সুখন হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া, হাততালি দিতে দিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে মালীর কুটীর হইতে মালীগৃহিণীকে—'কউন্ গুলাম কা বেটা রে' বলিতে বলিতে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়া, সে বেচারা অকাল রসভঙ্গে সহসা বিপরীত দিকে চম্পট দিল।

গিরিধারীর চীৎকারে সচেতন হইয়া কিরণ বলিল, "কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ লীলা! দয়া, সহানুভূতি, মমতা—এ সবই খুব ভাল জিনিস। কিন্তু সব জিনিসেরই সীমা আছে। মাত্রা ছাড়ালে ভাল জিনিসেরও কোন মর্য্যাদা থাকে না। তুমি যে পথে চলেছ, তা অত্যন্ত অসম্মানকর। তোমার নিজের সম্মানের পক্ষে। তা ছাড়া, অরুণের প্রতি এটা যে কত বড় অত্যাচার, তা তুমি বুঝতে পারছ না? যে অনিবার্য্য নিরাশা ও ব্যথা তাকে সহ্য করতেই হবে, সেটা প্রথম থেকে অভ্যাস করাই ভালো! দুদিনের জন্য তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মিছে নূতন করে তাকে কষ্ট দেবার কি সার্থকতা আছে—আমি ত কিছু বুঝি না।"

লীলা পুষ্পিত চন্দ্রমল্লিকার গাছে বাতাসের খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমি শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখেছি কিরণ! আমার সম্মান যাতে নষ্ট না হয়, আর তার প্রতিও কোন অন্যায় যাতে না হয়, তুমি আসবার আগে আমি সে সব কথাই ভেবে দেখেছি।"

"অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত সে তোমাকে বীণা বলেই জানবে, আর তুমি তাকে বিয়ে করবে—এই তো?" কিরণের স্বর আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

লীলা বলিল, "আমার এখনো আশা আছে,—আর কিছু দিন ভেবে দেখলে বীণা তার মত বদলাবে। তত দিন আমি এই ভাবেই এসে মাঝে মাঝে তাকে দেখে যাব। আর যদি কিছুতেই বীণা না বোঝে, তা হলে অরুণকে বিয়ে করতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। কারণ, আমি তাকে ভালবাসি!"

"ঐখানেই তোমার ভুল! তুমি কখনো তাকে ভালবাস না।"

"নিশ্চয়ই! আমি অনেক ভেবে বুঝে দেখেছি, আমি তাকে ভালবাসি, যথার্থই ভালবাসি।"

"কখনও না!" অত্যন্ত রাগিয়া কিরণ বলিল, "তোমার দয়া ও সহানুভূতি—এই দুটোকেই ভালবাসা বলে চালাতে চাচ্ছ, আর নিতান্ত নির্ব্বোধের মত একটা কাজ করছো! আমি কখনো এ সব কাণ্ড ঘটতে দেব না।"

লীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি কাতর মিনতি-ভরা। সে বলিল, "কিরণ! তুমি আমার এত দিনের বন্ধু হয়ে আজ আমার সঙ্গে এই রকম ব্যভার করবে?"

"আমি তোমার বন্ধু—তাই তুমি না বুঝে যে অন্যায় কাজ করেছ, সময় থাকতে তার প্রতীকার করবার অধিকার আমার আছে। আমি অরুণকে সব বুঝিয়ে বোলবো। তার কষ্ট হবে বলে সে সময় তুমি তাকে কোন কথা বলতে পার নি, এ কথা শুনলে সে আর কিছু মনে করবে না। সে মানুষ,—মানুষের মতই তাকে তার নিরাশার কষ্ট মাথা পেতে নিতে ও সহ্য করতে দাও; তুমি নিজে থেকে কেন বুঝছো না—এ কাজটা কত খারাপ হচ্ছে?"

লীলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারছি না। তোমার মধ্যস্থতার ফলে যে বেচারা এত কষ্ট পেয়েছে, তাকেই আবার নতুন করে যাতনা সহ্য করতে হবে। তুমি জানো—তার দুর্ভাগ্য আমার কাছে তোমাদের মত তুচ্ছ বিষয় নয়! তোমাকে কিংবা আর কাউকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাকে আমি দুঃখ দিতে পারবো না!"

বলিতে বলিতে লীলার মুখের স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিল। সে তেজে গর্ব্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া স্থির চক্ষে কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "জানো তুমি—আমি নিজেই নিজের প্রভু,—আর কারু মত বা ইচ্ছা অনুসারে চলা আমার স্বভাব নয়! অরুণের কাছে আমি নিজে এক দিন সব স্বীকার করবো। আর সব শুনেও সে যদি আমায় চায়, তা হলে তাকে সুখী করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবো। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে স্থির করে নিয়েছি,—আর কারু তাতে কথা বল্‌বার কি অধিকার? তোমার কাছে শুধু আমি এই চাই যে, আমার বলবার আগে তুমি তাকে কোন কথা ভাঙবে না। এখন যদি তুমি আমায় বঞ্চনা করো—আমি যাবজ্জীবন তোমায় ঘৃণা করবো। জানো ত? আমি তোমায় কত ভালবাসি?"

"আমি জানি না! জানবার দরকারও নেই! তুমি যদি তোমার ইচ্ছামত চলো, আমার বলবার অধিকার কি?" কিরণ রাগে মুখ অন্ধকার করিয়া বারাণ্ডায় পায়চারী করিতে লাগিল।

লীলা এক মুহূর্ত্ত তার সেই বিমুখ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তার এ কি পরাজয়ের দিন! তাহার মনের বল, দর্প—সবই যে ভাসিয়া যাইতে চলিল! কিরণ রাগ করিয়া দূরে থাকিলে, সে যে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না!

লীলা আবার তার সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কিরণের কাছে গেল। বলিল, "কিরণ! তুমি রাগ করে যাই বল না,—আমি তোমায় সত্যই ভালবাসি,—তোমার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারি নি। আজও তোমায় সব খুলে বল্লুম। এখন যদি তুমি গোঁয়ারতুমি করে অরুণকে কষ্ট দাও, তা হলে জীবনে কখনো আমি তোমার মুখ দেখবো না। কিন্তু এখন,—এখন আমার এই সঙ্কটের সময় তুমি কি আমার একটা কথাও রাখবে না কিরণ? এমনি করে এত সহজে আমায় দূরে সরিয়ে দেবে?" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে লীলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিরণ তখনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বল, কি বলবে?"

"শুধু বিশ্বাস কর,—আমি চুরি করে বীণার প্রাপ্য ভালবাসা তার কাছ থেকে নিতে আসি নি। তার কষ্ট ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। যত দিন না আমি নিজে থেকে তাকে সব কথা বলি, তত দিন তুমি চুপ করে থেকো। আমি মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যাবো। তাতে আমার বা তার কোন ক্ষতি হবে না। বল, আমার কথা রাখবে?"

কিরণ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "তোমার এ কথায় আমার সমস্ত মন থেকে বিদ্রোহ জেগে উঠছে! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এ ব্যাপারের সবটারই আমি প্রতিবাদ করি। তুমি প্রতারক, ঠক,—তুমি স্বেচ্ছাচার করছো। তুমি এখন আর সে লীলা নেই, কাজেই তোমার সঙ্গে আমার আর আগেকার সে ভাব থাকতে পারে না। এ রকম স্বেচ্ছাচার কেউ সহ্য করতে পারে না।

এবার লীলাও অত্যন্ত রাগিল। সে বলিল, "স্বেচ্ছাচার কি রকম! যা ইচ্ছে তাই বোলতে সুরু করেছ যে দেখছি?"

তাহার রুষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সমান উত্তেজিত ভাবে কিরণ বলিল, "তা নয় তো কি? তুমি আজ যে কাজ করেছ, কোন ভদ্রকন্যা কখনো করা ছেড়ে তা ভাবতেও পারে না। তুমি একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে নিজে উপযাচক হয়ে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করেছ,—এ কথা মনে হয়ে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! শেষে হয় তুমি তাকে বিয়ে করে এই কুৎসিত ব্যাপার শেষ করবে, আর নয় ত দেখবে—তুমি একটা নিতান্ত আত্মসম্মান-জ্ঞান-শূন্য সাধারণ স্ত্রীলোকের অধম। যে খেলা তুমি খেলছো, তার শেষ ফল ও পরিণাম এই!"

লীলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে খানিক চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তার পর জোর করিয়া মুখ তুলিয়া সহজভাবে বলিল, "চুলোয় যাক ও কথা! তুমি কি ভাববে না ভাববে, সে ভাবনায় আমার কোন দরকার নেই। এখন বল,—তুমি আমার কথা রাখবে কি না?"

কিরণ অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত কথা—এত তর্ক—এত অপমান—তবুও সে তাহার জেদ ছাড়িবে না? কি অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে! অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে বলিল, "কাজেই—না রেখে উপায় কি!" (ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাল্য-বিবাহ ও অকাল-মৃত্যু

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

আমাদের দেশের অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা ইয়োরোপাদি সভ্য দেশের তুলনায় বেশী। তাহার কারণ অনুসন্ধান করা ও তাহা যাহাতে বন্ধ হয় সেরূপ চেষ্টা করা সকলেরই উচিত; সুতরাং এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। গত মাঘ মাসের সংখ্যার "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে মহাশয় পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধগুলির সার সংগ্রহ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে এই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বাল্য-বিবাহের অন্যান্য অশুভ ফলের মধ্যে উহা বেশী অকাল-মৃত্যুর কারণ। অন্যান্য অশুভ ফলের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া অকাল-মৃত্যুর সহিত বাল্য-বিবাহের কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে কি না, তাহারই আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোড়াতেই একটা কথা ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। কোন্ সময়ের বিবাহকে "বাল্য-বিবাহ" বলা হইতেছে? ৩৫ বৎসর যাবৎ বাল্য-বিবাহের দোষের অনেক আলোচনা দেখিলাম, কিন্তু ঠিক কোন্ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, তাহা কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিতে শুনিলাম না। আমাদের বিবাহ-প্রথার বিরোধীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণীর লোকের মতে—যত দিন না পুরুষের স্ত্রী-পুত্রাদির উপযুক্ত রকমে ভরণ-পোষণ করিবার ক্ষমতা হয়, তত দিন বিবাহ করা উচিত নয়। সুতরাং অনেকের পক্ষে ৫০, ৬০ বৎসর বয়সেও বিবাহ করা দোষাবহ হইতে পারে, যদি তখনও সে স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারে। আবার যাহার বিষয়াদি আছে, সে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলেও তাঁহাদের মতে আপত্তিজনক হয় না। এরূপ আপত্তিকারীদের কথার এবারে আলোচনা করিব না, বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল; তাঁহাদের মতে বিবাহকে কিন্তু ঠিক "বাল্য-বিবাহ" বলা সঙ্গত নয়। আর এক শ্রেণীর লোক লেখাপড়া শেষ করার পূর্ব্বে বিবাহে আপত্তি করেন। ইঁহাদের সহিত হিন্দুর বিবাহ-প্রথার বিরোধ অতি অল্প; কারণ, পূর্ব্বকালে কেবল ব্রাহ্মণেরাই লেখাপড়া শিখিত—তাহাদের গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। বাকী লোকেরা বড় লেখাপড়া শিখিত না। আজকালও আমাদের দেশে লেখাপড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন আবার এক নূতন কথা উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও লেখাপড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা কতক নব্যতন্ত্রীদের মতে উচিত নয়। ইঁহাদের সহিত হিন্দু-বিবাহ প্রথার যথেষ্ট বিরোধ; কারণ, হিন্দুরা বহুকাল হইতেই, স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কিম্বা তৎসময়ে বিবাহটা একান্ত কর্ত্তব্য—এ কথা বলেন। হিন্দুদিগের স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ আর এখনকার স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শের সহিত বহু প্রভেদ থাকায়, এরূপ বিরোধ হইতেছে। হিন্দু স্ত্রী-শিক্ষার যে আদর্শ, সেরূপ স্ত্রীশিক্ষা বিবাহ হইলেও সহজে হইতে পারে। এরূপ বিরোধীদের কথাও বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কেবল বিবাহের বয়সের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের বিবাহ-প্রথার দোষ দেন। তাঁহারাই শরীর-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বলেন যে, অল্প বয়সে বিবাহ দিলে—স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যহানি হয়, সন্তানেরা বলিষ্ঠ হয় না ও অনেক বেশী অকাল-মৃত্যু হয়। ইঁহাদের কথাটাই এবারে আলোচ্য।

আমাদের দেশে পুরুষদের শুক্র জন্মিবার পূর্ব্বে আজকাল আর বিবাহ হয় না বলিলেই হয়। স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ যাঁহারা দোষের বলেন, তাঁহাদের সহিতই হিন্দুদের বিশেষ বিরোধ। এখন দেখা যাউক, তাঁহারা কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ বিবাহকে বেশী অকাল-মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইখানে পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যাঁহারা কোন একটা বিষয়ের বা ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, তাঁহারাই তাহার প্রমাণ দিতে বাধ্য। ন্যায়শাস্ত্র মতে কারণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে দুইটী উপায়ের সাহায্যে তাহা করিতে হয়—Observation (পর্য্যবেক্ষণ) ও Experiment (পরীক্ষা)। আর একটা সহকারী উপায় আছে—সেটা Analogy (সাদৃশ্য ন্যায়)।

অকাল-মৃত্যুর সহিত বাল্য-বিবাহের কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আছে কি না, এ বিষয়ে কোন কালে, কোন দেশে যে বিশেষ ভাবে Experiment হইয়াছে, তাহা আমার জানা নাই; এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুযায়ী Experiment যে হইতে পারে, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এ স্থলে পর্য্যবেক্ষণের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কিরূপ পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছে, একবার দেখা যাউক। আমার যতদূর মনে আছে, ব্রাহ্ম-বিবাহের বয়স নিরাকরণের সময় ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কতিপয় খ্যাতনামা ডাক্তারদের এ বিষয়ে মত লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ১২, ১৩ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৪, ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বয়স ও ১৭, ১৮ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষদের বয়স বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আর একবার Age of Consent বিলের সময়ে

অনেক ডাক্তার কবিরাজদিগের মত লওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে কিন্তু তাঁহাদের ভিতর খুব বেশী রকমের মতভেদ দেখা গিয়াছিল। ইহা ছাড়া আর কখন যে আমাদের দেশের ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, ধাত্রীদের,—যাঁহাদের এ বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ বেশী আছে, তাঁহাদের মতের census লওয়া হইয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকায় বাল্যবিবাহ হয় না, সুতরাং সেখানকার ডাক্তারদের পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগের অভাব এবং সে দেশের জল-হাওয়া ও সামাজিক অবস্থা আমাদের অবস্থা হইতে পৃথক হওয়ায় তাঁহাদের মতের কোন মূল্য নাই। আমাদের দেশের যে সকল ডাক্তাররা "বাল্যবিবাহের" বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন, তাঁহারা কতগুলি case দেখিয়া, কিরূপ ক্ষেত্রে, কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মত দিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে তাহাদের মত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নয়; এবং ন্যায়শাস্ত্রমতে যে পর্য্যবেক্ষণ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব। দুই চারিটী ডাক্তারের মত উদ্ধৃত করিয়া, বাল্যবিবাহ বেশী অকাল মৃত্যুর কারণ—এই কথাটা প্রমাণ হইয়া গেল বলাটা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। বাল্যবিবাহের বিরোধীরা তো তাঁহাদের কোন পর্য্যবেক্ষণের ফল প্রকাশ করেন নাই। আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখি—কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

বাল্যবিবাহের সহিত যদি বেশী অকাল-মৃত্যুর কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে তাহার দোষময় ফল শিশুমৃত্যুর ও স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে দেখিতে পাওয়া উচিত। বাল্য-বিবাহের বিরোধীরা এই শিশুমৃত্যুর সংখ্যার আতিশয্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলেন। আমাদের দেশে বিলাত অপেক্ষা শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা অনেক অধিক।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, বিলাতে তাহা নাই। ইহা হইতে বাল্যবিবাহ অধিক শিশুমৃত্যুর কারণ, এই সিদ্ধান্ত ন্যায়শাস্ত্র মতে করা যায় না। বিলাতের লোক ফর্শা—আমরা কাল, সুতরাং কাল হওয়াটাকে যেমন অধিক শিশুমৃত্যুর কারণ বলাটা অসঙ্গত,—শুধু এই যুক্তির সাহায্যে বাল্যবিবাহকে অধিক শিশুর মৃত্যুর কারণ বলাটা ঠিক ততটাই অসঙ্গত। কার্য্য-কারণ সম্পর্ক দেখাইতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত method of concomitant variation দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। যদি একটী ঘটনা আর একটী ঘটনার সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত থাকে যে, একটা বাড়িলে বা কমিলে আর একটা সেইরূপ বাড়ে বা কমে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটীকে শেষের ঘটনার কারণ বলা যায়। ইহাকেই method of concomitant variation বলে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার কোন্ কোন্ জেলায় শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ এবং সেই সেই জেলায় বাল্যবিবাহ কতটা প্রচলিত ১৯২১ সালের আদমশুমারি (census) হইতে তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। দুঃখের বিষয় ১৯২১ সালের censusএ এরূপ তালিকা প্রস্তুত করিবার উপকরণ নাই। তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যে সকল জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাল্যবিবাহের প্রচলন অর্থাৎ যাহাতে পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক ১০০০ বালিকার ভিতর ৫৬৫ হইতে ১৫০ বালিকা বিবাহিতা, তাহাদিগকে "ক" শ্রেণীভুক্ত করিলাম। এবং যে সকল জেলায় পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক ১০০০ বালিকার ভিতর ১৫০ হইতে ১০০ বিবাহিতা, সেই সকল জেলাকে "খ" শ্রেণীভুক্ত করিলাম। এবং ওইরূপ ১০০০ বালিকার ভিতরে ১০০ অপেক্ষা কম বালিকা যে সকল জেলায় বিবাহিতা সেই জেলাগুলিকে (অর্থাৎ এই সকল জেলায় সাধারণতঃ এক বৎসরের কম বয়সী শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম; অর্থাৎ ওইরূপ ১০০ শিশুর ভিতর ২০ কিংবা তদপেক্ষা কম সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়) প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা গেল। যে সকল জেলায় ওইরূপ শিশুমৃত্যুর সংখ্যার হার শতকরা ২০ হইতে ২৪ তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা গেল এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যেখানে শতকরা ২৫ কিংবা তদূর্দ্ধ, তাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিলাম। ওই তালিকাগুলিতে সর্ব্ববিষয়ের সমষ্টি-মৃত্যুর হারও দিলাম। তাহা হইতে ওই সকল জেলার স্বাস্থ্যের অবস্থাও দেখিতে পাইবেন।

'ক' শ্রেণী

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশু মৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
১ দারভাঙ্গা	৫৬৫	প্রথম	১৩ হইতে ১৬	৩০ হইতে ৩৫
২ ভাগলপুর	৪৩৫	,,	১৩ ,, ১৬	৩০ ,, ৩৫
৩ মুঙ্গের	৩৭৩	,,	১৭ ,, ১৮	৩৫ ,, ৪০
৪ মজফ্‌ফরপুর	৩৪০	,,	১৭ ,, ১৮	৩৫ ,, ৪০
৫ হাজারিবাগ	২৪৫	,,	১৭ ,, ১৮	৩০ ,, ৩৫
৬ মানভূম	১৮৬	,,	১৩ ,, ১৬	২৫ ,, ৩০
৭ চব্বিশপরগণা	১৭৭	,,	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশুমৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
৮ পূর্ণিয়া	১৭৩	প্রথম	১৯ হইতে ২০	৩৫ হইতে ৪০
৯ গয়া	১৭৩	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৪০ ,, উর্দ্ধ
১০ যশোহর	১৬৫	প্রথম	১৯ ,, ২০	৩৫ ,, ৪০
১১ বাঁকুড়া	১৬১	”	১৯ ,, ২০	৩০ ,, ৩৫
১২ বীরভূম	১৫৪	দ্বিতীয়	২৩ ,, ২৪	৩০ ,, ৩৫

‘খ’ শ্রেণী

১ পাটনা	১৪৫	তৃতীয়	২৫ হইতে ২৭	৪০ হইতে উর্দ্ধ
২ মুরশিদাবাদ	১৪২	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩৫ ,, ৪০
৩ মেদিনীপুর	১৩৮	”	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
৪ ফরিদপুর	১৩৭	প্রথম	১৯ ,, ২০	৩০ ,, ৩৫
৫ হুগলী	১৩৬	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
৬ পালামাউ	১৩৬	”	২১ ,, ২২	৩৫ ,, ৪০
৭ নদীয়া	১৩৩	প্রথম	১৯ ,, ২৯	৩৫ ,, ৪০
৮ সাহাবাদ	১৩১	দ্বিতীয়	২৩ ,, ২৪	৪০ ,, উর্দ্ধ
৯ সাঁওতাল পরগণা	১৩০	প্রথম	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
১০ খুলনা	১২৯	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
১১ বর্দ্ধমান	১২৯	”	২৩ ,, ২৪	৩০ ,, ৩৫
১২ চাম্পারণ	১২৪	প্রথম	১৯ ,, ২০	৩৫ ,, ৪০
১৩ রাজসাহী	১১৭	”	১৯ ,, ২০	৩৫ ,, ৪০
১৪ রঙ্গপুর	১১১	দ্বিতীয়	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
১৫ বাখরগঞ্জ	১০৪	”	২১ ,, ২২	৩০ ,, ৩৫
১৬ মালদহ	১০৫	প্রথম	১৭ ,, ১৮	৩৫ ,, ৪০

‘গ’ শ্রেণী

১ পাবনা	৯৫	প্রথম	১৭ হইতে ১৮	৩৫ হইতে ৪০
২ দিনাজপুর	৮৭	দ্বিতীয়	২৩ ,, ২৪	৪০ ,, উর্দ্ধ
৩ পেসরা	৮৩	প্রথম	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
৪ নারন	৬৩	,,	১৯ ,, ২০	৪০ ,, উর্দ্ধ
৫ ত্রিপুরা	৫১	,,	১৩ ,, ১৬	২৫ ,, ৩০
৬ বালেশ্বর	৫৬	তৃতীয়	২৫ ,, ২৭	৩৫ ,, ৪০
৭ রাঁচি	৫৩	প্রথম	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
৮ জলপাইগুড়ি	৫২	তৃতীয়	২৫ ,, ২৭	৩৫ ,, ৪০
৯ ঢাকা	৫০	প্রথম	১৭ ,, ১৮	৩০ ,, ৩৫
১০ ময়মনসিংহ	৪৯	,,	১৭ ,, ১৮	২৫ ,, ৩০
১১ সিংহভূম	৪০	,,	১৩ ,, ১৬	২২ ,, ২৫
১২ নোয়াখালি	৩৫	,,	১৩ ,, ১৬	৩০ ,, ৩৫

জেলা	পাঁচ হইতে দশ বৎসরের ১০০০ বালিকার ভিতর বিবাহিতার সংখ্যা	শিশু মৃত্যুর হারে কোন শ্রেণীভুক্ত	শিশু মৃত্যুর হার শতকরা	সাধারণ মৃত্যুর হার শতকরা
১৩ কটক	২৫	দ্বিতীয়	২৩ হইতে ২৪	৩৫ হইতে ৪০
১৪ পুরী	২০	,,	২৩ ,, ২৪	৩৫ ,, ৪০
১৫ দারজিলিঙ	১৭	,,	২১ ,, ২২	৩৫ ,, ৪০
১৬ চট্টগ্রাম	১৫	প্রথম	১৭ ,, ১৮	৩০ ,, ৩৫

এই তালিকা হইতে দেখা যায়, যে সকল জেলায় বাল্যিকা-বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার বেশীরভাগ স্থলেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। সুতরাং method of concomitant variation দ্বারা অধিক শিশু-মৃত্যু যে বাল্য-বিবাহের ফল, এ কথা একেবারে সপ্রমাণ হইল না।

কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হার দেখিলে, বাল্য-বিবাহ যে অধিক শিশু-মৃত্যুর কারণ, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিকাতার ওয়ার্ড সকলের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার, ৫, ১২, ১৬, ১৭ ও ২৫ ওয়ার্ডে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, শতকরা ৪৩ ও তদধিক। ৫নং ওয়ার্ড জোড়াবাগান এবং ২৫নং ওয়ার্ড ওয়াটগঞ্জ। ইহার মধ্যে জোড়াবাগান বড়ই অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ওয়াটগঞ্জ ওয়ার্ডের ভিতর হাস-পাতাল থাকাতে তাহার শিশু-মৃত্যুর হার বেশী হওয়া সম্ভব। কিন্তু ১২, ১৬ ও ১৭ ওয়ার্ডে ইয়োরোপীয়দের সংখ্যাই অধিক ও তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও ফাঁকা। ১২নং ওয়ার্ডের পশ্চিমে গঙ্গা ও দক্ষিণে গড়ের মাঠ। ইহার ভিতর সেই সময়ে ৬২৬ জন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মধ্যে ৪৭৯ জন খৃষ্টান, ৩৯ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান, ৬৪ জন ইহুদী, ১০ জন বৌদ্ধ, ১৫ জন কনফুসিয়ান ও ৮ জন পার্সী। ১৬নং ওয়ার্ডের উত্তর দিকে পার্ক ষ্ট্রীট আর পশ্চিমদিকে গড়ের মাঠ। তাহাতে ৮১৫ জন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার মধ্যে ৫৭৪ জন খৃষ্টান, ১৮৯ জন হিন্দু, ৩৮ জন মুসলমান, ১৩ জন ইহুদী, ১ জন বৌদ্ধ। ১৭নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ দিকে সারকুলার রোড ও পশ্চিম দিকে গড়ের মাঠ। ইহাতে ৫১২ জন স্ত্রীলোকের বাস ছিল। তাহার মধ্যে ৪৭১ জন খৃষ্টান, ৮০ জন হিন্দু, ৩১ জন মুসলমান, ৫ জন ইহুদী ৩ জন ব্রাহ্ম, ১ জন পার্সী, ১ জন বৌদ্ধ।

এই তিনটী ওয়ার্ডে যখন অল্প বয়সে বিবাহিতা হিন্দু স্ত্রীলোকদের সংখ্যা এত অল্প, এবং যখন আমরা জানি, তাহার ভিতর চাকরাণী, মেথরাণীর আয়ার সংখ্যাই বেশী, এবং তাহাদের ভিতর নাবালিকার সংখ্যা প্রায় নগণ্য, তখন যে এ সকল ওয়ার্ডের শিশুমৃত্যু, অর্থাৎ ইয়োরোপদেশবাসী বেশী বয়সে বিবাহিতাদের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার হার বেশী তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

আবার সর্ব্বাপেক্ষা কম শিশু-মৃত্যুর হার দেখি ভবানীপুর (১৩) ও গোয়াবাগান (৩) অঞ্চলে। এখানে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ১৩ হইতে ১৯।

তাহার পর ওয়ার্ড নং ৪, ৯, ১১, ২১ এবং ১০এ শিশু-মৃত্যুর সংখ্যার হার শতকরা—২২ হইতে ২৫।

১০নং ওয়ার্ড ছাড়া বাকী ওয়ার্ডগুলিতে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী।

সুতরাং দেখা গেল, শিশু-মৃত্যুর হার দেখিয়া বাল্য-বিবাহকে তাহার কারণ বলা কতটা অসঙ্গত।

এই তো গেল শিশু-মৃত্যুর কথা। এইবারে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর কথা দেখা যাউক।

১৯১১ সালের আদমসুমারীর ৩০৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুর হার পুরুষদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক কম। বিহার প্রদেশে যেখানে পুরুষদের ১০০ মরে, সেখানে স্ত্রী-মৃত্যু ৮৯·২, বাঙ্গালায় ৯১·২, সমস্ত ইয়োরোপের average ৯০·৫। এই রিপোর্টের ৩০১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, পুরুষের মৃত্যুর তুলনায় বাঙ্গলার স্ত্রীমৃত্যু স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের স্ত্রীমৃত্যু অপেক্ষা কম। আবার ২৭৩ পৃষ্ঠায় হিন্দু-বিবাহ-প্রথা-বিরোধী গেট্ (Sir Edward Gait) সাহেব বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা (Chances of life) অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।

যদি বাল্যবিবাহ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশী হইতে পারিত না। Sir Edward Gait এই হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশী বলিতে বাধ্য হইয়া, শেষকালে অনেক মাথা ঘামাইয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ না থাকাতে এবং উহাদের ভিতর অনেক বাল-বিধবা থাকাতে, তাহারা সন্তান প্রসবের বিপদ হইতে রক্ষা পায় বলিয়াই এইরূপ হয়। কিন্তু তাঁহার এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বিধবারাও যেরূপ সন্তান প্রসব করে না, অবিবাহিতারাও সেইরূপ সন্তান প্রসব করে না। ভারতবর্ষে হাজারকরা

হিন্দু	বিধবা	২১২	অবিবাহিতা ২১৭	মোট ৫০১
মুসলমান	ঐ	১৬০	ঐ ৩৯২	” ৫২২
খৃষ্টান	ঐ	১০৮	ঐ ৪৯৭	” ৬০৫

সুতরাং যাহারা সন্তান প্রসব করে না, এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ে বেশী হইলেও, তাহাদের অপেক্ষা বাল্য-বিবাহিতা হিন্দু-রমণীদের বাঁচিবার সম্ভাবনা যখন বেশী, তখন সেটা অসন্তান প্রসবকারিণী বিধবার সংখ্যার আতিশয্যে হয় এরূপ বলা

অসঙ্গত। সুতরাং বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, বাল্য-বিবাহকে অধিক স্ত্রী-মৃত্যুর কারণ বলা যায় না।

এ বিষয়ে আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে। যখন প্রথমে (১৮৭০ সালে), বিলাতী জীবনবীমা আফিস সকল দেশী লোক-দিগের জীবনবীমা করিতে আরম্ভ করিল তখন তাহারা এদেশ-বাসীদের নিকট হইতে ইয়োরোপীয়াদের অপেক্ষা বেশী হারে Premium লইত; তখন তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এদেশবাসীদের পরমায়ু কম। কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যা খতাইয়া তাহারা দেখিল যে এদেশবাসীদের পরমায়ু ইয়োরোপীয়ানদের অপেক্ষা অল্প নয়। তখন তাহারা এদেশবাসীদের Premium এদেশবাসী ইয়োরোপীয়ানদের সমান করিয়া দিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাল্যবিবাহিত পিতামাতার (সেকালে সকলেরই বাল্যবিবাহ হইত) সন্তান বেশী বয়সে বিবাহিত পিতামাতার সন্তান অপেক্ষা অল্পায়ু নয়। এখন দেখুন, বাল্যবিবাহকে বেশী অকালমৃত্যুর কারণ বলাটা একেবারেই প্রমাণ-বিবর্জ্জিত ও অযুক্তিসঙ্গত কি না। বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের ফলে তো বাল্যবিবাহকে বেশী অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু বা স্ত্রীমৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। এইবারে অন্য কি যুক্তি বলে বাল্য-বিবাহকে অকালমৃত্যুর কারণ ও স্বাস্থ্যহানিকর বলা হয়, তাহা দেখা যাউক। শারীর বিজ্ঞান হইতে পাওয়া যায় যে, ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের আয়তন বৃদ্ধি হয়। যদি ইহার ভিতর সন্তানোৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে অপরিণত অবস্থায় হইল বলা যাইতে পারে। যদি অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে মাতার ও পিতার সন্তানোৎপাদনে যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা তাহাদের পুষ্টির দিকে যাইতে পারিত। অপরিণত অবস্থার মাতা পিতার সন্তানদের পূর্ণ বলশালী হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। এই তর্ক ছাড়া যে শারীর বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে অন্য কোন যুক্তি পাওয়া যায়, তাহা আমার জানা নাই। অনেক বড় বড় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমি কোন সদুত্তর পাই নাই। এখন এই যুক্তির সারবত্তা কতদূর, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, এই তর্ক ন্যায় শাস্ত্রোক্ত a priori তর্ক। সুতরাং তাহাকে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত বলা যায় না। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। পর্য্যবেক্ষণের ফল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এসব স্থলে সাদৃশ্য ন্যায়ের সাহায্য লইতে হয়। তাহাও পরে দেখিব। এস্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যখন হইতে সন্তানোৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির ব্যবহার প্রকাশ পায়, বা শক্তি ক্ষয় করিবার ইচ্ছা প্রকৃতি হইতেই হয়। অনেক স্থলে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথে সেই শক্তির ব্যবহার প্রকাশ বা ক্ষয় না হইলে, সেই শক্তির অনেক রকম অবরোধ এবং অধিক হানিকর উপায়ে ক্ষয় হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলেই সে শক্তি সঞ্চিত হয় না। যদি শক্তি সঞ্চিতই না হয়, তাহা হইলে, বাল্যবিবাহ-বিরোধীদের এই যুক্তির সারবত্তা আছে এ কথা তর্কস্থলে মানিয়া লইলেও, ফলতঃ কোন মূল্য নাই। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, যে স্থলে প্রকৃতিই কোন শক্তির ব্যয় বা ক্ষয় করিবার ইচ্ছা দিয়া সেই শক্তি ক্ষয় করান, সেখানে সেই সঙ্গেই সেই শক্তির পূরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা প্রকৃতিই করিয়া দেন। যেমন নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে শক্তির ক্ষয় হয়—নড়িবার চড়িবার ইচ্ছা প্রকৃতি হইতেই হয়, তাই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে এই নড়া-চড়ার দরুণই শক্তির আবার সঞ্চয় হয়। এস্থলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সন্তান প্রসবের পর অধিক স্থলেই প্রসূতির এই প্রসবের নিমিত্ত যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা প্রকৃতি শীঘ্রই পূরণ করিয়া দেন। এ কথাটা স্মরণ করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে শক্তির ক্ষয় হইলেই, শক্তির ক্ষয় হওয়াটা যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, এ কথাটা বলা চলে না। বাল্যবিবাহ-বিরোধীদের এই তর্কে একটা কথা প্রথমেই স্বীকার লওয়া হইতেছে যে, যদি সন্তানোৎপাদিকা শক্তি প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে ব্যয়িত না হইত, তাহা হইলে শরীর গঠনে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এ কথাটা পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে এবং growthএর সহিত সন্তানোৎপাদিকা শক্তির কিরূপ সম্পর্ক, তাহা অবধারিত না হইলে কথাটা স্বীকার করা চলে না। জগৎ-বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ জার্ম্মাণ পণ্ডিত Dr. Weismann বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, যে সকল জীবকোষ (cells) শরীর গঠন ও তাহার পুষ্টিসাধন করে (somatic cells) আর যে জীবকোষ সন্তানোৎপাদন করে (reproductive cells) তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার এই মত বেশীর ভাগ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মানিয়া লইয়াছেন। যদি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তো সন্তানোৎপাদিকা কোষের ব্যয়ে শরীর গঠনের ও পুষ্টির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অপকার হইতে পারে না। ব্যয়ের ও অপব্যয়ের প্রভেদটা স্মরণ রাখিতে হইবে। নপুংসকেরা যাহাদের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় একেবারেই হয় না, তাহারা তো সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী ও কর্ম্মক্ষম নয়। সুতরাং বাল্য-বিবাহ-বিরোধীদের এই তর্ক অস্বীকার করিয়া না লইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এখন দেখিলাম যে, পর্য্যবেক্ষণের ফলেও বাল্যবিবাহ যে শরীরের পক্ষে হানিকর, তাহা সপ্রমাণ হইল না; এবং ন্যায়শাস্ত্রোক্ত যুক্তি-বলেও হইল না। এখন দেখা যাউক, সাদৃশ্যন্যায়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। এইরূপ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য ন্যায়ের (analogy) সাহায্য লইতে হয় এবং বাল্যবিবাহ-বিরোধীরাও তাহার সাহায্য লইয়াছেন। নির্ম্মলবাবু, সত্যশরণ সিংহ মহাশয়ের তর্ক হইতে তুলিয়া লিখিয়াছেন, "কাঁচা বেগুনের বীজে গাছ পুঁতিলে গাছ বড় হলে কুঁকড়ে যায়। তাহাতে ফল ধরে না। নারিকেল তাল প্রভৃতি গাছের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না। গরু ঘোড়া প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানাগুলি হয় মরে যায়, না হয় চিরকাল রুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে।" এখন এই সাদৃশ্য ন্যায়ের তর্কটা একবার

পরীক্ষা করা যাউক। কাঁচা বেগুনের বীজের analogyটা সম্পূর্ণ—অপ্রাসঙ্গিক; কারণ, মানুষের সহিত বেগুণ-গাছের সাদৃশ্য analogy—বেগুনের সহিত নয়। বেগুনের সহিত ভ্রূণের analagy (সাদৃশ্য)। অপরিণত ভ্রূণের সন্তান যেমন বলিষ্ঠ হয় না—কাঁচা বেগুনের বীজের সন্তানেরা (অর্থাৎ গাছেরা) তেমনই জোরবান হয় না। "নারিকেল তাল প্রভৃতির প্রথম বৎসরের ফুলেও ফল ধরে না।" এ কথাটাও অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, ফুলের সহিত স্ত্রীলোকদের ঋতুর analogy—তাই প্রথম ঋতুকালে যে উৎসব হয়, তাহাকে পুষ্পোৎসব বলে। যেমন—কি বড় কি ছোট গাছেদের অনেক পুষ্প হয়, তাহার মধ্যে অল্পই পুষ্পে ফল ধরে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও প্রতি ঋতুতেই গর্ভ হয় না। সুতরাং তাঁহাদের এই তর্কের কোন সারবত্তা নাই! গরু ঘোড়া কুকুরদের যে প্রথম বেয়ানের ছানারা বাঁচে না,—সব মরিয়া যায়, এ কথাটা এই প্রথম শুনিলাম। আমি তো অনেক প্রথম বিয়ানের ছানাদের সহজ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সত্যবাবু কি প্রমাণের বলে এই কথাটা বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং কথাটা প্রমাণাভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এখন দেখা গেল যে, বাল্য-বিবাহ-বিরোধীরা সাদৃশ্যন্যায়ের দ্বারা কোন প্রমাণই দিতে পারিলেন না। বরং দেখি—শরীর আয়তন পূর্ণ হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই গাছেরা ফুল ও ফল প্রসব করে। নব্যতন্ত্রীদের মতে শরীরায়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অপেক্ষা করে না। যখনই গাছের ফুল ধরে, তখন হইতেই মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গেরা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইয়া গাছেদের প্রজনন-ক্রিয়া ও গর্ভনিষেক করে। তাহাদের বাধা দিবার কেহ নাই। জন্তুদেরও মধ্যে দেখিতে পাই—শরীরায়তন পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতে সন্তানোৎপাদন করে। স্তন পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গর্ভ হয়। আমরা দেখি যে, স্ত্রীলোকেরা যত দিন ঋতুমতী হয়, ততদিনই কেবল তাহাদের গর্ভ হয়। ঋতু বন্ধ হইলেই তাহাদের গর্ভধারণ করিবার আর ক্ষমতা থাকে না; ঋতু আরম্ভ হইলেই তাহাদের গর্ভ হইবার শক্তি আসে। প্রথম রজোদর্শন আর শরীর সম্পূর্ণ হওয়া, এই দুই সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের অন্য কোন শারীরিক চিহ্নের বিকাশ হয় না—যাহা দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, এখনই প্রকৃতি প্রদর্শিত গর্ভোৎপাদনের প্রকৃষ্ট সময় আসিয়াছে।

অতএব প্রকৃতি-প্রদর্শিত চিহ্ন দেখিয়া বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, প্রথম ঋতুকাল হইতেই স্ত্রীলোকেরা গর্ভোপযোগী হইয়াছে। আর প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে গেলে বলিতে হইবে, শরীর আয়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। গাছপালা হইতে দেখিতে পাই যে, তাহারা শরীর আয়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না। জন্তুদের হইতেও দেখিতে পাই যে, যখনই স্ত্রী-জন্তুরা প্রথম ঋতুমতী হয়, তখন হইতেই পুং জন্তুরা তাহাদের অনুবর্ত্তন করে ও তাহাদের গর্ভ-নিষেক করে। তাহাদের বাধা দিবার কেহ নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, প্রকৃতি দেখাইয়া দিতেছে যে, প্রথম ঋতুর আবির্ভাব হইতেই গর্ভ-নিষেকের সময় আসিয়াছে। শরীরের পূর্ণ আয়তন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার কথা সাদৃশ্যন্যায় analogy হইতে পাওয়া যায় না; বরং তদ্বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিশারদেরা তো প্রকৃতির কার্য্য যতই দেখেন, ততই তাহার উৎকর্ষে বিস্ময়ান্বিত হন; তাই তাঁহারা তাহার উপর কলম চালাইতে নারাজ। সুতরাং জীবতত্ত্বের দোহাই দিয়া শরীর আয়তন পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত নয় বলাটা একেবারেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিরোধী কথা।

অনেকে বলেন যে, আমরা বিজ্ঞান-শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রকৃতির উপর উৎকর্ষ আনিতে পারি; এবং শরীরায়তন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিয়া সেই উৎকর্ষ আনা সম্ভব। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা কোন ক্ষেত্রে এরূপ উৎকর্ষ আনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতির কার্য্য বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং অনেক Experiment করিয়া এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন। এ স্থলে যেরূপ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও Experiment এর সম্পূর্ণ অভাব, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং এটা সেরূপ সিদ্ধান্ত নয়। এ স্থলে আর এক কথা আছে। আমরা যে প্রকৃতির উপর উন্নতিবিধান করিতে পারিয়াছি, তাহা কিরূপ, তাহা একবার অনুধাবন করা হউক। আমি যতদূর জানি, তাহাতে মানুষের চেষ্টায় নিম্নলিখিত প্রকার উন্নতি আনিতে পারা গিয়াছে। যথা:—ছোট বীচি কিংবা বীচিবিহীন ফল, কাঁটাবিহীন গাছ, বড় আয়তনের ফল ও জন্তু—বেশী দ্রুতগামী অশ্ব কিম্বা দুগ্ধবতী গরু। এ সকলই আমাদের পক্ষে বেশী উপযোগী এবং আমাদের পক্ষে বেশী উপযোগিতাকেই আমরা তাহাদিগের উৎকর্ষ বা উন্নতিবিধান বলি। এই সকল বৃক্ষ বা জন্তুরা প্রকৃতির নিয়মানুসরণ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে থাকিলে, তাহারা যে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং তাহারা যে পরের বেশী যত্ন না পাইলে মরিয়া যায়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাহাদের survival ক্ষমতা কম। সুতরাং এই সকল বৃক্ষদের বা জন্তুদের নিজের পক্ষে সেই তথাকথিত উন্নতি বা উৎকর্ষ বাস্তবিক অবনতি বা অপকর্ষ। এই তথাকথিত উৎকর্ষ দেখিয়া যে আমরা মানুষদের পক্ষে প্রকৃতির উপর কোন উৎকর্ষ আনয়ন করিতে পারি, এই কথাটা এইরূপ ক্ষেত্রে বলাটা প্রগল্‌ভতা মাত্র।

আমরা দেখিলাম যে, বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমাদের প্রচলিত বিবাহ-প্রথাটাকে দোষাবহ বলা যায় না। সাদৃশ্য ন্যায় হইতে পাইলাম যে, স্ত্রীলোকদিগের প্রথম রজোদর্শনের সময় বিবাহটাই প্রকৃতি-প্রদর্শিত প্রশস্ত সময়। বাল্যবিবাহ-বিরোধীদের যুক্তির সারবত্তা কতখানি, তাহাও দেখাইলাম। এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশের এই মৃত্যুর সংখ্যার হারের আতিশয্যের অন্য কোন কারণ আছে কি না।

কলিকাতার স্বাস্থ্য প্রদর্শক Dr. Pearse সাহেব ১৯০১ সালে দেখিয়াছেন, যে, যত শিশু প্রথম বৎসরেই মরে, তাহার অর্দ্ধেক জন্মের এক মাসের ভিতরেই মরে। এইরূপ এক মাসের ভিতর

২৭০০ মৃত শিশুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি পাইলেন যে, তাহার মধ্যে ১০০০ শিশুর মৃত্যু প্রসব-ঘরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও প্রসব করণের অস্বাস্থ্যকর প্রকরণের জন্যই হইয়াছিল। কলিকাতায় যদি অবস্থা এইরূপ হয়, তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ে তাহার বেশী হওয়াই সম্ভব। সমান ধরিয়া লইলেও এইখানেই শতকরা ৩৭ (২৭০০ : ১০০০) শিশু-মৃত্যুর হার কমিয়া গেল।

আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কিরূপ ভীষণ ও তাহাতে কিরূপ মৃত্যুর হার বাড়ে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুপেয় জলের অভাবে কতরূপ উৎকট ব্যায়রাম হয়, তাহাও সকলের জানা আছে। গরীব হইলে যে সময়ে চিকিৎসার অভাব হয় ও সুপথ্য দিবারও ক্ষমতা থাকে না এবং তাহাতেও যে মৃত্যুর হার অনেক বাড়িবে, তাহাও সহজে অনুমেয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বিলাতে গরীবদের ভিতর মৃত্যুর হার অবস্থাপন্ন লোকদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষা কত বেশী তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। Rev. Usher তাহার Neo-malthusiasm পুস্তকের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যেখানে ভদ্র-লোকদিগের ১০০ ছেলেদের ভিতর ৮টি মরে, গরীবদের সেখানে ৩০জন মরে। আবার দেখুন—ভদ্রলোকদিগের (gentry) সমষ্টি পরমায়ু যেখানে ৪৫, সেখানে দোকানদারদিগের পরমায়ু ২৯, শারীরিক পরিশ্রমীদের ২৭ ; কোথাও কোথাও ১৬ পর্য্যন্ত নামিয়াছে (Bethnal green)। তাহা হইলে দেখা গেল, গরীব হইলে মৃত্যুর হার কত বাড়ে। সুতরাং আমাদের দেশে যেখানে অনেক লোকের পক্ষে একাহারই জোটে না, সেখানে যে মৃত্যুর হার অনেক বাড়িবে, তাহার যথেষ্ট অন্য কারণ আছে। তাহাকে আর উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের সময় হইতে প্রচলিত বাল্যবিবাহের ঘাড়ে চাপাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতের গৌরবের সময়ে বাল্যবিবাহ প্রথাটা প্রচলিত ছিল না। এই কথাটার অনেকবার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাল্যবিবাহ প্রথাটা প্রচলিত হইয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। সুতরাং ইহা বন্ধ করাটা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এ কথাটার কিরূপ প্রমাণ আছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

আমি বেদের সময়ের আমাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় কিছুই জানি না ; এবং যাঁহারা বেদের সময়ের কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে বেশী কিছু জানেন এবং তাঁহাদের কথা আমাদের অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত, তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, বেদ খুব কম লোকেই ভাল করিয়া পড়িয়াছেন। বেদ এরূপ দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন ভাষায় লিখিত যে, তাহার ব্যাখ্যাতে পণ্ডিতদের ভিতর আকাশ-পাতাল মতভেদ। বেদের সময়টাও অতি দীর্ঘব্যাপী। তাহার কোন্ সময়ে আমরা জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলাম, এবং সে সময়ে আমাদের সামাজিক অবস্থা ও প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা পাকাপাকিভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। তাই বেদের সময়ের কথাটা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষ যে উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতের সময়ে শৌর্য-বীর্য্য জ্ঞান-গরিমায় গৌরবান্বিত ছিল, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। সে সময়ে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণ উপনিষদের সময়ে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না, তাহার প্রমাণ কেহ যে দেখাইয়াছেন, তাহা তো জানি না। মহাভারতে শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রা প্রভৃতির স্বয়ম্বরের কথা দেখিতে পাই—এবং ইঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই, আমাদের মহাভারতের সময়ে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এ কথাটা বলা হয়। এখন দেখি যে, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় রাজকন্যা, অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী। দ্রৌপদী তো যজ্ঞাগ্নি হইতে একেবারে যৌবন অবস্থায় উত্থিত হইলেন ও তাহার অনতিবিলম্বেই তাহার স্বয়ম্বর সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্তা কন্যা,—কণ্ব ঋষির দ্বারা বনাশ্রমে পালিতা। সুতরাং তাঁহার উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার সুবিধা হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। সুভদ্রা হরণ তাঁহার স্বয়ম্বর হইবার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। (আদিপর্ব্ব ২১১ অধ্যায়) মহাভারতের বনপর্ব্বে ২৯৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, সাবিত্রীকে যৌবনস্থা দেখিয়া, মহর্ষি নারদ রাজা অশ্বপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটী যৌবনস্থা হইয়াছে, তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না ?" সুতরাং দেখা যায় যে, যৌবনস্থা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত,—এবং ইহাই মহর্ষি নারদের মত হইতে সূচিত হইতেছে। দময়ন্তীর বেলায় মহাভারতের বনপর্ব্বের ৫৪ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বিদর্ভাধিপতি তনয়াকে যৌবন-সীমায় অবতীর্ণ দেখিয়া (চিন্তিত হইয়া) শীঘ্রই স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য ইহা নিশ্চয় করিলেন। ইহা হইতে দেখা গেল যে, কন্যা যৌবন সীমায় আসিলেই তাহার স্বয়ম্বর হইত। মনুতেই পাই যে, প্রথম ঋতুকালে তিন বৎসরের মধ্যে যদি কন্যার অভিভাবকেরা তাহার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে সেই কন্যা নিজে বর ঠিক করিতে পাবেন। এখন, এই যৌবনসীমা বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা দেখা যাউক। এক মতে—কন্যাদের যৌবন আরম্ভ হয় ১৬ বৎসরে। দ্বিতীয় মতে—দৃষ্টার্ত্তবা হইলে তাহাকে যুবতী বলে (রাজবল্লভ)

দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিৎ
চলাক্ষং মেদুরস্মিতং।
মনাগভিষ্ফুরদ্ভাবং
নবযৌবনমুচ্যতে ॥

নবযৌবনের লক্ষণ উজ্জ্বল নীলমণিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। অতএব এই সকল ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর যে ১২ হইতে ১৬ বৎসরের ভিতর হইত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে যে হইত, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ব্রাহ্মণেরা চিরকালই আমাদের সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ও শিক্ষক। তাঁহাদের ভিতর দেবযানীর কথা ছাড়া অন্য একটা উদাহরণও লইলাম না। দেবযানি অসুরদের ভিতর বাস করিয়াছিলেন, ও তাঁহার আখ্যানে এত অলৌকিক কথা আছে যে, তাহা আদর্শ বলিয়া লওয়া চলে না। এই মহাভারতেই দেখি, যে অর্জ্জুনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যুর ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল ; এবং তাহার পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী উত্তরার গর্ভ হইয়াছিল। (আদিকাণ্ড ৬৭ অধ্যায়, দ্রোণপর্ব্ব ৩৩, ৩৫, ৪৯ ও ৭২ অধ্যায়) সেই গর্ভের সন্তানই পরীক্ষিত। তিনি অল্প বয়সে মরেন নাই। এখন দেখুন, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির ও গীতা-প্রণেতা পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই ষোল বৎসরের পূর্ব্বে যখন অভিমন্যুর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী, তাহা নিঃসন্দেহ। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় দশম কাণ্ড প্রথম শ্লোকে পাই যে চাক্রায়ন ঋষি তাঁহার স্ত্রীর (যাঁহার স্তনোদ্গম হয় নাই) সহিত ইভ্যগ্রামে অতি কষ্টে বাস করিতেন। রামায়ণে দেখি যে, রামচন্দ্রের ১৫ বৎসর বয়সে ও সীতার ৬, ৭ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের বিবাহ সীতার ভগিনীদের সহিত সেই সময়ে হইয়াছিল। এই বিবাহে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিরা এবং অযোধ্যা ও মিথিলার অমাত্যবর্গ ও সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনে এই সকলে বিবাহ, কার্য্য সম্পূর্ণ হয় (আদিকাণ্ড ১৬ ও ২০ সর্গ ও আরণ্য কাণ্ড ৪৭ সর্গ) যদি বাল্যবিবাহ কেহ দোষাবহ বিবেচনা করিত, বা ইহা নূতন প্রথা হইত, তাহা হইলে কেহ না কেহ এই বিবাহে আপত্তি করিত। তাহা তা কেহই করে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, তৎকালে ও তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। এখন দেখুন—আমাদের কাহার কথা বিশ্বাস করা উচিত। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, আদর্শ জ্ঞানী রাজর্ষি জনক, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বহু ঋষিদের কথা শুনিব ? না জনকতক ক্ষত্রিয় রাজদের অসাধারণ রূপবতী কন্যাদের স্বয়ম্বর দেখিয়া ইংরাজি পণ্ডিতদের ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী একালের দুই একজন এদেশী পণ্ডিতদের কথা শুনিয়া—আমাদের গৌরবের দিনে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না, এই কথা মানিয়া লইব ?

এই মহাভারতেই দেখিলাম যে, বাল্যবিবাহিত অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ অল্প বয়সে রুগ্ন শরীরে মরেন নাই। রামায়ণের সময়ে অকাল-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাহার প্রমাণ এই যে, একটী অকাল-মৃত্যু দেখিয়া রামচন্দ্র, শূদ্রকের তপস্যা তাহার কারণ বলিয়া স্থির করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন। একালেও আমরা বহু অল্প-বয়সের পিতামাতার বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী সন্তান দেখিয়াছি। বিখ্যাত লেখক বিপুল দেহধারী ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার পিতার ১৬ বৎসরের সন্তান। আমার কন্যা তের বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রথম সন্তান প্রসব করে। তাহার ১১মাস পরে দ্বিতীয় পুত্র হয়। তাহার দেড় বৎসর পরে তৃতীয় পুত্র হয়। তৎপরের সন্তান ১ বৎসর তিন মাস পরে

হয়। এইরূপে তের বৎসরের ভিতর ১০টি সন্তান হয়। আমার সেই কন্যার স্বাস্থ্য—সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়েদের যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহার অপেক্ষা কোন অংশে ভাল ছিল না। তাহার প্রথম পুত্র বেশ জোরবান ছিল ; সে দেড় বৎসর বয়সে জলে ডুবে মরে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সন্তান বেশ বলিষ্ঠ এবং জীবিত আছে। বাল্যবিবাহের সন্তানেরা যদি রুগ্ন হইত, তা হইলে এই সকল সন্তান ওরূপ বলিষ্ঠ হইতে পারিত না। তুর্কীস্থানবাসীদের ভিতর বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। (এখন আছে কি না তা জানি না)। রুসিয়াতে চাষাদিগের ভিতর অনেকের ৮, ৯ বৎসরে বিবাহ হইত (Vide Latourneau's Evolution of Marriage, Ch. VII. P. 48)। চীনদেশে অল্প বয়সে বিবাহ হয়। ১৮ বৎসরের বালক-দিগের তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা বিবাহ দেন। ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি Lord Wolseley প্রথম চীন যুদ্ধে ছিলেন। তাঁহার মতে—উত্তর চীনেদের মতন সাহসী দুর্দ্ধর্ষ বীর্য্যশালী সেনা তিনি পৃথিবীর কোথাও দেখেন নাই ও দক্ষিণ চীনেদের মতন কষ্টসহিষ্ণু ক্ষিপ্রকারী নৌবিদ্যায় পারদর্শী নাবিক সৈন্যও কোথাও নাই। আবিসিনিয়া-বাসীদের ও নিউজিল্যাণ্ডের মাউরিদিগের ভিতরও বাল্যবিবাহ প্রচলিত। তাহারা শারীরিক বলশালী—ইয়োরোপবাসীদের অপেক্ষা কোন অংশেহীন নহে। তুর্কীস্থানদের বীরত্ব ইয়োরোপ হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রুষিয়ার শারীরিক বলশালিত্বের কথা কাহাকে বলিতে হইবে না। যে সকল জাপানী রুষকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল ও যাহাদের বীরত্বে ইয়োরোপ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা আমাদেরই মত বাল্যবিবাহিত ও যৌথ-পরিবারে-প্রতিপালিত পিতামাতার সন্তান। এখানে ১৮৯৮ সালে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়—তাহার পূর্ব্বে ১১, ১২, ১৩ বৎসরে কন্যাদের বিবাহ হইত ও ১৭, ১৮তে বালকদিগের বিবাহ হইত। এই সকল দেখিয়া, বাল্যবিবাহ অস্বাস্থ্যকর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে যক্ষ্মাকাশের প্রকোপ দেখি নাই। বাল্যবিবাহ যত কমিতেছে, যক্ষ্মার প্রকোপ ততই বাড়িতেছে। Venereal diseasesএর প্রকোপও যথেষ্ট বাড়িতেছে। বাল্যবিবাহ কমিয়া যাওয়ার ফলে এরূপ হইতেছে বলাটা বোধ হয় বাল্যবিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ বলাটা অপেক্ষা অধিক সঙ্গত। বাল্যবিবাহের স্বাস্থ্যহানিকর কথাটা তুলিয়াছে ইংরাজেরা। তাহাদের দেশে এ প্রথা প্রচলিত নাই। আমাদিগকে তাহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। নিজেদের দেশের প্রথার সহিত অন্য দেশের প্রথা বিভিন্ন হইলে, বিশেষতঃ তাহারা যদি নিজেদের অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন প্রথাকে দোষাবহ অনেকে সহজেই মনে করে। এ স্থলেও সেইরূপই হইয়াছিল। তাহার উপর ইংরাজেরা আমাদের দেশের রাজা। এদেশ এত গরীব যে, অনেক লোক এক বেলার বেশী খাইতে পায় না। এদেশে অসাধারণ মৃত্যুর হার তাহাদের শাসনের দোষ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে। সুতরাং এদেশের গরীবত্ব ও অধিক মৃত্যু আমাদের বাল্যবিবাহ ও যৌথ

পরিবারের ফলে হইয়াছে বলিয়া আমাদের ঘাড়ে চালাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা দোষ হইতে অব্যাহতি পান। এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে; এবং তাঁহাদের মুখে শুনিয়া, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া, এ কথাটা স্বীকার করা—আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা আমাদের মনের উপর যে প্রভাব করিয়াছে তাহারই ফলে কি না, এ কথাটা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C.I.E,

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

বাংলা ১৩১৭ সালে বাঙালীর Carlyle কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরলোক-গমনে বাংলা সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আজও পূরণ হয় নাই, হইবে কি না কে জানে? প্রতি যুগেই প্রতিভার আবির্ভাব সম্ভব নহে—বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে।

কালীপ্রসন্নের ভাষার ভঙ্গী ও তাঁহার সংস্কৃতপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার সময়ে ইংরাজী পদ্য-সাহিত্যের বন্যা বাংলাকে মাতাইয়া তুলিতেছিল; কিন্তু গদ্যসাহিত্যের প্রভাব বেশী দূর বিস্তৃত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রুচির এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল; বাঙালীর হৃদয়-বীণায় নূতন তার সংযুক্ত হইল—তাহা নব নব সুরে বাজিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কঠিন সংস্কৃত সাহিত্য ও তথানুগত বাংলা সাহিত্য কিছু সরল হওয়ায়, দেশের লোক নূতন বাংলা সাহিত্য খুঁজিতে লাগিল। ঈশ্বরগুপ্ত, রাজকৃষ্ণ ও পরবর্ত্তী যুগে দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন ও রবীন্দ্র নব নব রাগিণী শুনাইলেন, বাংলার বিপিনে নব বাঁশরীর স্বরলহরীর সহিত অনাদৃতা বঙ্গভাষার নূপুরশিঞ্জন এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল;—পুরাতন পলাইল, নূতন আবেশে, নূতন ছন্দে, নূতন গানে বাংলার আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল।

এই নব উচ্ছ্বাসময় কাব্য-সাহিত্যের যুগে গদ্য লেখার প্রচেষ্টায় বঙ্কিম, রমেশ ও কালীপ্রসন্ন ব্যতীত কেহ তেমন যশস্বী হন নাই। বঙ্কিম সংস্কৃতের সহিত কতকটা যুদ্ধ ঘোষণা ও কালীপ্রসন্ন সংস্কৃতের সহিত সন্ধি করিয়া নূতন কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শব্দ-যোজনায় কালীপ্রসন্নের যে বিশেষত্ব ছিল, তাহা কতকটা Johnsonএর মত। গালভরা ও কাণভরা শব্দ চয়ন করিতে তিনি অদ্বিতীয়। নিজে কত নূতন শব্দের যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বাংলা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'বিবাহ কত প্রকার' নামক প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি নূতন কথার প্রচার করিয়াছেন, যথা—"মৃগয়িক, সলিলিক, তাণ্ডুলিক ইত্যাদি (বিবাহের নাম)। কত ইংরাজী শব্দের নূতন নূতন অনুবাদ দিয়াছেন, যথা, Library=গ্রন্থাবলী, Bigoted=নির্ব্বন্ধশীল, Anecdote=ইতিকথা, Patriotic=পিত্র্যাভিমানী ইত্যাদি। কত সাধারণ ভুল (Common errors) ধরিয়া দিয়াছেন, যথা—

Incorrect	Correct
নিভিয়া	নিবিয়া
বিদেশীয়	বিদেশী
বেশী	বেশি
একত্রিত	একস্থ ইত্যাদি।

সকল সময়ে তিনি যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহা নহে; এমন কি অনেক সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ শব্দও চালাইয়াছেন, যথা—"জ্বালাতনকারিণী, মধুমাখা, ইত্যাদি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জমকালো ও শ্রুতিসুখকর শব্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি প্রায়ই "মানুষ" না লিখিয়া "মনুষ্য" লিখিতেন; স্থান-বিশেষে, বিশেষতঃ কাব্যে ও লঘুসাহিত্যে "মানুষ" কথাটী ভাল শোনায়—যথা, "মানুষ আমরা নহি ত মেষ," "আবার তোরা মানুষ হ" ইত্যাদি। কিন্তু যে সব স্থানে কালীপ্রসন্ন "মনুষ্য" কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে ঐ কথাটীই সুখশ্রাব্য হইয়াছে। তাঁহার একটা বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় অধিক প্রভেদ ছিল না; তিনি হাসিতে হাসিতে গম্ভীর হইয়া যাইতেন, রহস্য করিতে আরম্ভ করিয়া তথ্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইতেন। বিবাহ লইয়া রহস্য করিতে করিতে তিনি বলিয়াছেন, 'বিবাহের শেষ পরিণতি কিসে? ব্যাকরণের উত্তর সংবাহে অর্থাৎ পাদমর্দ্দনে'। তার পরেই তিনি 'বিবাহ কত প্রকার', এই তথ্য নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইয়াছেন।

তিনি তরল লঘুসাহিত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার হাস্যের উৎস শুষ্ক ছিল, এ কথা কেহ যেন মনে না করেন। তাঁহার 'ভ্রান্তিবিলাস' ও 'প্রমোদলহরী'তে তিনি হাস্যস্রোত বহাইয়াছেন; 'চোরচরিত' ও 'চাটুকার' প্রবন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার এক দিক দেখিতে পাই।

"When flatterers meet, the devil goes to dinner"—এইটী তাঁহার প্রিয় Quotation ছিল; তিনি চাটুকারকুলের উপর এত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, যে, তাঁহার এই প্রবন্ধের তীব্রতায় অনেক বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

'প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা' প্রবন্ধে তিনি Honourable friend (মাননীয় বন্ধু) এই সনাতন Legislative ভাষায় দুইটী মামুলী কথার যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পরম উপভোগ্য।

"দেবতার বাহন" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মার বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, ভোলানাথের বাহন বৃষভ, নারদের বাহন ঢেঁকি, কুবেরের বাহন পুষ্পরথ, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ও গণেশের বাহন ইঁদুর কেন হইল, তাহার 'অতি গূঢ় তাৎপর্য্য' তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন; শেষোক্ত ঠাকুর ও তাঁহার বাহন (অর্থাৎ গণেশ ও ইঁদুরের) বিষয়ে লিখিয়াছেন "গণেশ গণপতি এবং গণপতি বলিয়াই সিদ্ধিদাতা। সুতরাং ইঁদুর

তাঁহার উপযুক্ত সহচর। কোথায় কোন্ গণপতি, ইঁদুরের দাঁতে পথ না খুলিয়া, নৈতিক সম্পদময় গন্তব্য স্বর্গের সোপানমালায় পদার্পণ করিতে পারিয়াছেন? এই জন্যই আগে ইঁদুর তার পর সিদ্ধিদাতা। এই জন্যই যাহারা মনুষ্যের মধ্যে মূষিক-জাতীয়—আকৃতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে মূষিক, যাহাদিগকে দেখিলেই চক্ষু বিরক্ত হয়, যাহাদিগের ঘ্রাণ মাত্রেই শরীর ও মন ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে, তাহারা গণনায়কদিগের নিত্য পার্শ্বচর ও প্রীতিভাজন।"

'বাবু' কথাটীর উৎপত্তি—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে পরানুকরণে, প্রগল্‌ভতায়াং, ধৃষ্টব্যবহারে চ। ঔণাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, আকারের বৃদ্ধি।

অর্থ—যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান শূন্যগর্ভ অথচ গগনের সপ্তমণ্ডলস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত, চরিত্র প্রগল্‌ভ্য এবং ব্যবহার যার-পর-নাই ধৃষ্ট তাহারা বাবু।

'হাকিম' কথাটীর উৎপত্তি—হক হুঙ্কারে, তর্জ্জনে গর্জ্জনে, ভ্রূকুঞ্চনে লোকপীড়নে চ। ইমণ্ প্রত্যয়ঃ; ণকার ইৎ বলিয়া উপধা অকার স্থানে আকার। যেহেতু হকধাতু সকল অর্থেই ভয়াবহ ও পীড়াজনক, অতএব,—যাঁহার হুঙ্কার কি ঝঙ্কার নাই, তর্জ্জন, গর্জ্জন, দর্প কিম্বা দাম্ভিকতা নাই, এবং লোকপীড়নেও অকৃত্রিম অনুরাগ নাই, তিনি বিচারক বলিয়া আসন পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি হাকিম নহেন।

'স্ত্রী' শব্দটীর উৎপত্তি—'স্তু' যিনি জ্ঞানদাতা ও ইষ্টদেবতার ন্যায় সতত ভক্তিভাবে পূজনীয়া; স্তৈ, যিনি একটু বেশী শব্দ করিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহার জিহ্বা আর সকলের জিহ্বা হইতে একটু বেশী চলে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রহস্য করিতে গিয়া তিনি গবেষণার পথে প্রবেশ করেন। এই জন্য রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের কাব্য-সাহিত্যের হাস্যরসের সহিত তাঁহার গদ্যসাহিত্যের হাস্যরসের তুলনা করা উচিত হইবে না।

তাঁহার বিপুল চিন্তাশক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের নাগপাশে বদ্ধ, ও তাঁহার গবেষণার প্রচেষ্টা অত উগ্র না হইলে, তাঁহার নিকট হইতে আমরা শারদ জ্যোৎস্নার ঝরণাধারার মত অনাবিল হাস্যধারায় পরিপ্লুত হইতাম। তবু যাহা পাইয়াছি তাহা শ্লীল, সুন্দর ও পরম উপভোগ্য। বিপুল পাণ্ডিত্য, অগাধ অধ্যয়ন, ও গভীর চিন্তাশক্তির সাহায্যে বাংলার গদ্যসাহিত্যের জন্মবাসরে তিনি নূতনের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যে শব্দসম্পদময়ী, স্বচ্ছন্দগামিনী ভাষার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাংলা গদ্যের medieval model স্বরূপ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। সমাসের শৃঙ্খল পরিয়া তাঁহার ভাষা পঙ্গু হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। দশ পনের বৎসর পূর্ব্বেও ভদ্রপরিবারের গৃহিণী ও বধূগণ, উৎসব ও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যথাসম্ভব গুরুভার স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত হইতেন; আর আজকালের নিয়মানুসারে সেই সকল গুরু অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিকে Pension দিয়া নূতন লঘু ও অতি সংক্ষিপ্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রসজ্জা উৎসব ও নিমন্ত্রণের মানরক্ষা করিতেছে।

ভাষা-সুন্দরীও সেইরূপ সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া, বহির্জগতের স্বভাব-সুষমায় মজিয়া পরম রমণীয় বিচিত্র ছন্দসজ্জায় সাজিয়াছে। রুচিভেদে সাহিত্যের প্রকার ও সজ্জাভেদ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানের মাপকাঠি দ্বারা ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা মাপিলে চলিবে কি?

তাঁহার কাব্যানুভূতির পরিচয় 'বান্ধবের' প্রবন্ধাবলীতে বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার ভাষাতেই বলি, "যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উত্তীর্ণ হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির স্থলদক্ষর-লেখা পাঠ করিতে থাকে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে, যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়া তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়, তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়—কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব।"

তাই তাঁহার রচনাও ভাবসমুদ্রের মধ্যে ভক্তির তরঙ্গ দেখিতে পাই। তাঁহার দৃঢ় ভগবৎপ্রেম তাঁহাকে সংসার আবর্ত্তের মধ্যে পথ দেখাইয়াছে। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই ছিল যে, "রক্তমাংসের স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেই বেশী, কিন্তু প্রীতি অথবা ভক্তির আকর্ষণজনিত মমতা মনুষ্যেরই বিশেষ সম্পত্তি।"—এইখানে মানুষ ও পশুর প্রভেদ, তিনি বিশেষভাবে এই পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"নদী যেমন সাগরের উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে, মনুষ্য-হৃদয়ের সজীবপ্রীতি ও সজীবভক্তিও সেই প্রকার, নিজ নিজ বিকাশের অনুরূপ ভাবসাগরে পঁহুছিবার জন্য, কোথাও কঙ্কর পথের ন্যায় ক্রূরতার বিঘ্ন, কোথাও বা কঠোরতম পর্ব্বতবর্ত্মের ন্যায় বিপদপরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়।" এই 'অতৃপ্ত তৃষ্ণা' যদি ভগবানের উদ্দেশে না চলিল তবে ইহা বিশ্বের কাম্যবস্তুর প্রতি ছুটিবে। তাই দেখিতে পাই গৃহত্যাগী বুদ্ধ শোকাহত অশ্বরক্ষক ছন্দককে বলিতেছেন—

"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব;
চঞ্চল চঞ্চলা মত রিক্তমুষ্টি সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপনসম, দুস্পৃশ্য সফল
সর্পমস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগ
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে?"

মহাকবি নবীনের প্রাণে, তিনি এক দিন জ্বলন্ত উৎসাহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। নবযুগের নব মহাভারত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস

রচনা করিবার জন্য নবীনচন্দ্র যখন পাগলের মত হইয়াছিলেন, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তাঁহার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে 'আকুল' করিয়া তুলিয়াছিল, তখন কালীপ্রসন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র দ্বারা তাঁহাকে শুভ কার্য্যে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিগলিত স্বদেশপ্রেমে, দুর্নিবার দেশভক্তিতে ও অপূর্ব্ব ছন্দোলীলায় মুগ্ধ হইয়া, কালীপ্রসন্ন 'বান্ধবে' যে প্রাণস্পর্শী সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাষার ঝঙ্কারে, বর্ণনার পক্ষপাতশূন্য বিচারে সমালোচনা-সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের ছাত্রদিগকে সমালোচনা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। বোধ হয় এ বিষয়ে তাহারা সম্যক্ পরিপক্ক। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় 'সমালোচনা'রূপ একটা পঠিতব্য বিষয় পাওয়া যায়;—দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন ও ললিতকুমার প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী ব্যতীত প্রকৃত সমালোচকের পরিচয় পাই না।

কালীপ্রসন্নের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় পাই 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' নামক পুস্তকে। তিনি ইহাকে 'কাব্য-ইতিহাসবিজ্ঞান' নামেও পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইতে চান যে, জানকী চরিত্রের শুদ্ধি জনসমক্ষে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যথার্থই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তথা হইতে অদগ্ধ অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। অগ্নি হইতে অদগ্ধ অবস্থায় বাহির হওয়া যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে, তাহা তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতে চান যে, এই বিষম অগ্নি-পরীক্ষার সময়, দশরথের প্রেতাত্মা যে দেহীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাও বিজ্ঞানসম্মত। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও তাঁহার চেষ্টা এবং ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়।

তিনি যে বাগ্মী ছিলেন, এ বিষয়ে অনেকেই অবগত ছিলেন। কলিকাতায় ও ঢাকায় তিনি অনেক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'নর্ম্মরুক হলে' রামমোহন রায়ের স্মৃতিবাসরে তিনি বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিরাট ব্যবধান দূর করিয়া, রামমোহন দাঁড়াইয়া আছেন—"স্থিতিপৃথিব্যামিব মানদণ্ড"। এই কথাটি অনেকের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

১২৮৪ হইতে ১৩০৮ পর্য্যন্ত ভাওয়ালের রাজসরকারে chief manager পদে সমাসীন থাকিয়াও, তিনি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অবসরে ১২৮১ হইতে ১২৯৬ পর্য্যন্ত ও পরে ১৩০৮ হইতে কিছুকাল বিখ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকার পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম, 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন, দুই বাংলার দুই প্রধান পুরুষ। দুইজনেই গদ্যকবি, দুইজনেই পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের যুগ্ম বাসরে দেশের সাহিত্যিক জীবন ধন্য করিতে আসিয়াছিলেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার বিষয় কিছু বলা হইল না। তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভার নিকট প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্ভ্রমে মাথা নত করিবে।

সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িকতা

শ্রীবাণী দেবী

বর্ত্তমান যুগে মানবের জ্ঞানের সকল বিভাগেই জাগরণ দেখা দিয়াছে। সঙ্গীতবিভাগও যে তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জাগরণের পথে সঙ্গীত আমাদের আশানুরূপ দ্রুতগতিতে চলিতেছে না। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় এই যে, আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার অন্ধ পক্ষপাতী হইয়া আছি। তাহাদের মধ্যে কোন্‌টাই বা সত্য এবং কতটুকুই বা সত্য, অথবা কোন্‌টাই বা অসত্য এবং কতটুকুই বা অসত্য, তাহা বিচার করিতে আমরা বড় একটা অগ্রসর হই না। এ কথা মানি যে, সেই সকল ধারণা আমাদের মনে বহুকাল ধরিয়া বদ্ধমূল হওয়াতে তাহাদের প্রভাব অতিক্রম করা বহুল আয়াসসাধ্য, এবং সে আয়াস স্বীকার করিতেও অনেকে প্রস্তুত নন।

ভ্রান্ত ধারণাসমূহের মধ্যে একটী প্রধান ধারণা হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে ভৌগোলিক বিভাগ আছে। আমরা সঙ্গীতকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই দুই সুবৃহৎ বিভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের একটী স্থূল বিভাগরেখা কল্পনা করিয়া লই। সঙ্গীতের মধ্যে স্বরসম্বদ্ধ বা harmonised কোন কিছু দেখিলেই আমরা তাহা পাশ্চাত্য বিভাগে ফেলিয়া দিই, এবং প্রত্যক্ষভাবে রাগরাগিণীতে অবলম্বিত কোন কিছুই দেখিলেই তাহা প্রাচ্য বিভাগে ফেলিয়া দিই। আমাদের ধারণা এই যে প্রাচ্য অথবা তাহাদের মুখপাত্র ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদ বা harmony বলিয়া কোন কিছু ছিলও না এবং হওয়া সম্ভবও নহে—উহা পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরই নিজস্ব; স্বরভেদ বা melody-প্রধান * রাগরাগিণী কেবল ভারতীয় সঙ্গীতেরই নিজস্ব—উহা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ছিলও না, এবং হওয়া সম্ভবও নহে। এইরূপ ধারণার ফলে আমরা স্বভাবতই সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারের পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইয়া আছি। অপর দিকে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে এই প্রকার একটা অস্ফুট ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদেরও সঙ্গীতকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতে, যথাযথ স্বরবিন্যাসের দ্বারা মিষ্টতামণ্ডিত করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সুখের বিষয়, কি ভারতে, কি পাশ্চত্য জগতে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতার, এই প্রকার ভৌগোলিক বিভাগ ও পার্থক্যের কল্পনা অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইতেছে।

এই প্রকার ধারণায় কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, স্বরভেদ বা melody এবং স্বরসম্বাদ বা harmony সঙ্গীতের এপিঠ ওপিঠ—একই সঙ্গীতের বিভিন্ন ছাঁদে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিবার ভাঁজ বা প্রণালী মাত্র। একই মাধ্যাকর্ষণ যেরূপ স্থান ও অবস্থাবিশেষে কোথাও বা জলপ্রপাতে, আর কোথাও বা চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের আকর্ষণে প্রকটিত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশ-কাল-অবস্থার মাহাত্ম্যে কোথাও বা স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীতে, আর কোথাও বা স্বরসম্বাদের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের ক-খ যিনি জানেন, তিনিই বলিতে পারিবেন যে, এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞদিগের মতে এক একটী গান বা গৎ এক একটী বিশেষ রাগরাগিণীতে অবলম্বিত থাকে। সেই রাগরাগিণী অন্তর্নিবিষ্ট এক একটী বিশেষ স্বরবিন্যাসের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরভেদের সাহায্যে সেই স্বরবিন্যাসকে বিকশিত করিয়া তুলিলেই রাগরাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের আত্মা বা কেন্দ্রস্থিত ভাব, এবং স্বরবিন্যাস হইল রাগরাগিণীর শরীর বা আকার। চিত্রের সহিত সঙ্গীতের তুলনা করিলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। আমি যদি সন্তানবাৎসল্য আঁকিতে চাই, তবে সেই সন্তান-বাৎসল্য ভাবটীই হইল আমার চিত্রের আত্মা বা মূল কেন্দ্র। তার পর, আমি যখন যশোদার কোলে গোপালকে রাখিয়া সেই ভাবটীকে ব্যক্ত আকার প্রদান করিলাম, তখন সেইটী হইল ঐ চিত্রের শরীর বা আকার। পরিপার্শ্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবলমাত্র যশোদার কোলে গোপালের চিত্র আঁকিয়াই আমি বাৎসল্যভাবের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারি। প্রাচ্য চিত্রে এই প্রকার অপরিহার্য্য অংশগুলির ভিতর দিয়াই মূল মন্ত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। জয়পুরী, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন চিত্র পর্য্যালোচনা করিলেই আমার বক্তব্য সুবোধ্য হইবে। সেইরূপ যে রাগরাগিণী আমি প্রকাশ করিতে চাহিব, সেই রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত স্বরবিন্যাসকে তাহার স্ব-রূপে প্রকাশ করাইতে হইবে। এক একটী স্বরবিন্যাসের বিভিন্ন আকারে—উদারা, মুদারা, তারা এবং উহাদের সংমিশ্রণোদ্ভূত আকারে সমাবেশ, অথবা বিভিন্ন সম্বাদী স্বরবিন্যাসের সংযুক্ত সমাবেশ হইতেই এক একটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হয়;—অন্য ভাষায় বলা যায় যে, এক একটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উৎপত্তি হয়। শুদ্ধ হোক বা মিশ্র হোক, প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের যে সকল স্বরের দ্বারা কোন একটী রাগরাগিণীর রূপটী ফুটিয়া উঠে, ভারতীয় সঙ্গীতে প্রধানত সেই সকল স্বরের একাধিক স্বরকে ভিন্ন বা পৃথকভাবে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই সাহায্যে সেই রাগরাগিণীর রূপটী প্রকাশ করিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের বা স্বরগ্রামের অন্তর্নিবিষ্ট স্বরগুলির একাধিক সম্বাদী ও অনুবাদী স্বর বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে সমগ্র স্বরগ্রামের সহিত সম্বাদীভাবে এক সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইহাই হইল প্রধান প্রভেদ। ভারতীয় সঙ্গীতে এই কারণে রাগরাগিণী ও তাহারই পরিস্ফুটনে সহায় স্বরভেদ প্রভৃতির দিক এত প্রসার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে; এবং ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বহুলস্বর স্বরসম্বাদের দিক এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় সঙ্গীতও স্বরসম্বাদের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক-রহিত নহে; এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতও স্বরভেদের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্বন্ধ নহে।

ভারতীয় সঙ্গীতে যে স্বরসম্বাদ ছিল, এবং এখনও যে তাহার ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা আমি আমার "ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বরসম্বাদ" প্রবন্ধে (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৫ ফাল্গুন) সবিস্তার বলিয়াছি। ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে "বহুলস্বর" প্রভৃতি শব্দ এবং তৎসম্বন্ধীয় বর্ণনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্ত্তমানকালেও সামগান যে ভাবে গীত হয়, তাহাতেও স্বরসম্বাদের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। সেতারের তার বাঁধিবার প্রণালীর ভিতরেও স্বরসম্বাদের ছায়া সুস্পষ্ট। গৎ বাজাইবার সঙ্গে ঝঙ্কার দেওয়াকে স্বরসম্বাদের আদিম রূপ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ঝঙ্কারতারের যে প্রকার বন্দোবস্ত থাকে, তাহা দ্বারাই তো স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ঐ সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের সময়ে স্বরসম্বাদের প্রতি নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ইংরাজীতে যাহাকে part-singing বা অংশত-গীত বলা যায়, তাহার মূল ভাব হইতেছে, গানের একই অংশ একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন সুরে গান করা। আমাদের দেশে কীর্ত্তন, রামায়ণ-গান প্রভৃতিতে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কোল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে এইভাবে গান করা এখনও প্রচলিত আছে দেখা যায়। স্বরসম্বাদের ভাব অন্তরে জাগ্রত না থাকিলে এই প্রকার একই অংশ বিভিন্ন সুরে এক সঙ্গে গান করা অসম্ভব হইত।

প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদের প্রাধান্য থাকিলেও যেমন তাহাতে স্বরসম্বাদের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায় না, সেইরূপ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত স্বরভেদপ্রধান স্বরবিন্যাসের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে 'melody' প্রভৃতি স্বরভেদ-সূচক শব্দের অস্তিত্বই কল্পিত হইতে পারিত না; অথবা ঐ সকল শব্দের বিপরীতভাবসূচক 'harmony', 'chord' প্রভৃতি স্বরসম্বাদ-সূচক শব্দসমূহেরও আবির্ভাব দেখা যাইত না। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে communal spirit বা সংঘবদ্ধভাব কিছু বেশী মাত্রায় থাকাতেই উহাদের চিত্রেও যেমন পরিপার্শ্বের সহিত সম্বন্ধমূলক পরিপ্রেক্ষার (perspectiveএর) ভাব বেশী ফুটিয়া উঠে, উহাদের সঙ্গীতেও সেইরূপ বহুলস্বর স্বরসম্বাদের ভাবই সমধিক পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সংঘবন্ধনের ভিতরেও যেমন ব্যক্তিগত ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইতে পারে না, সেইরূপ স্বরসম্বাদের ভিতরেও স্বরভেদের একান্ত অভাব হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বীঠোবেনের 'বিষাদধ্বনি' (Sonata Pathetique), 'অন্ত্যেষ্টিযাত্রা'

* আমাদের সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বরটী ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়, পাশ্চত্য সঙ্গীতের ন্যায় একাধিক স্বরকে সম্বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হয় না, তাই আমাদের সঙ্গীতের প্রধান অংশকে 'স্বরভেদ' বা melody বলিলাম।

(Funeral March), গুণোর (Gounodর) 'নৈশগীতি' (Serenade), অথবা স্কটল্যাণ্ডবাসী হাইল্যাণ্ডারদিগের 'পুটবংশী' (bagpipe) বাদ্য প্রভৃতি শুনিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও রাগরাগিণী পরিচায়ক স্বরভেদ বা একস্বরত্বের অসদ্ভাব নাই।

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশ-কাল-অবস্থার বিভিন্নতার ফলে সঙ্গীতে কোথাও বা বহুলস্বর স্বরসম্বাদ (harmony), আর কোথাও বা একস্বর স্বরভেদ (melody) ফুটিয়া উঠিলেও, সকল দেশীয় ও সর্বজাতীয় সঙ্গীতেরই ভিতর হইতে একটা অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমিক ভাব উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। সঙ্গীতের মধ্যে ভৌগোলিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত একটা সার্বভৌমিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য হাইল্যাণ্ডারদিগের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় পার্বত্য জাতিসমূহের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই কারণেই স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডার বল, আর এদেশের পার্বত্য জাতিই বল, উভয় জাতিরই সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতার মনে একটা পার্বত্য ও আরণ্য ভাব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সঙ্গীতে এই তত্ত্ব আছে বলিয়াই কোথায় স্কটল্যাণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ, উভয় দেশের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশের সুবৃহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশের পার্বত্য জাতির সঙ্গীতে সম্বাদপ্রবণ একটা সবল ভাবের আশ্চর্য্য সমপ্রাণতা পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতে একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত সার্বভৌমিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই দক্ষিণ ইউরোপের সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই কারণেই ইউরোপের অন্তর্গত ইটালি প্রভৃতি দেশের সমতলবাসীই বল, আর ভারতের জাহ্নবীবিধৌত সমতলক্ষেত্রের অধিবাসীই বল, উভয়েরই সঙ্গীত শুনিলে শ্রোতার মনে কেমন একটা কোমল করুণ ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ রসিনির রচনা-প্রণালী আমাদের স্বরভেদমূলক রচনাপ্রণালীকে এই সার্বভৌমিক তত্ত্বের ভিতর দিয়াই অনেকাংশে স্পর্শ করে। সার্বভৌমিক তত্ত্বের কারণেই কোথায় সেই ইটালি প্রভৃতি দেশ, আর কোথায় এই ভারতের অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি সমতলক্ষেত্র, উভয়ের মধ্যে শত শত ক্রোশের সুবৃহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশীয় সঙ্গীতেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল, শত স্রোতস্বিনীবিধৌত শস্যশ্যামল ভাব যেন পরিস্ফুট হইতে চায়; উভয় জাতীয় সঙ্গীতে একটা করুণাত্মক স্বরভেদপ্রবণ কোমল ভাবের আশ্চর্য্য সমপ্রাণতা অনুভূত হয়।

সঙ্গীতে যে একটা সার্বভৌমিক তত্ত্ব থাকিবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান হইতে সত্যধর্ম্ম নামিয়া যেমন মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত হইয়াছে; মানবমাত্রেরই আত্মাতে যেমন ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, সেইরূপ একই ভগবানের প্রেমধারা সঙ্গীতের আকারে নামিয়া মানবমাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে; একই ভগবান সঙ্গীতেরও মূলতত্ত্ব মানবমাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব, যথার্থ প্রকৃতি প্রকৃতই সার্বভৌমিক—সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে গেলেই আমাদের মনে এই সংশয় জাগ্রত হয় যে, সঙ্গীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া প্রকৃত মূলগত কোন ভেদ বা পার্থক্য আছে কি না—থাকিতে পারেই কি না। মনে হয় যে, একই গোলাপ যেমন মাটির গুণে, জলহাওয়ার গুণে নিজের গোলাপত্ব না হারাইয়াও বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশকাল-অবস্থার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আকার প্রকার ও বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করে। যে সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশে জলহাওয়ার গুণে স্বরসম্বাদের অভিমুখে ঝুঁকিয়াছে, সেই সঙ্গীতই ভারতে স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণীতে পরিস্ফুট হইবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এই কারণে আজকাল পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া সঙ্গীতে কোন বিভাগ-রেখা টানিতে প্রস্তুত নন।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমার সিদ্ধান্তটীকে দৃঢ় করিতে চাই। সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব ভগবান কর্ত্তৃক মানবমাত্রেরই আত্মাতে নিহিত, সুতরাং সার্বভৌমিক, বলিয়াই ভারতেও যে সপ্তস্বরের সাহায্যে সকল গানই গীত হয়, ইউরোপেও সেই একই সপ্তস্বরের সাহায্যে সকল গান গীত হয়। প্রভাতের উদীয়মান কনক-তপনের চিত্রেই বল, অথবা সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্য্যের চিত্রেই বল, কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সকল স্থানেরই অঙ্কিত চিত্রে যেমন একটা মূলগত ঐক্য দেখা যায়, সেইরূপ সকল দেশের ও সকল জাতির সঙ্গীতেই প্রাভাতিক ভাবই বল, আর সান্ধ্য ভাবই বল, অনেকটা একই ধরণে ব্যক্ত হয়। একবার গ্রামোফোনে আমি একটী বাজনা শুনিয়া বুঝিলাম যে, উহা প্রভাত সংক্রান্ত কোন কিছু বিষয়ক—বাজনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতেছিল যে, ছন্দে ছন্দে তালে তালে উদীয়মান প্রভাত-তপন প্রকাশিত হইবার কথাই যেন উহা ব্যক্ত করিতেছে। অবশেষে দেখি যে, ঐ বাজনার নাম Morning Hymn বা প্রাভাতিক স্তব। সেইরূপ আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ অনেকেও আমাদের ভয়রো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগরাগিণী শুনিয়া বলিয়াছেন যে উহারা প্রভাতের ভাবব্যঞ্জক। পাশ্চাত্যদিগের নৈশ সঙ্গীত শুনিলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা নৈশভাব সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। আমার বিশ্বাস, প্রাচ্য বা প্রতীচ্যবাসী যিনিই হউন, আমাদের পূরবী, ইমনকল্যাণ, বেহাগ প্রভৃতি রাগরাগিণী শুনিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, এগুলির দ্বারা তাঁহার মনে প্রভাতের ভাব জাগিয়া উঠে। এই সকল রাগরাগিণী শ্রোতাগণকে সান্ধ্য ও নৈশ-ভাবেরই স্রোতে নিঃসন্দেহ ভাসাইয়া লইয়া চলিবে। প্রতীচ্য সঙ্গীতেও শোপ্যাঁর (chopin) "নৈশগীত" "Nocturne" বা Gounodর Serenade শুনিলে কাহারও মনে প্রভাতের উজ্জ্বল ভাব জাগিয়া উঠিবে না, নিশীথের একটা নীরব কোমলকরুণ ভাবই জাগিয়া উঠিবে। তাহার কারণ এই যে, মানুষ সর্বত্রই মানুষ, এবং সকলেরই অন্তর্নিহিত সঙ্গীত মূলত একই ভিত্তির উপরে গ্রথিত। সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে করিতে মানবমাত্রেরই

অন্তরে একটা উদাস-করুণভাব আনয়ন করে, সেই সময়ে অথবা সেই সময়ের জন্য রচিত—প্রাচ্যই হউক বা প্রতীচ্যই হউক—গীতাদিতে যে ঐ উদাস-করুণ ভাবেরই প্রাধান্য থাকিবে, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রকার গভীর অন্ধকার রাত্রির গম্ভীর ভাব যখন মানবমাত্রকেই আচ্ছন্ন করে, বলা বাহুল্য যে, সেই গভীর নিশীথে রচিত অথবা সেই সময়ের জন্য রচিত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে একটা নৈশ গম্ভীর ভাবেরই ছায়া নিপতিত হইবে। প্রকাশের আকারে প্রকারে ভেদ থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে মূলত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় সঙ্গীতই এক সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান।

সমস্ত সঙ্গীতে একটা অসাম্প্রদায়িক ভাব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই বিভিন্ন জাতি পরস্পরের দুঃখ বা হর্ষসূচক গানবাজনার ভিতরে দুঃখ বা হর্ষের অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, আমরা দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশীয় দুঃখ বা হর্ষসূচক সঙ্গীত রচনাতেও একই প্রকার ঢং আসিয়া পড়ে। সকলেই জানেন, এবং বাজনার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে যে, বীঠোবেনের 'বিষাদগীতি'র মূল ভাব গভীর বিষাদ। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদ ব্যক্ত করিবার জন্য যে ঢং বা প্রণালী উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন, বীঠোবেন তাঁহার রচনাতে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। বাজনাটী শুনিলেই মন বিষাদের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি 'পিলু-বারোঁয়া' রাগিণীতে "আমার প্রাণের ব্যথা কারে জানাই" নামক একটী গান রচনা করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, এই রাগিণীর মূল ভাব বিষাদ; এবং গানের পদ হইতেও বিষাদেরই ভাব যে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বীঠোবেনের ঐ "বিষাদ-গীতি"র প্রারম্ভেই কয়েক "কসি" বা barএর মধ্যেই সমস্ত বাজনাটীর মূলভিত্তি গাঁথা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ তাহারই বহির্বাঞ্জক অংশমাত্র। একদিন ঐ বাজনাটী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াই উপলব্ধি করিলাম যে, ঐ মূল অংশের সহিত পিলুবারোঁয়াঁর কত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। তখন ঐ "বিষাদগীতি" ও পিতৃদেবরচিত গীত তুলনা করিয়া দেখি যে, "বিষাদগীতির" ঐ মূলভিত্তি যে প্রণালীতে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে, পিতৃদেবের গানও স্বভাবতই সেই প্রণালীতেই রচিত হইয়াছে—একই সুর নিম্ন স্তর হইতে ক্রমশ যথাযথ উচ্চ স্তরে গিয়া চরমে পৌঁছিবার পর আবার নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। এস্থলে পিতৃদেবের উল্লেখ করাতে আমার যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে, আশা করি তাহা কেহই গ্রহণ করিবেন না। বীঠোবেন ও পিতৃদেব, উভয়ের কথা এক সঙ্গে বলিয়া আমি দেখাইতে চাই যে, দেশের, কালের ও অবস্থার সুমহান ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়ের রচনাপ্রণালীর মধ্যে সৌসাদৃশ্যের কারণ হইতেছে সঙ্গীতে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত এক সার্বভৌমিক মূল তত্ত্বের অস্তিত্ব। তবে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের প্রভেদ এইটুকু—যাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—যে, প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদ বা একস্বরত্বের প্রাধান্য—প্রত্যেক স্বরকে পৃথকভাবে ফুটাইয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেক গান বা গতের মূল কেন্দ্র রাগরাগিণীকে ফুটাইবার চেষ্টা করা হয়; প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদ বা বহুলস্বরত্বের প্রাধান্য—একাধিক সম্বাদী স্বরকে একসঙ্গে ফুটাইয়া সঙ্গীতের মূলভিত্তি রাগরাগিণীকে অনেক স্থলে ঢাকিয়া ফেলিয়া বহিরঙ্গ স্বরসম্বাদকেই অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদকে অপেক্ষাকৃত অবান্তর স্থান এবং স্বর-সম্বাদকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হইলেও সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব স্বরভেদ-ব্যক্ত রাগরাগিণী পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। প্রাচ্য সঙ্গীতে দুএকটী ব্যতীত স্বরসম্বাদের নিদর্শন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের ভিতরেও বিশেষ বিশেষ রাগরাগিণীর প্রকাশক স্বরবিন্যাস দৃষ্ট হয়। প্রতীচ্য যে কোন সঙ্গীতকে স্বরসম্বদের দ্বারা যতই কেন আচ্ছন্ন করা হোক না, তাহার ভিতরে কোন-না-কোন রাগরাগিণী অন্তঃসলিলভাবে, গূঢ় ও প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান থাকিবেই। যেমন কোন সমাজে সংঘবদ্ধ ভাবের অভাব ঘটিলেও ব্যক্তিত্বের অভাব হয় না, এবং সংঘবদ্ধ ভাবের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকিবেই, ব্যক্তিত্বই যেরূপ সমাজের মূলতত্ত্বরূপে অন্তর্নিহিত; সেইরূপ সঙ্গীতেও স্বরসম্বাদের অভাব ঘটিলেও স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণীর অভাব হইবে না, এবং স্বরসম্বদের মধ্যেও রাগরাগিণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য্য—রাগরাগিণীই সঙ্গীতের মূলতত্ত্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান। ইহা কেবল মতবাদ নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই কারণেই আমরা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় নৈশ সঙ্গীতেরই ভিত্তিরূপে কোন-না-কোন সান্ধ্য বা নৈশ রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসকে অবস্থিত দেখি। Chopinর Nocturne গুলি সুপ্রসিদ্ধ। Beethovenএর Pathetique sontaতে যেমন আমরা পিলুবারোয়াঁ রাগিণীর অবস্থিতি দেখিলাম, তেমনি Chopinর দ্বিতীয় Nocturneএ পূরবী, ছায়ানট ও ইমনকল্যাণ রাগিণীগুলির ঠাট বা রূপ খুব সহজেই অনুভূত হয়। তাঁহার অন্যান্য নৈশ সঙ্গীতেও খাম্বাজ, পূরবী, কেদারা প্রভৃতি রাগিণীর স্বরবিন্যাসের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রতীচ্য সঙ্গীতের ভিতরেও যেমন রাগরাগিণীর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নহে, সেইরূপ প্রাচ্য সঙ্গীতকে স্বরসম্বদ্ধ করাও অসম্ভব নহে।

রাগরাগিণী যে সঙ্গীতের সার্বভৌমিক মূলতত্ত্ব, সঙ্গীতমাত্রেই তাহার অপরিহার্য্য অস্তিত্বই সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতে আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রকাশ দেখি, এবং স্বরভেদব্যক্ত সঙ্গীতে আমরা একত্বকেই একমাত্র সাররূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। প্রকৃতিতে যেমন আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের একটী বন্ধনসূত্র দেখি, স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতেও সেইরূপ দেখি যে, নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূল রাগরাগিণীর একটী বন্ধনসূত্র থাকিবেই। মূল রাগ-রাগিণীর বহিঃশরীর স্বরবিন্যাসের অভাব হইলে কোন্ স্বরের উপর স্বরসন্ধিই বা হইবে, আর কাহারই বা উপর স্বরসম্বাদ করা হইবে? কোন একটা শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উপর অবলম্বিত না হইয়া কোন স্বরসম্বাদই দাঁড়াইতে পারে না। প্রাচ্য কোন রাগরাগিণীর

স্বরবিন্যাসের কোন এক বা একাধিক স্বরকে স্বরসন্ধি প্রভৃতির সাহায্যে পল্লবিত বা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অনুবাদিত করিয়া তুলিলেই তাহাকে স্বরসম্বদ্ধ করা যাইতে পারে—আমরা তথাকথিত পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রাপ্ত হই; আর পাশ্চাত্য স্বরসম্বদ্ধ কোন গান বা গতের সারটুকু বাহির করিয়া লইলেই তাহার অন্তঃস্থিত শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীটুকু প্রাপ্ত হই। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের মূলমন্ত্র, স্বরবিন্যাস হইল তাহার খাঁটি অর্থ, এবং স্বরসম্বাদ হইল তাহার অন্যতর ভাষ্য বা টীকা। রাগরাগিণী সুব্যক্ত করিবার সহায় স্বরবিন্যাস ও তদনুযঙ্গী স্বরভেদের সহিত স্বরসম্বাদের এতই যোগ, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে, স্বরভেদের পরিবর্ত্তে স্বরসম্বাদেরই উন্নতিসাধন Beethoven প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ-দিগের লক্ষ্য হইলেও তাঁহারা স্বরসম্বাদের পরিধি যথেষ্ট প্রসারিত ও সমুন্নত করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভেদেরও প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতের ঋষিরা যেমন ধ্যানবলে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যাকে করতলন্যস্ত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানকে মানবমাত্রের সকল জ্ঞান বিভাগেরই অন্তর্নিহিত কেন্দ্ররূপে প্রতীতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতের ঋষিমুনিরাই একান্ত সাধনার ফলে সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব রাগরাগিণীর সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের আবিষ্কারই তাঁহাদের জগতকে বিশেষ দান। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের অনুশীলন ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায় এবং রাগরাগিণীর মধ্যে সমস্ত সঙ্গীতেরই সমাবেশ হইতে পারে, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা, যতপ্রকার উপায়ে সেই মূলতত্ত্ব রাগরাগিণীকে সুব্যক্ত করা যাইতে পারে, সেই সকল উপায়েরই উন্নতিসাধনে হৃদয় মন অর্পণ করিয়াছিলেন; স্বর-সম্বাদকে সঙ্গীতের মাত্র বহিরঙ্গরূপে প্রতীতি করিয়া তাহার উন্নতি-সাধনে বিশেষ কোনই দৃষ্টি দেন নাই। ইহার বিপরীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা ঐ বহিরঙ্গ স্বরসম্বাদেরই উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আমরা এই সুস্পষ্ট সত্যে উপনীত হইতেছি যে, স্বরসম্বাদও যেমন পাশ্চাত্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে, উহা মানবমাত্রেরই অন্তরে ভগবান কর্ত্তৃক নিহিত সার্বভৌমিক তত্ত্বেরই বহিরঙ্গ মাত্র, স্বরভেদপ্রধান স্বরবিন্যাসের দ্বারা প্রকাশিত রাগরাগিণীও সেইরূপ প্রাচ্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে—উহা মানবমাত্রেরই অন্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে ভগবান কর্ত্তৃক লিখিত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সার্বভৌমিক মূলতত্ত্ব। স্বরভেদ ও স্বরসম্বাদ একই সঙ্গীতের মুক্তির পথে সমুত্থিত হইবার দুইটি পক্ষ। সুতরাং স্বরসম্বাদের বা harmonyর দিকে ভারতীয় সঙ্গীতকে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিলে, তাহা যে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণবিরোধী হইবে, অথবা তাহার ফলে ভারতীয় সঙ্গীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগরাগিণীর প্রাণ সমধিক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রাণঘাতী হইবে, অথবা তাহার ফলে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য স্বরসম্বাদ হইতে বিচ্যুত হইবে, সে কথা আমরা বিন্দুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সঙ্গীত বিভাগেও মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে, সামঞ্জস্য অবলম্বন করিতে হইবে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যথাসম্ভব মিলন সাধন করিতে হইবে। সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রকাশ-প্রণালীর মধ্যে বিরোধবিবাদ বিদূরিত করিতে হইবে। সঙ্গীতের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে চাহিলে একদিকে যেমন স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীর প্রয়োগ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ স্বরসম্বাদপ্রধান প্রকাশপদ্ধতিকেও প্রাচ্য সঙ্গীতে প্রবর্ত্তিত করিবার অবসর দিতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যাহা ভাল দেখিবে, তাহা আমাদের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যাহা গ্রহণের উপযুক্ত, নকলনবিশের ন্যায় তাহা হুবহু নকল করিতে বলি না। তাহাকে আমাদের রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসের উপর দাঁড় করাইয়া দেশীয় ভাবধারার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, পিতৃদেব, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞেরা অনেকগুলি বিদেশীয় সুরকে এই প্রকারে দেশীয় ভাবে অনুবাদ করিবার কার্য্যে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন। বিদেশীয় আচার-ব্যবহার, বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের ব্যবস্থা অনেক সময়ে অশোভন ও ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিদেশীয় বিজাতীয় হইলেও জ্ঞানের কোন বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে অশোভন ও ব্যর্থ হইবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাতে রোমক অংশ প্রবেশ করাইবার ফলে মঙ্গলই হইয়াছে, জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ও প্রসারই হইয়াছে। সেইরূপ পাশ্চাত্যদিগের নিকটে সঙ্গীত বিষয়ক কোন কিছু গ্রহণ করিলে আমাদের লজ্জা পাইবার তো কোন কথাই নাই, বরঞ্চ তাহা আমাদের সজীবতারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। গণিতবিষয়ক সত্য যেমন সকল দেশেই সত্য—দুই আর দুইয়ে চার হয়, ইহা যেমন দেশ-কাল-নির্বিশেষে সত্য, সেইরূপ সঙ্গীতবিষয়ক সত্যগুলিও দেশকালনির্বিশেষে সত্য—সা ও রে একসঙ্গে বাজাইলে এদেশেও সম্বাদী হইবে না, ইংলণ্ডেও সম্বাদী হইবে না। সজীব পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীতজ্ঞেরা আমাদের রাগরাগিণী অবলম্বনে সঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জাগরণের দিনে আমরা যদি অন্য জাতির ভাল বিষয় গ্রহণ করিতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকি, তবে আমাদিগকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের রাজ্য হারাইতে হইবে। পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্য সঙ্গীতের মনোমত ভাল অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, আর আমরা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেখিলেও কি অস্পৃশ্য বলিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিব? তাই বলি, সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পথে যাঁহারা পথপ্রদর্শক হইবেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আর, সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচীন-পন্থীরা—যাঁহারা এই প্রকার মিলনের বিরোধী, তাঁহারাও আমাদের নমস্য, তাঁহাদেরও উদ্দেশে আমাদের কৃতজ্ঞতা সমুত্থিত হইতেছে। তাঁহারাই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আবাহমানকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জাতীয় অবনতির সঙ্গে আমাদের অনেক ভাল জিনিস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনপন্থীরাই ভারতীয় সঙ্গীতের নির্ম্মল ধারাকে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। শত শত রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে আমরা হীরকসদৃশ ভাস্বর নানা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাচতুল্য নিষ্প্রভ অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া হর্ষচিত্তে বিচরণ করিতেছি, আনন্দে বিভোর হইয়া আছি। কিন্তু সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচীন-পন্থীরা প্রকৃত জহুরীর ন্যায় ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়া তাহাকে অবিকৃত আকারে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই সেই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজও আমরা ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চদরের অনুপম সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইবার অবসর লাভ করিতেছি, কেবল টপ্পা জাতীয় সঙ্গীতের মোহে ডুবিয়া যাই নাই। বর্ত্তমান যুগে বিরোধ বিবাদ ভুলিয়া গিয়া, সাম্প্রদায়িকতার জের পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পদ্ধতিকে যথাসামঞ্জস্য গ্রহণ করিলে সঙ্গীত-রাজ্যেও ভারত যে পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপসংহারে যে গীতপতি পরম দেবতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানব-মাত্রেরই অন্তরে সঙ্গীতের নির্ঝরের আকারে তাঁহার স্নেহপ্রেম ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং যিনি আমাদের অন্তরে সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িক ভাব উপলব্ধি করিতে দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতকে মিলনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার সুমহান বাণী প্রেরণ করিতেছেন, সকল সম্প্রদায়ের নমস্য, সর্ববিধ জ্ঞানের একমাত্র আধার সেই পরমেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি।

সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার কলিকাতা

কন্যা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্

সন্ধ্যা জ্বালা' হয়ে গেছে ঘরে, আর মোটে
নাহিক সময়, চতুর্দ্দশী এর পর।
বাহিরে পালকী রাখি, মিলি একজোটে
করে খিটিমিটি, আর মিনিট অন্তর
হাঁকে, "আস, শীঘ্র আ-স"—উড়ে বাহকেরা;
দ্বারের নিকটে মার বুকে মাথা রাখি
মেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে—বাল্যস্মৃতি-ঘেরা
গৃহ ছেড়ে যেতে হবে কোথা! মারও আঁখি
করে ছল-ছল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ তাঁর,
"ছি—কাঁদিতে কি আছে, লক্ষ্মী মা আমার!
ও-মাসে আনিব তোরে।" "দাদাকে, বাবাকে
যেতে ব'লো," ছোট ভাইটির মুখ চুমি'
পালকীতে চড়ে, "ব'লো, ভুলোনা মা তুমি।"
—স্বামীগৃহে যায় মেয়ে, মা চাহিয়া থাকে।

বধূ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্

জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে বিথানের 'পরে,
শুভ্র শয্যা—শুয়ে আছে বধূ আর বর।
গল্প আর গল্প, ঘুম চ'লে গেছে কোথা,
রাত্রি দ্বিপ্রহর, তবু ফুরায় না কথা।
"আচ্ছা, হাঁ-গা, ফুলগাছ নাই এখানে ত
একটাও; যুঁই বেশ, যদি পাওয়া যেত!
এনে দেবে গোটাকত গাছ?" "দেব, তবে—
আমায় অগ্রিম কিন্তু কিছু দিতে হবে।"
"কোথা পার?" হাসে চোখদুটি বড় বড়,
"কী বা আছে?" "চুমো" "যাঃ-ও তুমি দুষ্টু বড়",
পাশ ফিরে শোয় রাগে। কিছুক্ষণ পরে
কি ক'রে মিলিয়া যায় অধর অধরে,
লজ্জায় লুকায় মুখ বুকের ভিতর;
হয়েছে তাদের বিয়ে আজ দু' বছর।

চট্টগ্রামের কয়েকটী দৃশ্য

(বরকল)

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত

চিরশ্যামলা, কাননকুন্তলা, শৈলকিরীটিনী কবিধাত্রী চট্টলার অন্তর্গত নদ-নদী, বন-নির্ঝর, উৎস-পরিবেষ্টিত বরকল প্রদেশটি রাঙ্গামাটি হইতে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। এই ছায়াঘেরা বিজন প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কবিত্ব-শক্তি বিকাশের বিশেষ অনুকূল। প্রকৃতিরাণী তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াই যেন এই গোপন স্থানটিকে শ্যামল বন-রেখা, অবারিত আকাশ, ধূমল পর্ব্বত দ্বারা নব নব সাজে সাজাইয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী যখন আপনার ভাবে আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যখন সৃষ্টির অনন্ত বারতা বহন করিয়া স্থাবর জঙ্গমে আপনার রহস্য ছড়াইয়া বেড়ায়, শরতের উন্মুখ যৌবনে শ্যামলা প্রকৃতি যখন আপনার সৌন্দর্য্যে উছলিয়া পড়ে, সেই পবিত্রতাময়, চির-সৌন্দর্য্যময় প্রাণ-মন-কাড়া প্রাকৃতিক শোভা কতই সুন্দর, কতই মনোহর এবং কতই ভাবুকজন-স্পৃহনীয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিগন্ত-প্রসারিত পর্ব্বত-গাত্রে দয়েল, শ্যামা, পাপিয়া, ফিঙ্গে, টিয়া প্রভৃতি বন্য পক্ষীরা কলকণ্ঠে প্রকৃতির নির্জ্জনতায় সুমিষ্ট সঙ্গীত-লহরী তুলিতেছে। এই স্বভাব-মিষ্ট প্রাণ-কাড়া বিচিত্র সুর কবি ও অকবি উভয়েরই প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া কত শত

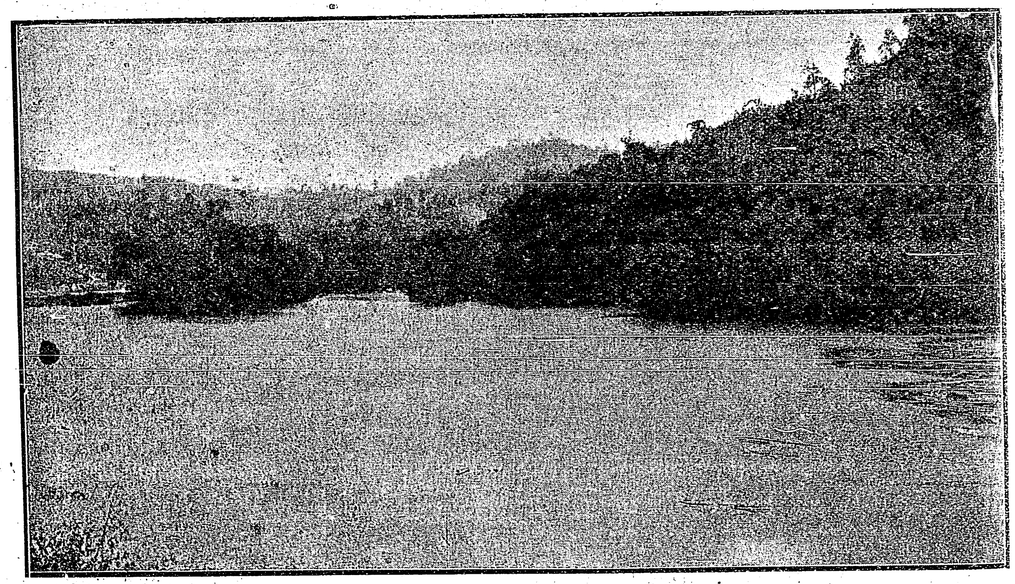

বরকল জলপ্রপাত (১)

বিচিত্র কাব্যের ও চিন্তার সৃষ্টি করে। এই ইন্দ্রজাল-সৃষ্টিবৎ শৈল-সিন্ধু-পরিবেষ্টিত রম্য কাননের নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হইয়াই কি পলাশীর কবি ৺নবীনচন্দ্র অনেক নূতন সৌন্দর্য্য-চিত্র সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন নাই!

এই সুন্দর শোভাময় বরকল, (Barkal) এই নক্ষত্র-পুলকিত নীলাভ আকাশ, এই স্থির, স্বচ্ছ-চন্দ্রিকা-চর্চ্চিত

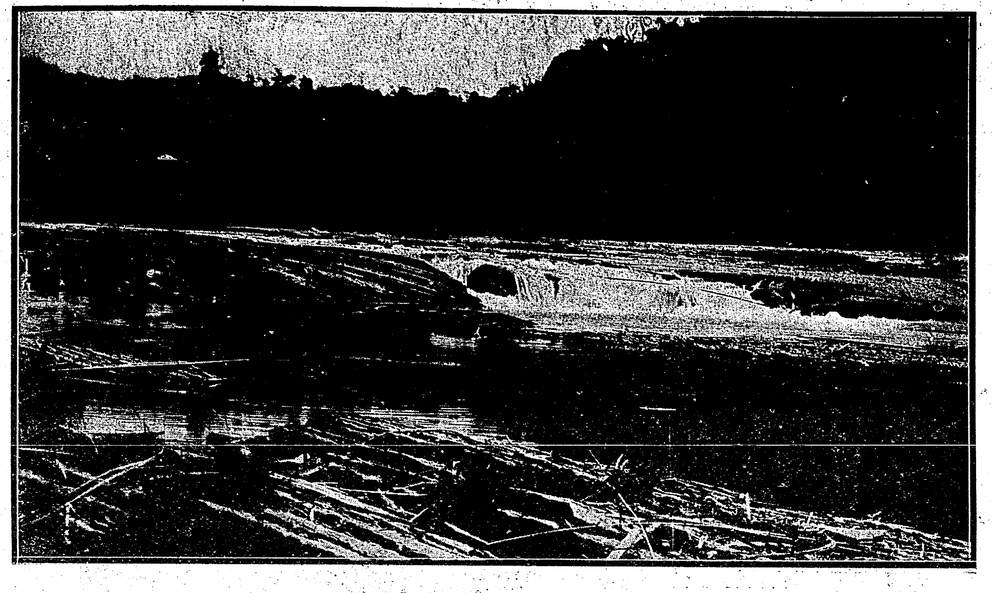

বরকল জলপ্রপাত (২)

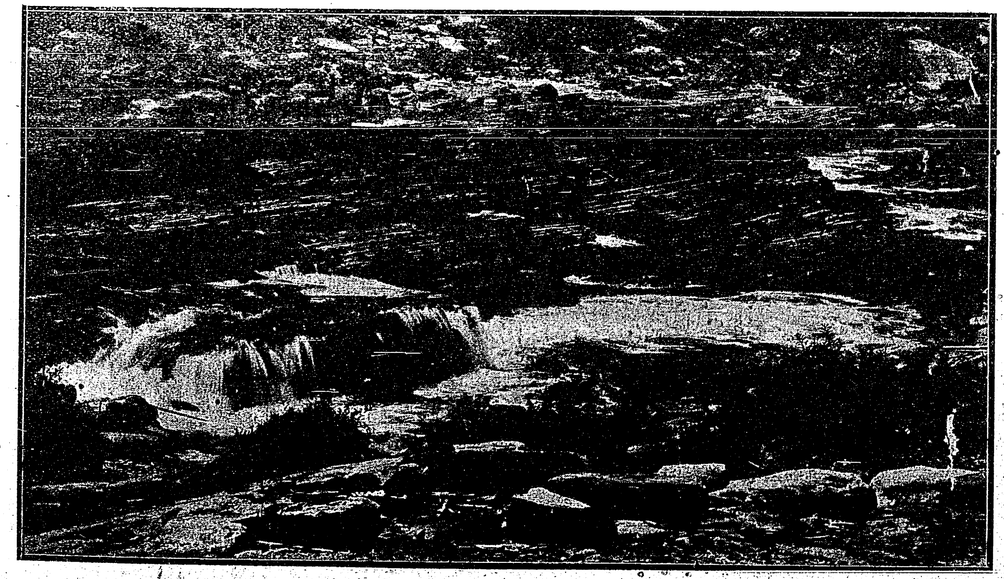

বরকল জলপ্রপাত (৩)

[বরকল জলপ্রপাত (৪)

কেহ কেহ The green-water বলেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাকে দূর হইতে সবুজ দেখায় ;—জল অতীব সুস্বাদু।

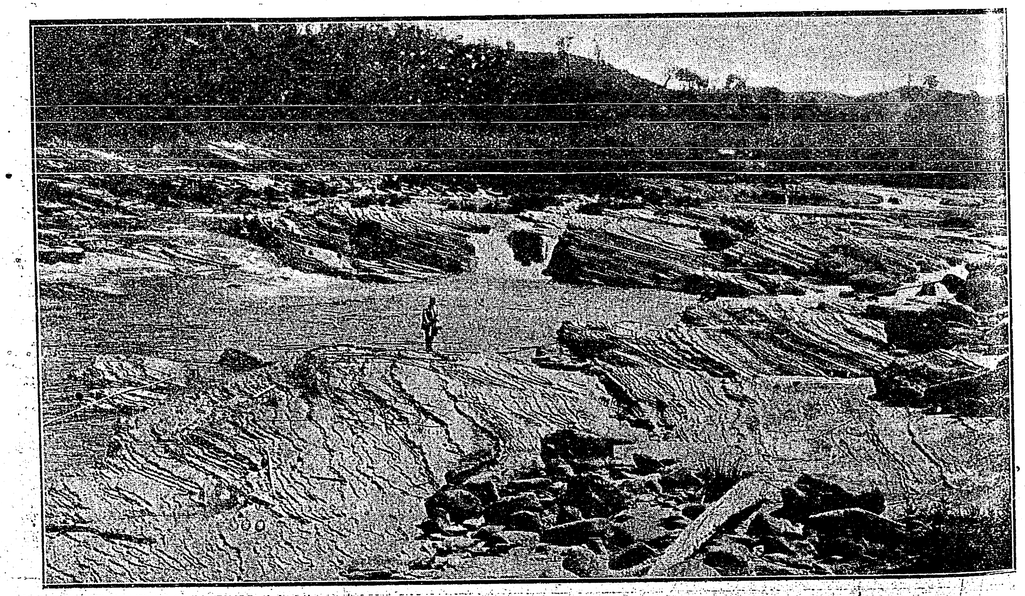

বরকল জলপ্রপাত (৫)

বরকল-জলধারা—এই নির্জ্জনতার বুকে উপস্থিত হইলে ভগবানের প্রতি স্বতঃই হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, এবং জীবন যেন এক নূতন রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বুঝি বা, এই সুন্দরী শোভাময়ী পৃথিবীর ছায়া-ঘেরা বিজন পথ-ঘাট, মাঠ, পর্ব্বত, নদ-নদীর কলকল রব, শ্যাম প্রান্তরের দক্ষিণ

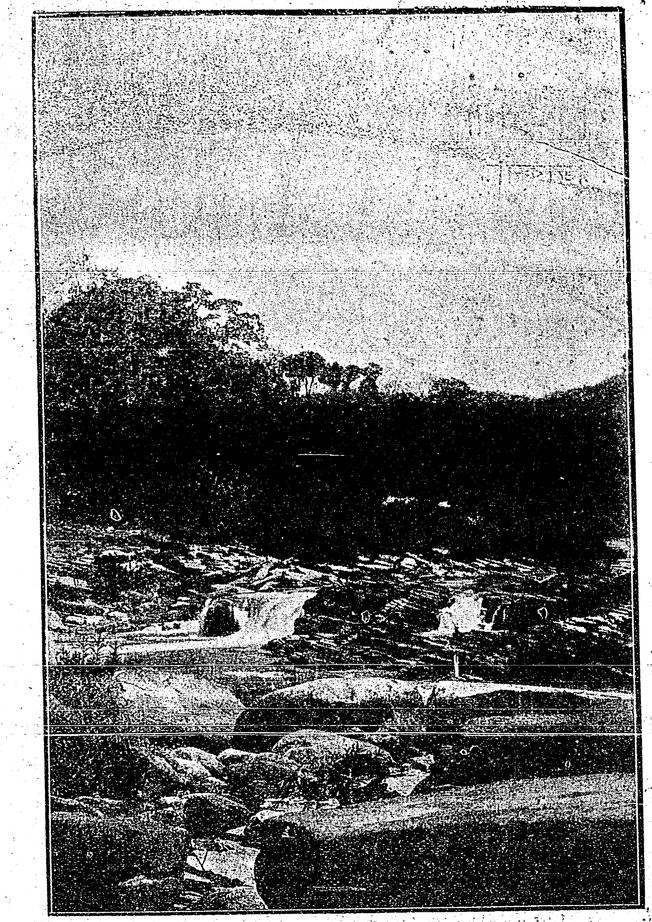

বরকল জলপ্রপাত (৬)

হাওয়া, জ্যোৎস্নার হাসি, হেমন্তের হিমানীই ভাবুকের প্রাণ, কবির কাব্য, বিশ্বচিন্তার ধর্ম্ম। সেফোর সঙ্গীতে ও ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিত্বে তাহারই বিকাশ ; মাইকেল-নবীন-হেম-রবীন্দ্রে তাহারই পরিচয়। জগতের সকল সৌন্দর্য্যই যেন অন্তর্যামী নৈসর্গিক সম্পদের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই জলপ্রপাত-পরিবেষ্টিত বরকল ভূমির অতুলন সৌন্দর্য্যের শতাংশও লেখনীতে ফুটাইয়া তোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বরকল-জলধারাই The waterfall of Barkal নামে অভিহিত। এই পাহাড়-পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত নির্জ্জন প্রদেশের নাম বরকল ;—এজন্য এই জল-ধারাকেও এই প্রদেশের নামানুসারে বরকল-জলপ্রপাত বলা হয়। ১৯২২ ইংরেজীতে গবর্মেণ্ট এই জলধারা হইতে Hydro-electric Currentএর বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব কয়িয়াছিলেন। কিন্তু অর্থের অনাটন বশতঃ সম্প্রতি তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। কর্ণফুলী নদী হইতেই বরকল জলপ্রপাতের উৎপত্তি। জলধারার এক পার্শ্বে সারি সারি কুসুমিত-তরুলতা-পরিবেষ্টিত শ্যামল-শস্য-ক্ষেত্র-পরিশোভিত পর্ব্বত-সমাচ্ছন্ন অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলি অস্তমিত দিন-মণির রক্তিম কিরণ-মালার সংস্পর্শে একখানি সুন্দর ছবির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অপর দিকে তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণী আবহমান কাল হইতে সুদৃঢ় প্রাচীরবৎ মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক যুগ-যুগান্তের কত নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছে। জলধারার অবিশ্রান্ত ঝরঝর নিনাদের সহিত ঝিল্লীর ঐক্যতান, স্নিগ্ধ, শান্ত, শ্যাম অরণ্যানীর সুশীতল ছায়া ও পক্ষীর সুমিষ্ট সঙ্গীত মিশ্রিত হইয়া জন-মানবহীন গোপন প্রদেশটিকেও এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতির কান্ত-মধুর নিরুপম সৌন্দর্য্যের ভিতরে সকল সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও সকল সৌন্দর্য্যের আধার অন্তর্যামীকে অন্বেষণ করিতে ভালবাসিতেন। যখন যেখানকার নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হইতেন, তখনই সেই পবিত্র স্থানটিকে তাঁহারা তীর্থধামে পরিণত করিতেন। হিন্দুর মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ, বাড়বকুণ্ড ও আদিনাথই কি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে না ?

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আরবীয় পরিব্রাজক 'ঈবন-বতুন', চীন পরিব্রাজক 'মাহুদ' প্রভৃতি বহু স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনীষিগণ চট্টগ্রামের সবুজ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছেন। বাংলার গৌরব সুপ্রসিদ্ধ জগত-বরেণ্য মহাকবি 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। ৺সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

সুন্দরী তুমি কোমলে কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ তোমার, সবুজবনের সৌরভে।
নীলিমা-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপরূপ
চট্টলা! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি গো!

* আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় এতৎসহ প্রকাশিত চট্টল-চিত্রগুলি দান করিয়া প্রবন্ধ-লেখায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

বাণী-রাণী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রাণি, রাণি, রাণি
বুকে ধরি' ওই পা দু'খানি
স্পর্দ্ধিতের দলিয়াছি দৃপ্ত অহঙ্কার,
প্রেমিকেরে বসায়েছি চির মহিমার
আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের লোকে,
অমৃতের পরশ-পুলকে
করিয়াছি রোমাঞ্চিত নিখিল-হৃদয়
মরুভূমে করিয়াছি রসের আলয়,
জয় তব জয়,
মরমের মধু পদ্মখানি
জ্যোতির্ম্ময়ী তব রাজধানী,
ধন্য আমি, তোমারে যে সেবি
তুমি বাণী, তুমি মোর দেবী।
জানি, জানি, জানি,
রিক্তশোক, রিক্তদুখ'গ্লানি
সুস্মরের সুধাপাত্র গানে, প্রাণে ভরি'
ওই তব রাঙাপায়ে যে দিয়াছে ধরি'
অন্তরের আকুল আগ্রহে,
কি ভৎর্সনা নিয়ত সে সহে
ওই মুখ ধ্যান যার, ওই প্রতিমাটি
দুটি আঁখি নীলে যার রূপের রেখাটি
আলো-তুলিকাটি
বুলাইয়া যায় লিখে লিখে,
পরিহাসে জাগে দশদিকে
সংসারের ঊষর প্রান্তরে—
নিন্দা তার, কোটি কণ্ঠস্বরে।

তুমি যার সব
নিত্য যার মহামহোৎসব
করি পান চারুধারা তোমার প্রেমের,
অনবদ্য উৎস তব অনন্ত ক্ষেমের
বহিয়াছে মানসে যাহার
কিরণের পরি' লীলাহার,
রহি তব আরাধনে শান্ত, সমাহিত
তব শুভ্র ছবি করি' পরাণে বিম্বিত,
লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত
জগতের বিষ—রসনায়
ক'রেছে সে মহা সাধনায়—
বাক্যহীন উপেক্ষার ভরে
নয়নের জ্বালাময় করে।
হিয়া—বসন্তের
শ্যামশোভা, দিক্‌দিগন্তের
দোলে ওই কুসুমিত বিচিত্র অঞ্চলে,
কোন্ প্রীতি-মন্ত্রে আজি ত্রিভুবন-তলে
ছুটিয়াছে বাধাবন্ধহারা
প্রাণ-পুষ্প-মকরন্দ-ধারা?
কোথা বাজে মিলনের মৃদুল বাঁশীতে
কম্পিত-কল্পনা-তন্ত্রী গুঞ্জরণে, গীতে
দিবসে, নিশীথে?
যেথা চিত্ত-শতদলে সিংহাসন পাতা
অনিন্দ মূরতি ওগো কবির বিধাতা
তারি মাঝে এস', এস রাণি
এস বাণী, এস বীণাপাণি।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

১১

শনিবারে থিয়েটারে ভারী ধুম।

পাপিয়া মনে-মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিল—এই চপলা যে কি দিয়া তৈরী, সে যে কত হীন, সেটুকু অমলের চোখে যদি ধরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অমলের অন্ধ চিত্ত হয়তো জাগিতে পারে। আর জাগিয়া তখন হয়তো সে দেখিতে পারিবে, পাপিয়া কি অমূল্য মন লইয়াই বসিয়া আছে!

শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সে কাশীপুরে আসিয়া অমলের সঙ্গে দেখা করিল, এবং অবিচল মূর্ত্তিতে অকম্পিত স্বরে বলিয়া গেল, অমল যেন থিয়েটার সুরু হইবার ঠিক আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ডানদিকের ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। কারণ চপলা তাকে দেখিয়া চিনিতে চায়! এই কথাটুকু বলিয়াই সে গম্ভীর ভাবে চলিয়া আসিল।

শনিবার সকালে পাপিয়া চপলাকে লিখিয়া পাঠাইল,—

ভাই চপলা দিদি, আমি তোমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে চাই। আমায় নিয়ে যেয়ো। মানগোবিন্দ অফিস থেকে সোজা থিয়েটারে যাবে। তার সঙ্গে বক্সেই দেখা হবে। তার অফিসের কাজে মোটরটা সন্ধ্যার সময় ব্যস্ত থাকবে, ভাই তাই তোমার সঙ্গে যেতে চাইছি। তোমার মোটর ঠিক আছে তো? ভৃঙ্গরাজও যাচ্ছেন তো?

চপলা জবাব লিখিল,—

আচ্ছা। এখানে সন্ধ্যার আগে আসিস্ তা হলে। ভৃঙ্গরাজ এখানে নেই। পাথরের কণ্ট্রাক্টের কাজে চুণার গেছে। আশ্বস্ত হও। দুদিন ছুটী সখি, ছাতু মাখতে হবে না। ভারী আপদ,—তা যাই বলিস্! নয়, ভাই?

সন্ধ্যার পর চপলার গাড়ী থিয়েটারের ফটকের সাম্‌নে আসিলে গাড়ীর মধ্য হইতে পাপিয়া দেখিল, তৃষিত চাতকের মত পিপাসু নেত্রে চাহিয়া অমল ঐ দাঁড়াইয়া আছে!...তার বুকে কে যেন ছুরি বসাইয়া দিল। এত দরদ! তবু চপলা তার কথা কিছুই জানে না! তার মনে হইল, চপলাকে একবার বলে, ঐ দেখ, তোমার সেই কবি ...কিন্তু না! যদি চপলা তার পানে চাহিয়া একটা তাচ্ছল্যের হাসিও হাসে,...তাহা হইলে অমল হয়তো ভাবিবে, ও তাচ্ছল্য নয়, দরদের হাসি, তারিফের হাসি! না—তার চেয়ে...

পাপিয়া চপলার গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—ওঃ, ভিড় দেখচো!—

—ও তো ফটকের সামনে ভিড় হবেই!

—তা নয় গো, পিছন দিকে ওধারে।

চপলা পিছন ফিরিয়া চাহিল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার গাড়ীও ফটকের মধ্যে ঢুকিল। পাপিয়া খুশী হইল, অমলের দিকে চপলার নজর পড়ে নাই! অমলের পানে চাহিয়া পাপিয়া হাসিল, আর অমল মুখে-চোখে রাজ্যের লজ্জা লইয়া কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।...

বক্সে বসিয়া পাপিয়া নীচে চাহিয়া দেখে, ঐ যে অমল! কি সতৃষ্ণ ভঙ্গীতে প্রকাণ্ড পর্দ্দাখানার দিকে সে চাহিয়া আছে!...

বাদ্য বাজাইয়া পট তুলিয়া থিয়েটার-ওয়ালারা পালা সুরু করিয়া দিল।...ঐ সীতা—উর্ম্মিলা, মাণ্ডবীদের সঙ্গে উদ্যানে বসিয়া গল্প করিতেছে...কৌশল্যা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল...লক্ষ্মণ আসিয়া চরণ বন্দনা করিল!...চকিতে একটা হাসির ঝাপ্‌টার মত সে দৃশ্য সরিয়া রাজবাড়ীর ঘর আসিয়া উদয় হইল। দুর্ম্মুখ অস্থির মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে —ঐ রাম...ঐ লক্ষ্মণ...বশিষ্ঠ...কি-সব কথাবার্ত্তা হইতেছে। তারপর...মুখে প্রেমের হাসির জ্যোতিঃ মাখিয়া সীতা আসিল—রামের বুকে কি আদর যাচিয়া সে মাথা রাখিল... রাম কথাও কহিল না—শুষ্ক চোখে সীতার পানে চাহিয়া। সীতা ব্যাকুল চোখে চাহিল, কহিল,—কথা কচ্ছ না কেন? মুখ তোমার মলিন কেন...? রামচন্দ্র সীতার হাত ধরিয়া সখেদে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িল—তার

পর দুর্ম্মুখের মুখে যা শুনিয়াছিল, সীতাকে বলিল। সীতা ম্লান চোখে রামের পানে চাহিল। রাম বলিল,—প্রজারা তোমার নির্ব্বাসন চায়,সীতা···বলিয়াই রাম মূর্চ্ছিত হইল।... কিন্তু···এ-সব যেন পুতুলের খেলা! তাদের একটা কথাও পাপিয়ার কাণে যাইতেছে না! পাপিয়ার চোখের সামনে ষ্টেজের উপর কি কতকগুলা সাজে সাজিয়া কয়টা প্রাণী নড়াচড়া করিতেছে, আর তার চোখের দৃষ্টি, তার সমস্ত মন···নীচে, ঐ পাঁচ-টাকার সীটে একটি লোকের হাব-ভাব-ভঙ্গী, তার ব্যথিত নিঃশ্বাসটুকু অবধি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে!...ও কি, ও যে কাঁদিতেছে...অমলের দুই চোখে জল যে!...ষ্টেজের পানে চাহিয়া পাপিয়া দেখে, রামের কাছে বিদায় লইয়া সীতা কম্পিত ত্রস্ত চরণে লক্ষ্মণের সঙ্গে ঐ কোথায় চলিয়াছে!

চারিধারে চটপট্ করতালি-ধ্বনি উঠিল। পাপিয়ার চমক ভাঙ্গিল। মানগোবিন্দ পাপিয়াকে ঠেলিয়া বলিল,—Excellent! তোমার চপলা দিদি কিন্তু first class actress! নাঃ, ওর আর জোড়া নেই ষ্টেজে!

এ-সব কথা পিয়ারীর কানেও গেল না।...সে পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া পাঁচ টাকার একটা সীটের দিকে চাহিয়া ছিল।···এত লোক বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে, পান খাইয়া, সিগারেট টানিয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া তারা মাঝে মাঝে চঞ্চল উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে...কিন্তু ঐ লোকটি...ওর চোখের সাম্‌নে অযোধ্যার সেই প্রাচীন যুগ যেন ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর একাগ্র চিত্তে বসিয়া ও সেই ছবিই দেখিতেছে!···এ লোকগুলার সঙ্গে উহার কত প্রভেদ...! পাপিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।...

সহসা থিয়েটার-শুদ্ধ লোক হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িতে পাপিয়া আবার চমকিয়া উঠিল। ব্যাপার কি ?··· মানগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া টানিল, কহিল,—ওঠো পাপিয়া...

পাপিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—কেন···?

মানগোবিন্দ হাসিয়া কহিল—কেন আবার কি!... থিয়েটার হয়ে গেল যে। সীতার পাতাল-প্রবেশ—তার পর আবার কি! সব তো ফুরিয়ে গেল। বেড়ে করেছিল কিন্তু শেষের ঐ trick sceneটা! মাটী ফেটে সীতা নেমে গেল তার মা বসুমতীর কোলে! চমৎকার! তা এখন ওঠো,—আর ফার্স-টার্স তো নেই—আজ শুধু এই একখানা বই-ই যে!

—ওঃ! বলিয়া কোনমতে অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া পাপিয়া উঠিল।...এতক্ষণ সে তো থিয়েটার দেখে নাই—চোখের সামনে কয় ঘণ্টা ধরিয়া কি যে হইয়া গেল, তা সে কিছুই জানে না! সে শুধু ঐ একটি লোকের উপরই তার দৃষ্টি আর মন নিবদ্ধ রাখিয়া উহারই ধ্যানে তন্ময় ছিল!

পাপিয়া এখন উঠিল, উঠিয়া বলিল,—তুমি যাও। আমি চপলা দিদির সঙ্গে যাবো—ওর সঙ্গেই এসেচি কি না! ভয় নেই, এখনি আমি বাড়ী ফিরবো...

—দেখো...মানগোবিন্দ একটু চিন্তিত হইল।

পাপিয়া কহিল,—ভয় নেই গো। তুমি এগোও... বলিয়াই পাপিয়া ক্ষিপ্র চরণে নীচে ষ্টেজে নামিয়া গেল। চপলা তখন মুখের হাতের রং ধুইয়া তোয়ালে দিয়া জল মুছিতেছে—আর আশে-পাশে ভক্তের দল জয়ধ্বনি করিতেছে।

পাপিয়াকে দেখিয়া চপলা কহিল,—এই যে আমার হয়েছে। আমি তৈরী। এখনি যাবো।···তারপর ম্যানেজারের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—আমার গাড়ীটা ভেতরে এসেছে কি না, একবার দেখতে বলুন না কাকেও...

কাছেই প্রম্পটার দাঁড়াইয়া ছিল—ম্যানেজার তাহাকে আদেশ করিতেই সে ছুটিল গাড়ীর খোঁজে। ম্যানেজার তখন সবিনয়ে চপলার পানে চাহিয়া কহিল,—তাহলে আসচে শনিবারেও একবার দয়া করতে হবে, চপল। আজ যে কত লোক জায়গা না পেয়ে ফিরে গেছে! তাদের নিশ্বেস কুড়িয়ো না, বুঝলে!

চপলা হাসিয়া কহিল,—দেখ্ তো ভাই প্যাপিয়া, ওঁদের মজা! ওঁরা বললেন, এক রাত্তির শুধু নাবনে,··· তারপর আবার এখন আব্দার তুলছেন...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না।

ম্যানেজার বলিল—ভুঙ্গরাজকে ধরতে হবে ফের...? বল...

চপলা বলিল,—সে এখানে নেই, চুণার গেছে।

ম্যানেজার বলিল,—তা-হলে...কি হবে? নামতেই

হবে যে। নাহ'লে থিয়েটার চালাবো কি করে? ও পার্ট আর কাকে দিতে পারি এখন, বল? লক্ষ্মীটি, আমাদের একেবারে ভুলো না।...

চপলা বলিল,—আচ্ছা, আসচে শনিবারে নামবো—কিন্তু সে রাত্রে আর দেড়শো টাকা নিচ্ছি না। পুরোপুরি দুশো চাই!···

ম্যানেজার বলিল,—ঐ তো···আমরা ছাপোষা মানুষ—তোমার ভাবনা কি, চপল?

—না, না, ওর কমে পারবো না।

ম্যানেজার কহিল,—আচ্ছা, ঐ দুশোই হবে···পঞ্চাশ টাকা নয় আমাকে দান করে যেয়ো, বাড়ী ফেরবার সময়।···কিছু কি দাবী নেই···?

ম্যানেজার হাসিল। চপলাও চোখের দৃষ্টিতে হাসির ফিনিক ফুটাইয়া কহিল,—বটেই ত!···

প্রম্পটার আসিয়া সংবাদ দিল,—গাড়ী তোয়ের।

—তাহলে আসি। বলিয়া চপলা ম্যানেজারকে নমস্কার করিয়া পাপিয়ার হাত ধরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিল। মোটর ফটকের মুখে ভিড় পাইয়া থামিল।

পথে তখন কি ভিড়! কালো মাথার ঢেউ ছুটিয়াছে যেন! তা ছাড়া গাড়ী, মোটর;···ফটকের ধারে পথের উপর দাঁড়াইয়া...অমল! পাপিয়া তাহাকে দেখিল। হর্ণ বাজাইয়া তাদের মোটর অমলের পাশে আসিয়া পড়িল। অমল তন্ময়-দৃষ্টিতে গাড়ীর মধ্যে চাহিল, পাপিয়া মুখ বাড়াইয়া হাসিল—চপলাও ফিরিয়া দেখিল। পাপিয়াকে কহিল,—কে রে? তোর জানা···?

মৃদু স্বরে পাপিয়া কহিল,—আমার দেবতা···

কথাটা চপলার কাণে গেল। বটে! বলিয়া সে মুখ বাড়াইল...অমলের সঙ্গে অমনি তার চোখোচোখি হইল। তার নিরীহ বেকুবের মত ভঙ্গী দেখিয়া, চপলা একেবারে দম্‌কা হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। মোটরও তীব্র বেগে আগাইয়া গেল—সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে একটা ভয়ঙ্কর রোল উঠিল—গেল, গেল—ধর, ধর—এমনি রব! পাপিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কে একজন গাড়া চাপা পড়িয়াছে, আর ভিড় একেবারে হৈ-হৈ করিয়া সেখানটায় গিয়া জড় হইতেছে!

পাপিয়ার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল।···যদি তাই হয়? যে রকম তন্ময় হইয়া এদিকে চাহিয়া ছিল···আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া··তার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কি করিয়া জানা যাইবে···?

সোফারের পাশে বিট্টু ভৃত্য বসিয়াছিল। পাপিয়া গাড়ী থামাইয়া তাকে বলিল,—তুই যা তো রে, কি হয়েছে, দেখে আয়।

চপলা বলিল,—কি আবার হবে...?

পাপিয়া কহিল,—কেউ চাপা পড়লো না কি···

চপলা কহিল,—দেখে কি হবে?

পাপিয়া কহিল,—তবু জানবো না? আহা!

চপলা কহিল,—তুই যেন কি! এখন বাড়ী গিয়ে শুতে পারলে বাঁচি—

পাপিয়া কহিল,—না ভাই, না। তুই যা রে বিট্টু—

বিট্টু ছুটিয়া গেল। আর গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পাপিয়া কম্পিত-বক্ষে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—তা যেন না হয়, ঠাকুর...

একটু পরেই বিট্টু আসিয়া খপর দিল, একটি ছোকরাবাবু মোটর চাপা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

পাপিয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কহিল—কি রকম দেখতে? গায়ে একটা হলদে রঙের রেশমী চাদর...? সেই বাবু···?

বিট্টু কহিল,—হাঁ মা, ঐ যে বাবু হামাদের বাড়ী গেছলো···ও-রোজ সবেরে···

—এ্যাঁ—! পাপিয়ার সাম্‌নে সমস্ত আকাশখানা যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল! সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।...

জ্ঞান হইলে পাপিয়া চাহিয়া দেখে, মোটর তার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বিট্টু ডাকিতেছে, —মা, মা-জী—

পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। চপলা...? বিট্টু কহিল, তিনি তাঁর বাড়ীতে নামিয়া গিয়াছেন। পাপিয়ার চোখের সামনে সেই চীৎকার ভাসিয়া উঠিল—গেল গেল, ধর ধর...পাপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ডাকিল—বিট্টু—

—মা-জী—

পাপিয়া কহিল,—এই পাঁচ টাকা বখশিস্ নে। নিয়ে শীগ্‌গির যা। সেইছোকরাবাবু যে মোটর চাপা পড়লো,

তার কি হলো,, খপর নিয়ে আয়। শীগ্‌গির...যাবি আর আসবি—একটা ট্যাক্সি নিয়েই যা...

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া মোটর হইতে নামিয়া উপরে উঠিল। ঘরে আসিয়া দেখে, মানগোবিন্দ বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে! সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জ্জন পথ...মাঝে-মাঝে গ্যাস জ্বলিতেছে। পাপিয়ার মনে হইল, ও-গুলা যেন রাত্রির চোখ! অসংখ্য করুণ নেত্র মেলিয়া নিশীথিনী তার দুঃখ দেখিতেছে! সে বারান্দায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল···আর কায়-মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—বিট্টু যেন ভালো খপর আনে, ঠাকুর!···

বিট্টু যখন খপর লইয়া ফিরিল, রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছে। পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিল, কহিল,—কি খপর রে?

বিট্টু বলিল, সে মারা যায় নাই—পুলিশ তাকে একটা মোটরে চাপাইয়া বেলগেছিয়ার হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে।···

পাপিয়া কহিল,—ঠিক খপর দিচ্ছিস? দেখিস্, মিথ্যে বলিস্ নে। যদি ঠিক হয় তোর খপর, তাহলে আরো বখশিস্ পাবি।

বিট্টু বলিল, সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রথমেই থিয়েটারে যায়; সেখানে বীটের পাহারাওয়ালার কাছে খপর লইয়াছে—তার পর সেখান হইতে থানায় গিয়া খপর লয়, থানা হইতে খপর লইয়া সে হাসপাতালে যায়—এবং বাবুর ঘরের লোক বলিয়া সেখানে পরিচয় দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, বাবু বাঁচিয়া আছেন, নিঃশ্বাস পড়িতেছে, তবে নাক হইতে মাথাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চোট লাগিয়াছে চোখে আর মাথায়। আপাততঃ ভয়ের কিছু না থাকিলেও পরে কি হইবে, ডাক্তার বাবুরা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে এখন কোন কথা বলিতে পারেন না।

পাপিয়া কহিল,—কাল একবার আমায় নিয়ে যেতে পারবি হাসপাতালে?

বিট্টু বলিল,—কেন পারবো না!

পাপিয়া কহিল,—তাহলে তোর সঙ্গে যাবো। আমি গাড়ীতে থাকবো, আর তুই ভেতরে যাবি।···বাবু যেন জানতে না পারে···বুঝলি?

বিট্টু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, আচ্ছা! অর্থাৎ সে খুব বুঝিয়াছে। এ পাড়ায় বিট্টু আজ প্রায় সাত বৎসর কাজ করিতেছে—কাজেই এ-সব কথা বুঝিবার মত বুদ্ধিও যে তার বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এইটুকুই সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল।

পাপিয়া কহিল,—আচ্ছা, যা, এখন শুগে যা। গাড়ী-ভাড়া ওর মধ্যে হয়ে গেছে তো! কাল সকালে বখশিস্ নিস্ পাঁচ টাকা।

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া সেই বারান্দাতেই বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। ঘুমাইতে হইবে, ঘুম পাইয়াছে, এখন এ কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

১২

হাসপাতালে প্রায় একমাস থাকিবার পর অমল সারিয়া উঠিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি হারাইল। সে অন্ধ হইল। ডাক্তাররা বলিলেন, চোখের চোট খুব গুরুতর—যদি ভবিষ্যতে এমনি কখনো সারে, তবেই ভালো! নচেৎ ভিতরে প্রচুর রক্তস্রাব হইয়াছে। আজীবন তাকে অন্ধ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

সারিয়া উঠিয়া অমল শুনিল, এবার তাকে হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইতে হইবে! অমল ভাবিল, এর চেয়ে তার মৃত্যু হইল না কেন? একা অসহায় সে—অন্ধ হইয়া বাঁচিবে কি করিয়া? ডাক্তারদের বলিল—অন্ধ আমি, কোথায় যাবো?

ডাক্তার বলিল,—কেন, আপনার তো সে ভাবনার কোন কারণ দেখচি না।...আপনার লোক অত টাকা খরচ করে আপনার নার্শদের ভোজ দেওয়ালেন, আমাদের পার্টি দেওয়ালেন...

অমল অবাক্ হইয়া বলিল,—আমি···আমার লোক...!

ডাক্তার বলিলেন—কেন, রোজ আপনার কে আত্মীয়া দেখতে আসেন...আপনার দিদি বোধ হয়! বিধবা মানুষ—থান-পরা, মোটা চাদর গায়ে...গাড়ীর মধ্যে বসে থাকেন, চাকর এসে দেখে যায়...

অমল আরো বিস্মিত হইয়া কহিল—সে কি, ডাক্তারবাবু! আমার যে কেউ নেই এ পৃথিবীতে...

ডাক্তার ভাবিলেন, লোকটার মাথা আজো ঠিক হয় নাই! ঠিক না হওয়া বিচিত্রই বা কি! যে আঘাত লাগিয়াছিল, এ তো এক-রকম পুনর্জন্ম হইয়াছে! তিনি বলিলেন,—তিনিই তো আসবেন, বলে গেছেন; বেলা তিনটে নাগাদ্ এসে আপনাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। নাহ'লে আজ সকালেই আপনার ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে যাবার কথা...!

অমল অবাক্ হইয়া গেল। তার দিদি...? নিত্য খপর লইতে আসেন! ডাক্তারবাবুদের ও নার্শদের ভোজ দিয়াছেন!...এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে,—না, দয়াময় ভগবান আজ অন্ধ করিয়া কোন্ আপনার জনকে সহায় করিয়া পাঠাইয়াছেন, এ অন্ধকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য...!

আহারাদির পর অমল শয্যায় পড়িয়াছিল। তার চোখ হইতে সব আলো কাড়িয়া এ কি করিলে, ভগবান...! সে যে-ধ্যানটুকু সম্বল করিয়া পড়িয়া ছিল···সে ধ্যানের দেবী যে-মুহূর্ত্তে তার পানে হাসিয়া চাহিল—যে-মুহূর্ত্তে পরম তৃপ্তি-ভরে তার চোখের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সে ধন্য হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছে, এ চোখের সে-দৃষ্টি ঠিক তার পরক্ষণেই এমন অকরুণ নির্দ্দয় হাতে কাড়িয়া লইলে!···এ জীবনের মত তাকে দেখার আশাও বিলুপ্ত করিয়া দিলে...!

হাসপাতালের বেয়ারা আসিয়া খপর দিল, আপনারি গাড়ী আসিয়াছে—আসুন...

অমল অবাক্! তার গাড়ী আসিয়াছে! সে কোন প্রশ্ন তুলিল না। ভৃত্য হাত ধরিয়া অমলকে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীর দ্বার বন্ধ হইল, গাড়ী চলিল। অমল হাত বাড়াইয়া দেখিল, গাড়ীতে কেহ আছে কি না!...কেহ নাই! কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ীতে কে? কোন জবাব নাই। গাড়ীর মধ্যে সত্যই কেহ ছিল না—শুধু একটা ভৃত্য কোচবক্সে বসিয়া গাড়োয়ানকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছিল।

চলিয়া চলিয়া গাড়ী আসিয়া এক জায়গায় থামিল।... কে একজন গাড়ীর দ্বার খুলিয়া তার হাত ধরিল, কহিল,—নামুন, বাড়ী এসেছি।

অমল কহিল,—কোথায়? কার বাড়ী?

যে হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল,—কাশীপুরে আপনার বাড়ী।

অমল কহিল,—তুমি কে?

লোকটা বলিল,—আপনার চাকর।

অমল কহিল,—আমার চাকর! আমার তো চাকর নেই...তোমার নাম?

লোকটা বলিল—শিবকিঙ্কর। আমায় শিবু বলে ডাকবেন।

অমল তার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আচ্ছা শিবু, বলতে পারো, তোমায় কে পাঠালে?···

শিবু কহিল,—আজ্ঞে, মা-জী...

—মা-জী! কোথাকার মা-জী?...কে তোমার মা-জী...?

—আজ্ঞে, বাড়ী গেলেই দেখতে পাবেন।

—আমার তো চোখ আর নেই, শিবু...দেখার ভাগ্য চিরদিনের জন্যে খুইয়েছি...অমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবু তার হাত ধরিয়া তাকে ঘরে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে শয্যায় বসিয়া অমল হাত বুলাইয়া শয্যা অনুভব করিল। ডাকিল,—শিবু...

—বাবু...

—এ কার বিছানায় আমায় নিয়ে এলে?

—আজ্ঞে, আপনারি।

—আমার বিছানা!...না। সে তো এত নরম নয়। এ যে নরম, ফুলের মত!...তারপর একটু থামিয়া আবার সে ডাকিল—শিবু...

শিবু কাছে আসিল। অমল কহিল—তোমার হাত...

শিবু অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তার হাত দুটো চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তোমার এই হাত ধরে মিনতি করচি, আমায় আজ অন্ধ বলে তামাসা করো না। বল ভাই, এ কোথায় আমায় নিয়ে এলে! কেন নিয়ে এলে...?

শিবু মিনতির স্বরে কহিল—কি সব বলচেন বাবু! আমি চাকর, আপনি মনিব। আমি আপনাকে ছুঁয়ে বলচি, আপনার সঙ্গে তামাসা করছি না, কোনো ছলনাও করছি না। এ যথার্থই আপনার সেই চিরকালের পুরোনো ঘর...

তার কি হলো, খপর নিয়ে আয়। শীগ্‌গির...যাবি আর আসবি—একটা ট্যাক্সি নিয়েই যা...

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া মোটর হইতে নামিয়া উপরে উঠিল। ঘরে আসিয়া দেখে, মানগোবিন্দ বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে! সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জ্জন পথ...মাঝে-মাঝে গ্যাস জ্বলিতেছে। পাপিয়ার মনে হইল, ও-গুলা যেন রাত্রির চোখ! অসংখ্য করুণ নেত্র মেলিয়া নিশীথিনী তার দুঃখ দেখিতেছে! সে বারান্দায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল···আর কায়-মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—বিট্টু যেন ভালো খপর আনে, ঠাকুর!···

বিট্টু যখন খপর লইয়া ফিরিল, রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছে। পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিল, কহিল,—কি খপর রে?

বিট্টু বলিল, সে মারা যায় নাই—পুলিশ তাকে একটা মোটরে চাপাইয়া বেলগেছিয়ার হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে।···

পাপিয়া কহিল,—ঠিক খপর দিচ্ছিস? দেখিস্, মিথ্যে বলিস্ নে। যদি ঠিক হয় তোর খপর, তাহলে আরো বখশিস্ পাবি।

বিট্টু বলিল, সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রথমেই থিয়েটারে যায়; সেখানে বীটের পাহারাওয়ালার কাছে খপর লইয়াছে—তার পর সেখান হইতে থানায় গিয়া খপর লয়, থানা হইতে খপর লইয়া সে হাসপাতালে যায়—এবং বাবুর ঘরের লোক বলিয়া সেখানে পরিচয় দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, বাবু বাঁচিয়া আছেন, নিঃশ্বাস পড়িতেছে, তবে নাক হইতে মাথাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চোট লাগিয়াছে চোখে আর মাথায়। আপাততঃ ভয়ের কিছু না থাকিলেও পরে কি হইবে, ডাক্তার বাবুরা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে এখন কোন কথা বলিতে পারেন না।

পাপিয়া কহিল,—কাল একবার আমায় নিয়ে যেতে পারবি হাসপাতালে?

বিট্টু বলিল,—কেন পারবো না!

পাপিয়া কহিল,—তাহলে তোর সঙ্গে যাবো। আমি গাড়ীতে থাকবো, আর তুই ভেতরে যাবি।···বাবু যেন জানতে না পারে···বুঝলি?

বিট্টু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, আচ্ছা! অর্থাৎ সে খুব বুঝিয়াছে। এ পাড়ায় বিট্টু আজ প্রায় সাত বৎসর কাজ করিতেছে—কাজেই এ-সব কথা বুঝিবার মত বুদ্ধিও যে তার বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এইটুকুই সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল।

পাপিয়া কহিল,—আচ্ছা, যা, এখন শুগে যা। গাড়ী-ভাড়া ওর মধ্যে হয়ে গেছে তো! কাল সকালে বখশিস্ নিস্ পাঁচ টাকা।

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া সেই বারান্দাতেই বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। ঘুমাইতে হইবে, ঘুম পাইয়াছে, এখন এ কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল!

১২

হাসপাতালে প্রায় একমাস থাকিবার পর অমল সারিয়া উঠিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি হারাইল। সে অন্ধ হইল। ডাক্তাররা বলিলেন, চোখের চোট খুব গুরুতর—যদি ভবিষ্যতে এমনি কখনো সারে, তবেই ভালো! নচেৎ ভিতরে প্রচুর রক্তস্রাব হইয়াছে। আজীবন তাকে অন্ধ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

সারিয়া উঠিয়া অমল শুনিল, এবার তাকে হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইতে হইবে! অমল ভাবিল, এর চেয়ে তার মৃত্যু হইল না কেন? একা অসহায় সে—অন্ধ হইয়া বাঁচিবে কি করিয়া? ডাক্তারদের বলিল—অন্ধ আমি, কোথায় যাবো?

ডাক্তার বলিল,—কেন, আপনার তো সে ভাবনার কোন কারণ দেখচি না।...আপনার লোক অত টাকা খরচ করে আপনার নার্শদের ভোজ দেওয়ালেন, আমাদের পার্টি দেওয়ালেন...

অমল অবাক্ হইয়া বলিল,—আমি···আমার লোক...!

ডাক্তার বলিলেন—কেন, রোজ আপনার কে আত্মীয়া দেখতে আসেন...আপনার দিদি বোধ হয়! বিধবা মানুষ—খান-পরা, মোটা চাদর গায়ে...গাড়ীর মধ্যে বসে থাকেন, চাকর এসে দেখে যায়...

অমল আরো বিস্মিত হইয়া কহিল—সে কি, ডাক্তারবাবু! আমার যে কেউ নেই এ পৃথিবীতে...

ডাক্তার ভাবিলেন, লোকটার মাথা আজো ঠিক হয় নাই! ঠিক না হওয়া বিচিত্রই বা কি! যে আঘাত লাগিয়াছিল, এ তো এক-রকম পুনর্জন্ম হইয়াছে! তিনি বলিলেন,—তিনিই তো আসবেন, বলে গেছেন; বেলা তিনটে নাগাদ্ এসে আপনাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। নাহ'লে আজ সকালেই আপনার ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে যাবার কথা...!

অমল অবাক্ হইয়া গেল। তার দিদি...? নিত্য খপর লইতে আসেন! ডাক্তারবাবুদের ও নার্শদের ভোজ দিয়াছেন!...এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে,—না, দয়াময় ভগবান আজ অন্ধ করিয়া কোন্ আপনার জনকে সহায় করিয়া পাঠাইয়াছেন, এ অন্ধকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য...!

আহারাদির পর অমল শয্যায় পড়িয়াছিল। তার চোখ হইতে সব আলো কাড়িয়া এ কি করিলে, ভগবান...! সে যে-ধ্যানটুকু সম্বল করিয়া পড়িয়া ছিল···সে ধ্যানের দেবী যে-মুহূর্ত্তে তার পানে হাসিয়া চাহিল—যে-মুহূর্ত্তে পরম তৃপ্তি-ভরে তার চোখের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সে ধন্য হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছে, এ চোখের সে-দৃষ্টি ঠিক তার পরক্ষণেই এমন অকরুণ নির্দ্দয় হাতে কাড়িয়া লইলে!···এ জীবনের মত তাকে দেখার আশাও বিলুপ্ত করিয়া দিলে...!

হাসপাতালের বেয়ারা আসিয়া খপর দিল, আপনার গাড়ী আসিয়াছে—আসুন...

অমল অবাক্! তার গাড়ী আসিয়াছে! সে কোন প্রশ্ন তুলিল না। ভৃত্য হাত ধরিয়া অমলকে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীর দ্বার বন্ধ হইল, গাড়ী চলিল। অমল হাত বাড়াইয়া দেখিল, গাড়ীতে কেহ আছে কি না!...কেহ নাই! কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ীতে কে? কোন জবাব নাই। গাড়ীর মধ্যে সত্যই কেহ ছিল না—শুধু একটা ভৃত্য কোচবক্সে বসিয়া গাড়োয়ানকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছিল।

চলিয়া চলিয়া গাড়ী আসিয়া এক জায়গায় থামিল।... কে একজন গাড়ীর দ্বার খুলিয়া তার হাত ধরিল, কহিল,—নামুন, বাড়ী এসেছি।

অমল কহিল,—কোথায়? কার বাড়ী?

যে হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল,—কাশীপুরে আপনার বাড়ী।

অমল কহিল,—তুমি কে?

লোকটা বলিল,—আপনার চাকর।

অমল কহিল,—আমার চাকর! আমার তো চাকর নেই...তোমার নাম?

লোকটা বলিল—শিবকিঙ্কর। আমায় শিবু বলে ডাকবেন।

অমল তার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আচ্ছা শিবু, বলতে পারো, তোমায় কে পাঠালে?···

শিবু কহিল,—আজ্ঞে, মা-জী...

—মা-জী! কোথাকার মা-জী?...কে তোমার মা-জী...?

—আজ্ঞে, বাড়ী গেলেই দেখতে পাবেন।

—আমার তো চোখ আর নেই, শিবু...দেখার ভাগ্য চিরদিনের জন্যে খুইয়েছি...অমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবু তার হাত ধরিয়া তাকে ঘরে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে শয্যায় বসিয়া অমল হাত বুলাইয়া শয্যা অনুভব করিল। ডাকিল,—শিবু...

—বাবু...

—এ কার বিছানায় আমায় নিয়ে এলে?

—আজ্ঞে, আপনারি।

—আমার বিছানা!...না। সে তো এত নরম নয়। এ যে নরম, ফুলের মত!...তারপর একটু থামিয়া আবার সে ডাকিল—শিবু...

শিবু কাছে আসিল। অমল কহিল—তোমার হাত...

শিবু অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তার হাত দুটো চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তোমার এই হাত ধরে মিনতি করচি, আমায় আজ অন্ধ বলে তামাসা করো না। বল ভাই, এ কোথায় আমায় নিয়ে এলে! কেন নিয়ে এলে...?

শিবু মিনতির স্বরে কহিল—কি সব বলচেন বাবু! আমি চাকর, আপনি মনিব। আমি আপনাকে ছুঁয়ে বলচি, আপনার সঙ্গে তামাসা করছি না, কোনো ছলনাও করছি না। এ যথার্থই আপনার সেই চিরকালের পুরোনো ঘর...

অমল তার হাত ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল। গাছের ডালে একটা পাখী ডাকিতেছিল—ও-পাশের ঘাটে মাঝিরা নৌকায় পেরেক মারিয়া কাঠ জুড়িতেছিল। উৎকর্ণ হইয়া অমল সে শব্দ শুনিল, তারপর কহিল,—সেই চেনা শব্দ··· পাখীর সেই চেনা ডাক···এখন বোধ হয় বিকেল?

শিবু কহিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ,—

অমল কহিল,—সব মিলছে···বিকেলের সেই হাওয়া, পাখীর সেই ডাক,..সব ঠিক! শুধু বিছানাটা তফাৎ হয়ে গেছে!...তা, শিবু...

শিবু বলিল—বলুন···

অমল কহিল,—তুমি যে বললে, তোমার মা-জীই সব করেছেন...তা কোথায় তিনি? তাঁকে ডাকো একবার··· দয়াময়ী দেবী, তাঁর এত দয়া অন্ধ আতুরের ওপর! তাঁকে ডাকো, তাঁকে আমি প্রণাম করি একবার।

শিবু কহিল,—তিনি আপনার জন্যে খাবার নিয়ে এখনি আসবেন—খাবার তৈরী করচেন!

অমল সস্নেহে কহিল,—না, না, খাবারের কোনো দরকার নেই। তাঁকে ডাকো, তাঁর পায়ের ধূলো পেলেই আমার সব ক্লান্তি ঘুচে যাবে···

শিবু কোন কথা বলিল না। অমল উৎকর্ণ হইয়া আকুল চিত্তে বসিয়া রহিল—করুণাময়ী, এত করুণা...কে তুমি!···আজ চোখের দৃষ্টি কাড়িয়া ভগবান, এ দগ্ধ দীন পৃথিবীকে কি এ শ্যামল স্নেহচ্ছায়ায় ভরাইয়া তুলিলে!...

শিবু কহিল,—মা-জী এসেছেন, বাবু...আমি বাইরে যাচ্ছি।

অমল কহিল,—একটু দাঁড়াও শিবু—তিনি কোথায়? তোমার মা-জী? আমায় তাঁর পায়ের কাছে বসিয়ে দাও—বলিয়া অন্ধ অমল আশ্রয় মাগিয়া দুই হাত বিস্তার করিয়া দিল! অমনি হাতে কার কোমল স্পর্শ অনুভব করিল! সেই কোমল হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সেই হাতখানি অমল বুকে তুলিয়া তার উপর প্রাণের কৃতজ্ঞতা উজাড় করিয়া দিল। তারপর বাষ্প-গাঢ় কণ্ঠে কহিল—অন্ধ আমি, চক্ষু হারিয়েছি...করুণাময়ীকে দেখতে পেলুম না...কিন্তু এ স্পর্শ—এ যেন অমৃত, স্বর্গ আমার···বলিয়া সেই কোমল হাতখানি নিজের অন্ধ নয়নের উপর চাপিয়া ধরিল। অন্ধের নয়নের কোণে দুই বিন্দু জল মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিল।

করুণাময়ী গাঢ় কণ্ঠে কহিল,—একটু কিছু খান...

এ কার স্বর...! এ স্বর···! না, এ স্বর তো আগে আর সে কখনো শোনে নাই!

অমল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—খাবো না।

করুণাময়ীর বুক ভাঙ্গিয়া দুই চোখ ঠেলিয়া অশ্রুর সাগর ছুটিয়া আসিতেছিল। অতি-কষ্টে সে অশ্রু-বেগ চাপিয়া সে কহিল,—কেন···?

অমল কহিল,—কে আপনি না জানলে আমি খাবো না···এত দয়ার পর এ নির্দ্দয়তা···এ যে আমার প্রাণে বড় বাজচে!

করুণাময়ী কাতর-কণ্ঠে কহিল—দয়া! তার কি পরিচয় পেয়েছেন আপনি?

অমল হাসিয়া কহিল—পাই নি...! হাসপাতালে নিত্য গিয়ে খোঁজ নেওয়া, ডাক্তারবাবুদের নার্শদের ভোজ দেওয়া—অন্ধ আমি, আমার জন্য লোক পাঠিয়ে এমন সমাদরে এখানে আনা...তারপর এই ফুলের মত নরম বিছানা, তৈরী খাবার—এ যে কল্পনার অতীত,···এততেও কি পরিচয় যথেষ্ট পাই নি!...

করুণাময়ীর দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতেছিল। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—পরিচয় যদি না দি...? পরিচয় না নিয়ে যদি শুধু স্নেহ আর সেবাই নেন, তাতে ক্ষতি আছে...!

—আছে,···আমার দিক থেকে শুধু নেওয়াই চলবে, বুঝচি। তবু কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, মনকেও তা জানাবো না?

—আমি কে, বুঝতে পারচেন না···?

—ঠিক পারচি না। তবে—

—তবে কে, বলুন দিকি—

—কিন্তু না—কে আপনি? কিসের আকর্ষণেই বা এই গরিব অন্ধ আতুরের জন্যে এতখানি করছেন—এ যে পাগলেও করে না···

—যদি বলি, আমারি জন্যে আপনার এ দুর্দ্দশা! সে-রাত্রের সেই বিপদ, এই অন্ধতা—এ-সব আমারি জন্যে··· আর এত যত্ন পাওয়া, সে অত-বড় অপরাধের কিছু প্রায়শ্চিত্তও যদি হয়, এই ভেবে শুধু এ সেবার ভার আমি নিতে এসেছি···

অমল অবাক্ হইয়া গেল। এর অপরাধে তার এই দুর্দ্দশা! কে...এ? তবে কি ইহারই মোটরে সে-রাত্রে সে চাপা পড়িয়াছিল! তাই অনুতাপে গলিয়া...কিন্তু না—এ তো একজন নারী..একজন নারী অসাবধানে মোটর চালাইয়া তাহাকে আহত করে নাই, নিশ্চয়ই!··· তবে···কার অপরাধের জন্য কে এ কঠিন দণ্ড মাথায় তুলিয়া লইতেছে! একজন নারী কার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছে—তার নিজের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, সব ছাড়িয়া...এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কে এ...?

অমল কহিল,—এ হতেই পারে না। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই চাপা পড়েছিলুম—সে দোষ আমারই। আর কারো দোষ তাতে হতেই পারে না!

—কিন্তু আপনার তো সেখানে যাবার দরকারই ছিল না, যদি না—

—যদি না থিয়েটার দেখতে যেতুম—এই কথা বলচেন তো?

—থিয়েটারে তো আপনি যান না—শুধু সেই দিনই গেছলেন! আর কেন গেছলেন—

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই কিসের আনন্দে তার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে সে কহিল,—চপলা যদি সীতা না সাজতো, তাহলে যেতুম না—এই কথা বলচেন? সে কথা ঠিক...তাহলে... তাহলে আপনি—কিন্তু না, না—আমি পাগলের মত এ কি বক্‌চি···

উদ্যত আগ্রহে করুণাময়ী কহিল,—বলুন, বলুন, আমি কে?...উত্তরের প্রতীক্ষায় সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া যেন ফুঁসিতে লাগিল।

অমল কহিল,—আপনি চপলাসুন্দরী···আপনারই ধ্যানে···?

সহসা পাশে একটা আর্ত্ত স্বর ফুটিল; সে আর্ত্ত স্বরে শিহরিয়া অমল থামিয়া পড়িল. এবং পরক্ষণেই কহিল,—ও কি! আপনার লেগেচে কোথাও···?

গাঢ় স্বরে উত্তর হইল—না।

—তবে···তেমনি একটা চীৎকার যেন শুনলুম···!

—ও আপনার মনের ভুল! উত্তেজনার ঘোরে কি শুনেচেন!

অমল কহিল—কৈ, দেখি আপনার হাত!—আঃ!··· তাহলে আপনিই চপলাসুন্দরী...?

গাঢ় স্বরে উত্তর হইল,—যদি সে হলে আপনি অসুখী না হন, তাহলে আমি সে-ই! নারীর দুই চোখে অশ্রুর ঝর্ণা বহিল।

অমল কহিল,—কিন্তু এত দয়া—! বুঝেচি, আপনি ভেবেচেন, আপনাকে দেখতে গিয়েই অসাবধানে গাড়ী চাপা পড়েছি—ঠিক তা নয়!—তবে আপনার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে যে-দণ্ডে আমার দৃষ্টি মিশলো, আমার দেহে-মনে যেন কিসের বাণ ডেকে গেল—দুনিয়ার যত আলো চোখের সামনে কি প্রখর দীপ্তিতে যে জেগে উঠলো—তারপর সব অন্ধকার!...অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার—আজীবন দুই চোখে এই অন্ধকার বয়েই আমায় বেড়াতে হবে এখন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমল চুপ করিল—আর করুণাময়ী···! তার চোখের জল কিছুতে আর থামিতে চায় না! এত জলও ছিল তার দুই চোখে!

বহুক্ষণ পরে অমল কথা কহিল। সে বলিল,—আপনিই আমার জন্যে এত করেছেন, করছেনও! এ যে অন্ধ হয়েও আনন্দ আমার ধরচে না আজ...

করুণাময়ী কহিল,—কি আর করেছি!...আমি পোড়ারমুখী আপনার পানে যদি চেয়ে না দেখতুম—তাহলে তো আর এ বিপদ হতো না!···সে যে কি অপরাধ করেচি—তার জ্বালায় পলে-পলে পুড়ে মরচি... উঃ— " "

অমল কহিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন তো আমাকে দেখতে···! আর ঐ চাকরটিকে আপনিই বুঝি আমাকে আগ্‌লাবার জন্যে রেখেচেন···

করুণাময়ী আর্ত্ত স্বরে কহিল—না, না, কারো কাছে বিশ্বাস করে তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি না যে··· আমি যাবো না, তোমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না আমি!...এখানেই আমি থাকবো গো!··· ওগো অন্ধ, ওগো বেচারা,—তোমার সেবাই আমার জীবনের ব্রত হোক্। অনেক পাপ করেচি, তোমার

সেবায় কি তার কিছুও কমবে না? আমার হারানো হাসি কি এ জীবনে কোন দিন ফিরিয়ে পাবো না...?

অমল কহিল—তুমি কাঁদচো...?

—না। করুণাময়ী দুই হাতে জোর করিয়া মনের যা-কিছু বেদনা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এবার তুমি খাও—

অমল রেকাবি লইয়া খাবার খাইতে লাগিল—আর করুণাময়ী তার পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল, আর-একদিনের কথা···সেদিনও অমল জলখাবার খাইতেছিল, কিন্তু মুখে সেদিন কি অপ্রসন্ন ভাব! আর আজ...!

হারে হতভাগিনী...সেদিন সে যা, তাই ছিল—পাপিয়া! অমলের একটু হাসি, এতটুকু প্রসন্ন দৃষ্টির ভিখারিণী পাপিয়া! আজ আর সে পাপিয়া নয়—সে চপলা! সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিশাচী চপলা! যেদিন সে পাপিয়া ছিল, অন্ধ অমল সেদিন সে পাপিয়াকে চেনেও নাই—আর আজ দুই চোখ হারাইয়া—সে-পাপিয়াকে চেনা তার পক্ষে আরও অসম্ভব! (ক্রমশঃ)

মাতৃমূর্ত্তি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির]

ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ভারতের দর্শনসমূহ আগাগোড়া দুঃখবাদে (Pessimism) পরিপূর্ণ,—উহাতে সুখবাদের (Optimism) স্থান আদৌ নাই। আমরা দেখাইব, তাঁহাদের এই মত সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে—দুঃখবাদে ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার চরম পরিণতি দুঃখবাদে নহে—ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি লাভেই উহার পরিসমাপ্তি।

অন্যান্য দেশের দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের একটু পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশে দর্শনশাস্ত্র কেবল তর্কশাস্ত্র মাত্র;—বাদ, জল্প, বিতণ্ডায় উহা পরিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশজনিত আনন্দই উহার মুখ্য ফল। বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে একজন দার্শনিক কি ভাবে অপরের মত খণ্ডন ও স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের ছত্রে-ছত্রে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আমাদের দেশে প্রত্যেক শাস্ত্রেরই প্রারম্ভে অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। যে বিষয়ের প্রয়োজন নাই, সে বিষয় শাস্ত্রে স্থান পায় নাই। এ দেশে দর্শনশাস্ত্রসমূহের মুখ্য প্রয়োজন—পরস্পরের সহিত বিবাদ নহে, খণ্ডন ও প্রতিষ্ঠা নহে। উহাদের প্রয়োজন—দুঃখ-নিবৃত্তি। শুধু নিবৃত্তি নহে, দুঃখের ক্ষণিক অভাব নহে,—আহারে যেরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি, ঔষধে যেরূপ ব্যাধির উপশম, তাদৃশ নিবৃত্তি বা উপশম নহে—সমূলে দুঃখের উচ্ছেদ-সাধন। যাহা দর্শনের প্রয়োজন, তাহাই মানবের পরম পুরুষার্থ।

তবেই দেখা গেল, দুঃখবাদে যে ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখবাদ বিশেষরূপে পরিস্ফুট। ভগবান্ বুদ্ধদেব জগতের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং ত্রিতাপগ্রস্ত জীবকে নির্ব্বাণের সন্ধান দিয়াছিলেন। সাঙ্খ্য দর্শনের গোড়ায়ও ত্রিবিধ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। (১) ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনও দুঃখের অস্তিত্ব

(১) "ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ পরমপুরুষার্থঃ।"

স্বীকার করিয়া ইহা নাশ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসাও যখন কর্ম্মকাণ্ডকেই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দুঃখকে অস্বীকার করেন নাই। স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতিই কর্ম্মের চরম লক্ষ্য। তবে এই সুখ চিরস্থায়ী নহে। কেন না, স্বর্গ হইতে আবার পতন হয়—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" বেদান্ত-দর্শনেও ব্যবহারিক জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। শুধু দর্শনশাস্ত্রে কেন, ধর্ম্মশাস্ত্রেও দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও কোন কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে—জগৎ দুঃখময়। বাস্তবিক, আর্য্য ঋষিগণ দুঃখকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখেন নাই। কেন না, যাহা অনুভবসিদ্ধ, তাহা মিথ্যা হইবে কিরূপে? অতএব, তাঁহারা হেগেল (Hegel) (২) বা লাইব্‌নিজের (Leibnitz) ন্যায় (৩) কোন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। এই সকল কারণেই পাশ্চাত্য মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিন্দুদর্শনের একটি প্রধান দোষ—ইহার দুঃখবাদ। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দুঃখবাদের (Pessimism) সহিত ভারতের এই দুঃখবাদের পার্থক্য কোথায়, তাহা তাঁহারা প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই।

স্বর্গ বা অপবর্গ, দুঃখনিবৃত্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ প্রভৃতি যে দেশে দর্শনের চরম লক্ষ্য, সে দেশে দুঃখ যে কিছুতেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। তত্ত্বজ্ঞান, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক প্রভৃতি যাহাই দুঃখনিবৃত্তির উপায় হউক না কেন, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহা অনিত্য, তাহারই নিবৃত্তি সম্ভব, নিত্য বস্তুর নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

দুঃখ আমাদের স্বরূপ নয়, আনন্দই আমাদের স্বরূপ। শ্রুতিতে আমাদিগকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং খলু প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ—"আনন্দ হইতেই এই জীবসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, আনন্দেই জীবসমূহ জীবিত রহিয়াছে, আনন্দেই জীবসমূহ লীন হইতেছে।" সাঙ্খ্য-দর্শন বলিতেছেন, জীব যখন বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতিই যাবতীয় সুখ-দুঃখের ভোক্তা, পুরুষ কেবল দ্রষ্টা-মাত্র, সাক্ষীস্বরূপ,—তখনই সে সকল সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া যায়। সেশ্বর সাঙ্খ্য বা যোগদর্শনও এই মতাবলম্বী। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও উক্ত আছে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই আমাদের অপবর্গ লাভ হয়। (৪) বেদান্ত দর্শন বলিতেছেন, জীব যখন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তখন আনন্দই তাহার স্বরূপ। জীবমাত্রেই আনন্দলাভের আশায় ছুটিতেছে,—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে যে আনন্দ হয়, তাহাও সেই ব্রহ্মানন্দের অংশ-মাত্র,—তবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আনন্দ অখণ্ড নয় বলিয়া উহা অবিমিশ্র হইতে পারে না,—উহা দুঃখ-মিশ্রিত। একমাত্র আত্মোপলব্ধি দ্বারাই অখণ্ড অবিমিশ্র আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। জীব তখন বলিয়া থাকে "ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বাত্মানমজ্ঞসা বিদ্ধি। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্।" ইত্যাদি (পঞ্চদশী)

উপনিষদে ভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ, রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" বৈষ্ণবশাস্ত্রেও ভগবানের বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব দার্শনিকের মতে সেই বিগ্রহের সেবায়ই জীবের দুঃখনিবৃত্তি, আনন্দলাভ। দেহাত্মাভিমানী জীবই দুঃখের অধীন। যিনি ভগবানের দাস, তিনি দুঃখের অতীত। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ,—এই সম্বন্ধের নাম ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অথচ উহা অচিন্ত্য অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য। সেই প্রিয়তমের সহিত মিলনে অপূর্ব্ব আনন্দ, তাঁহার সহিত বিরহও মধুর। যিনি এই রসাস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ কোথায়?

অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ ভারতীয় দর্শনের উপর যে দোষারোপ করিয়া-ছেন, তাহা অসঙ্গত। ভারতীয় দর্শন কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না,—প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সাধনের উল্লেখ আছে। এই জন্যই বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন অধিকারীর জন্য লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল অপূর্ব্ব তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই।

(২) হেগেল বলেন :—Evil is a necessary phase in the self-evolution of the Absolute".

(৩) লাইব্‌নিজ বলেন :—"This world is the best of all possible worlds".

(৪) "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

ভারতীয় দর্শন আলোচনা করিবার সময় আমাদের অধিকার ও প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। তাহা হইলে আমরা দর্শনের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারিব। এইখানেই ভারতীয় দর্শনের বিশেষত্ব। ভারতীয় দর্শন উপলব্ধির বস্তু। ঋষিগণ যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। তাই, তাঁহারা তাঁহাদের মতসমূহ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বদাই আলোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং এইজন্যই অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভারতীয় দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। (৫)

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা দুঃখবাদী, তাঁহারা বলিয়াছেন, জগতে সুখ অভাবাত্মক, দুঃখই সত্য এবং এই দুঃখের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। যাঁহারা সুখবাদী, তাঁহারা বলিতেছেন, দুঃখ অভাবাত্মক, সুখই সত্য, এবং এই সুখের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। জার্ম্মাণ দার্শনিক লোট্‌জে (Lotzè) সমস্ত মতের সমালোচনা করিয়াও কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—"Pessimism as a theory is equally tenable as optimism" অর্থাৎ "মত হিসাবে সুখবাদও যেমন সমর্থনযোগ্য, দুঃখবাদও তেমনি সমর্থনযোগ্য।" একমাত্র ভারতীয় দর্শনেই ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। ভারতীয় দর্শন বলিতেছেন, দুঃখ অভাবাত্মক নহে, কিন্তু অনিত্য। সুখ ও দুঃখ পরস্পর সাপেক্ষ (Relative), কিন্তু আবার উভয়েই স্বতন্ত্র পদার্থ। অতএব, সুখও দুঃখের অভাব মাত্র নহে। তবে, জীব স্বরূপতঃ দুঃখাতীত, সে আনন্দস্বরূপ; আনন্দেই তাহার উৎপত্তি, আনন্দেই তাহার স্থিতি। সে অমৃতের শিশু, চরমেও অমৃতের অধিকারী। অমৃতত্বে তাহার জন্মগত অধিকার। আত্মার স্বাধীনতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।

এই জন্মগত অধিকারের কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ, যত অপমান। জানি না, কবে আবার আমরা সেই অধিকার লাভ করিব?

(৫) Maxmuller এর Six Systems of Indian Philosophyর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

চিত্রে বৈচিত্র্য

শ্রীহরিহর শেঠ

(১)

যাহা অসাধারণ তাহাই বিচিত্র। সে চিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে বা যে চিত্রে সে সব বৈচিত্র্য হইতে পারে—বহু চিত্র সহযোগে তাহার সম্বন্ধে বলা এবং তাহা দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। চিত্রে বৈচিত্র্য এ প্রবন্ধের নাম দিলেও, বিচিত্র চিত্র এই নামটিও এখানে সমান প্রযোজ্য। খেয়াল হইতেই প্রায় এই বৈচিত্র্য উদ্ভূত হইয়া থাকে,—তা মানুষেরই হোক আর প্রকৃতির-ই হোক। একের খেয়ালে অপরের উপভোগের সুযোগ হইতে অনেক সময় দেখা গেলেও, কখন-কখন তাহা যে পরের পীড়ার কারণ হয় না, তাহা বলিতে পারি না। আজ যে একজনের খেয়ালে কতকগুলি বিচিত্র চিত্র সংগ্রহ ও অঙ্কিত হইয়া এই বিচিত্র প্রবন্ধের সৃষ্টি হইতেছে—জানি না, ইহা পাঠক-পাঠিকাদের কতদূর উপভোগের বা পীড়ার কারণ হইবে।

লেখনী বা তুলিকা দ্বারা বহু প্রকারের বহু রেখার সমন্বয়ে বা বিবিধ বর্ণ-সম্পাতে, অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলো ও ছায়ার সমন্বয়ে সাধারণতঃ ছবি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন-কোন ক্ষেত্রে শিল্পীর খেয়ালে বা স্বাভাবিক ভাবে এই সব সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। একই ছবি বিভিন্ন ভাবে দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায়। ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্য ছবি ইচ্ছাক্রমে অঙ্কিত বা স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন-কোন চিত্রে দৃষ্টি-বিভ্রম আনয়ন করে; এক বিষয়ের

ছবি অন্যরূপ দেখায়, অর্থাৎ সমস্ত পূর্ণ ছবিখানি দুই তিনটি দৃশ্য-বোধক থাকে। এই সকল চিত্রকেই আমি বিচিত্র চিত্র বলিতেছি।

চিত্রই এ প্রবন্ধের প্রাণ। বিভিন্ন প্রকারের ছবি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

১ম ছবিখানি একটি ঘোড়ার মুখ এবং ২য় খানিতে দেখা যায়, একটা সাঁওতালকে এক সাহেব পিস্তল দ্বারা

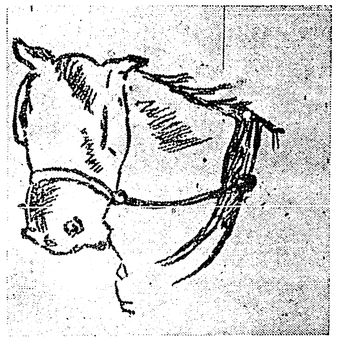

১ম চিত্র

মারিতে উদ্যত হইয়াছে। এই উভয় ছবিই উল্টাইয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রথম খানি চুরুট মুখে একটি কুকুরের

২য় চিত্র

৩য় চিত্র

৪র্থ চিত্র

বাচ্ছা গাছে বাঁধা আছে এবং দ্বিতীয় খানিতে দেখা যায়, সাঁওতাল সাহেবের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মারিতে

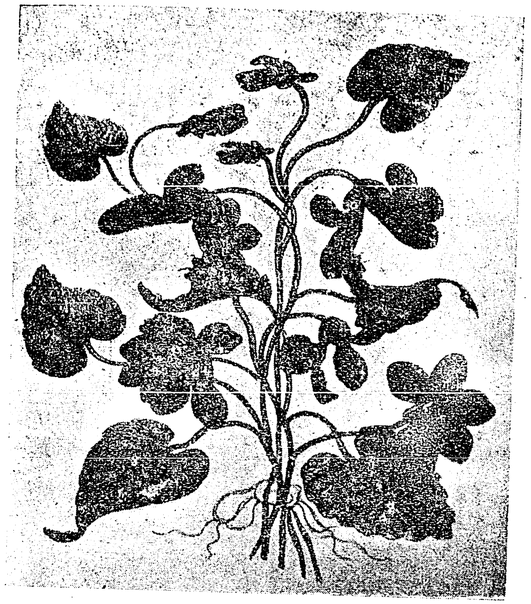

৫ ম চিত্র

৬ষ্ঠ চিত্র

উদ্যত হইয়াছে। প্রথমখানি বহুদিন পূর্ব্বে-"ষ্ট্রাণ্ড্" নামক বিলাতি মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা ইচ্ছাক্রমে

৭ম চিত্র

৮ম চিত্র

ঐ ভাবে অঙ্কিত নহে—আকস্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি একটা গল্পের সাধারণ ছবি মাত্র, দৈবক্রমে ইহাতে এই বিচিত্রতা ঘটিয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ ছবি দুইখানি সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছবি মাত্র, কিন্তু উহাও বিপরীত দিক

হইতে দেখিলে ৩য় খানি ঠিক সোজামতই দেখায় ; ৪র্থ খানি খুব পরিষ্কার না হইলেও যেন মনে হয় একজন চুরুট টানিতেছে।

১ম চিত্র

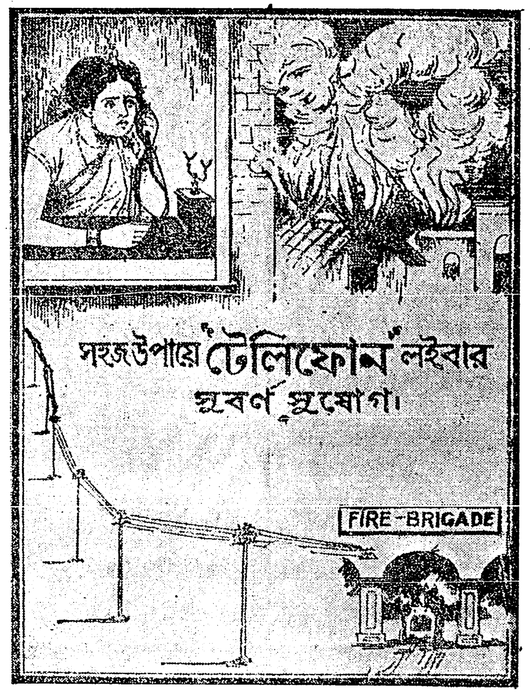

১২ শ চিত্র

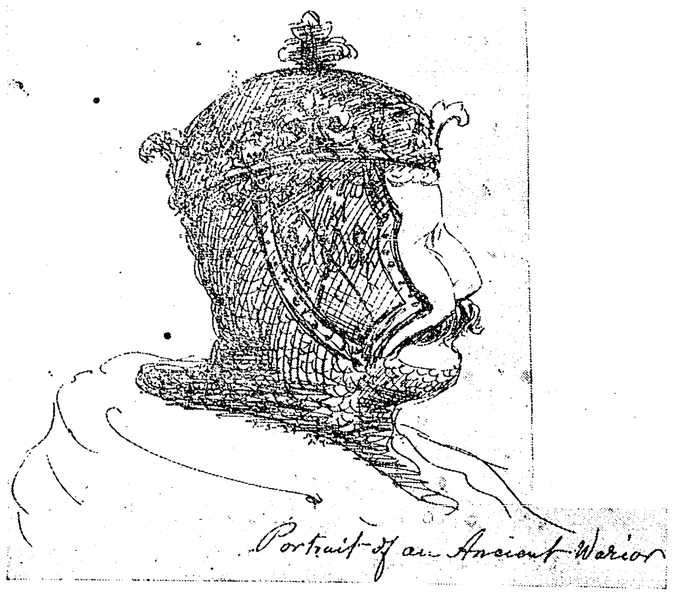

১০ম চিত্র

১৩শ চিত্র

১১শ চিত্র

১৪শ চিত্র

১৬শ চিত্র

১৭শ চিত্র

কোন ছবির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা গোপন ভাবে এমন নিপুণতা সহকারে অন্য ছবির সন্নিবেশ দেখা যায়, যাহা দেখিলে শিল্পীর ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক ছবি তিনখানি সাধারণ দৃষ্টিতে তিনটি

১৫শ চিত্র

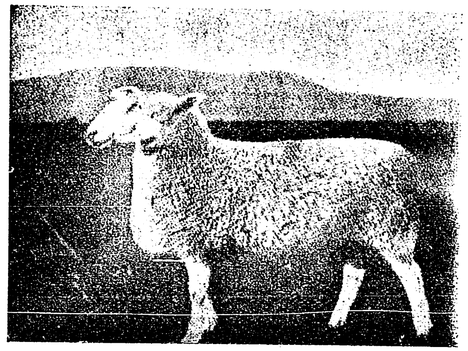

১৮শ চিত্র

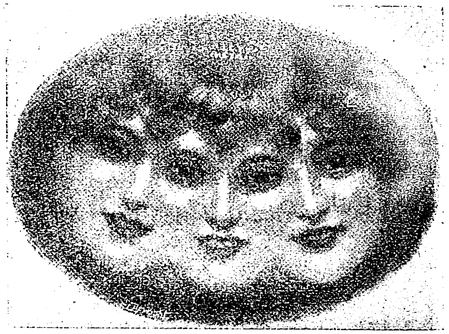

২০শ চিত্র

২১শ চিত্র

বিভিন্ন জাতীয় পুষ্পলতা-গুচ্ছ মাত্র। উহার মধ্যে ছয়টি নেপোলিয়নের মুখাবয়ব ও দুইটী তৎপত্নী জোসেফিনের মুখের ছবি এমন সুকৌশলে অঙ্কিত আছে, যাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নেপোলিয়নের সমাধি নামক ৮ ও ৯ সংখ্যক ছবি দুইখানিতে বৃক্ষ যুগলের মধ্যে নেপোলিয়নের পূর্ণ মূর্ত্তি দুইটিও অতি সুন্দর] ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

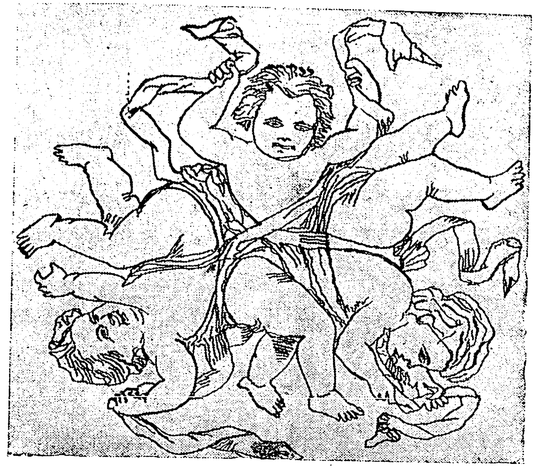

১৯শ চিত্র

২২শ চিত্র

২৪শ চিত্র

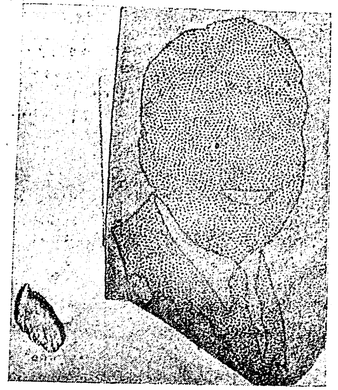

২৫শ চিত্র

১০ম চিত্র একটি প্রাচীন কালের সৈনিকের ছবি। উহার মধ্যে অলক্ষ্যে রমণী মূর্ত্তিটি চিত্রকরের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ১১শ ছবিখানি একটি বৃদ্ধের ছবি।

২৩শ চিত্র

উহার মধ্যে একটি যুবতী, একটি বালক ও একটি সিংহমূর্ত্তি অতি কৌশলের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

১২শ, ১৩শ ও ১৪শ চিত্রগুলি সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছবি। ইহার প্রথম খানিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ভিতর হইতে একটি মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে মনে হয়। দ্বিতীয় খানি একটি সাহেবের মুখ, উহার দক্ষিণ গণ্ডের স্বাভাবিক শেড্‌টি একটি সারসের মত দেখাইতেছে। ১৪শ খানিতে সামান্য একটু আঁচড় দেওয়ায় রমণীর মস্তকোপরি একটি বকের ছবি হইয়াছে। ১৫শ চিত্রে কেদারার হাতলের সম্মুখে যে মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহা ফটোতে স্বাভাবিক ভাবে আলো ও ছায়ার সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছে।

২৬শ চিত্র

২৭শ চিত্র

আলোক-চিত্রের মধ্যেও চেষ্টা করিলে বিচিত্র ফটো প্রস্তুত হইতে পারে। ১৬ ও ১৭ সংখ্যক ছবি দুইখানি তাহারই উদাহরণ। ১৮শ চিত্রে যে দুই মুণ্ড বিশিষ্ট ভেড়া দেখা যায়, উহা প্রকৃত পক্ষে দুই মুণ্ড বিশিষ্ট ভেড়ার ছবি নহে। চিত্র গ্রহণকালে ভেড়াটির মুণ্ড সঞ্চালনের ফলে দৈবক্রমে এরূপ ছবি হইয়া গিয়াছে।

১৯ সংখ্যক হস্তাঙ্কিত পরিচিত ছবিখানি বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক। উহাতে তিনটি শিশুর ছবি চিত্রিত আছে, কিন্তু এমনই সুকৌশলে একত্র করিয়া আঁকা

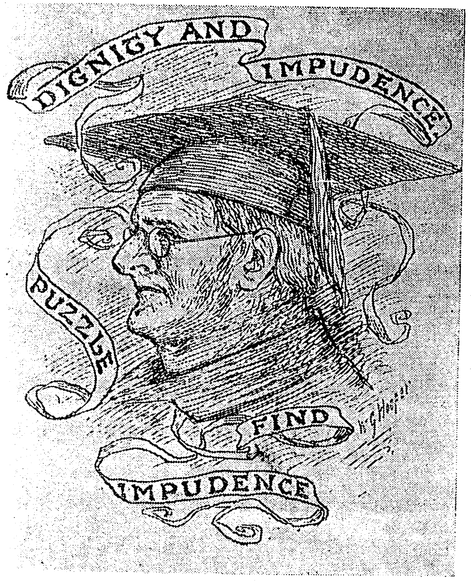

২৮শ চিত্র

হইয়াছে, যে বিভিন্ন ভাবে দেখিলে সাতটি শিশু দেখা যায়। এইরূপ ২০শ চিত্রে মাত্র চারিটি চক্ষু অঙ্কিত আছে, কিন্তু তাহাতেই দ্বিচক্ষু বিশিষ্ট তিনটি সুন্দর মুখ বুঝাইতেছে। এই প্রকার ঘোড়া খরগোস প্রভৃতির ছবিও দেখা যায়।

বর্ণমালার অক্ষর সংযোগে যেমন মানুষের ছবি আঁকার খেয়াল দৃষ্ট হয়, তেমনি কেবল জীবজন্তুর দ্বারাও লেখা হইতে পারে। ২১ সংখ্যক ছবি খানিতে কতিপয় পাঁকাল মৎস্যের ন্যায় মৎস্য, এমন বিচিত্র ভাবে চিত্রিত করা আছে, যাহাতে ইংরাজি "correspondence" কথাটি পড়া যায়।

২২ এর খানি একটি সাধারণ বিজ্ঞাপনের ছবি। উহার

২৯শ চিত্র

৩০শ চিত্র

বিষয় হইতেছে প্রসাধনরতা একটি সুকেশা রমণী। অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় যে, স্ত্রীলোকটি একটি ছোট

কুকুর বা বিড়ালকে দুই হস্তে আদর করিতেছে। ২৩ সংখ্যক ছবিখানি কতকটা বিপরীত ভাবের। ইহাতে একটি মানুষকে এমন করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলেই মেষ-পালের মধ্যে একটি মেষ বলিয়া ভ্রম হয়। আবার চিত্রকরের খেয়ালে এমন বিকৃত করিয়া ছবি অঙ্কিত হয়, সহজ দৃষ্টিতে যাহা একটা হিজিবিজি মনে হইলেও, বিশেষ প্রকারে দেখিলে সুন্দর জীবচিত্র পরিদৃষ্ট হয়। ২৪ সংখ্যক ছবিখানি এই শ্রেণীর। উহা চক্ষের সহিত

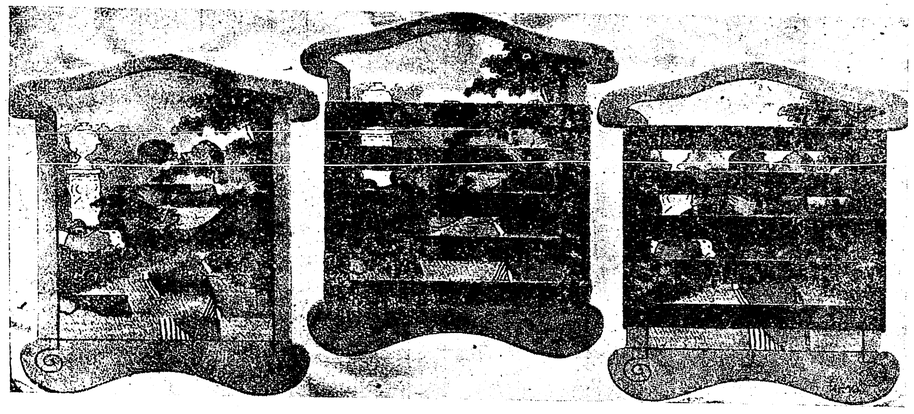

৩১শ চিত্র

ঠিক সমান্তরাল করিয়া দেখিলে একটি বিড়াল ও একটি পাখীর ছবি দেখা যায়।

২৫ সংখ্যক ছবিখানি অতি সামান্য একটি রেখা-চিত্র মাত্র। ইহাতে চিত্রকরের যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহাতে মুখমণ্ডলের মধ্যে মুখ-বিবর ভিন্ন আর কিছুই আঁকা না থাকিলেও, উহা দেখিবামাত্রই মনে হয় যে একটি লোক হাসিতেছে। চিত্রের উপর কল্পনার প্রভাব কতটা, তাহা এই সামান্য ছবিখানি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

২৬, ২৭ ও ২৮ সংখ্যক ছবিগুলিতেও চিত্রকরের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পায়। এইগুলির সবই মানুষের মুখ। ইহাদের উল্টাইয়া ধরিলেও আর একটি করিয়া মানুষের মুখ দেখা যায়। প্রথম দুইখানি নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি। শেষখানিতে এক দিকে একটি সম্ভ্রান্ত লোকের এবং অপর দিকে এক লজ্জাহীনের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ তিনখানিই মানুষের চেষ্টায় অঙ্কিত, কিন্তু ২৯ সংখ্যক খানি আরও বিচিত্র। উহা ফটোগ্রাফের কাচে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিফলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা—অন্য মুখটিও কতকটা মূলের অনুরূপ। ৩০ সংখ্যক ছবিখানি একটি মানুষের মুখ ও উহার ছায়া। কিন্তু উহা এমনই স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, বিপরীত দিক হইতে দেখিলে চক্ষুর নীচে পর্য্যন্ত আর একটি মুখ দেখা যায়।

৩১ সংখ্যক ছবিখানি আর এক খেয়ালের উদাহরণ। উহা ঠিক কিসের ছবি, তাহা প্রথম দেখিয়া বেশ বুঝা যায় না। উহার অংশ-বিশেষ চাপা পড়িয়া দুই খানি কেমন সুন্দর ছবিতে পরিণত হয়, তাহা মধ্যের ও দক্ষিণ পার্শ্বের খানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার মুস্‌লিম্ নারী

মুহম্মদ অব্‌দুল্লাহ্

মুস্‌লিম্ নারীর জন্য শাস্ত্রকার যে সকল মতামত দিয়াছেন, পরবর্ত্তী এক প্রবন্ধে তাহা মোটামুটি ভাবে দেখান হইয়াছে। এবার সাধারণ ভাবে, সামাজিক জীবনে বাংলাদেশের মুস্‌লিম্ নারীর অধিকার ও অবস্থা কিরূপ, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাংলাদেশে মুস্‌লিম্ নারীর অবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয়, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শাস্ত্রকার জ্ঞানী, তিনি নিজের কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন করেন; কিন্তু যাহাদের জন্য শাস্ত্র রচিত হয়, তাহারা তাঁহার মত জ্ঞানী নহে। যাহাদের বিবেক পরিপক্ক, তাহারা নিজেদের বিবেচনা মত কাজ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা প্রায় থাকে না; কিন্তু কাঁচা বুদ্ধি লইয়াও যাহারা শাস্ত্র মানিয়া চলিতে নারাজ, তাহারাই নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। বাংলার মুস্‌লিম্ সমাজের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তি খুব কম, শাস্ত্রার্থ তাহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার লোকেরও অভাব। কাজেই তাহাদের ভুল পথে চলা নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। রান্নাবাড়া করা ও সন্তানের জননী হওয়াই এখন এ দেশে সাধারণ মুস্‌লিম্ রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য; এবং শুধু এই কর্ত্তব্য পালন করিয়াই তাহারা জীবনের পর জীবন কাটাইয়া দিতেছে। একটিবারও বুঝি তাহাদের মনে এই চিন্তা জাগে না যে, তাহারাও সকলের মত মনুষ্যের জন্ম লইয়া দুনিয়ায় আসিয়া থাকে; এবং মানব-জীবনের কর্ত্তব্য এর চেয়েও অনেক বড়। কিন্তু চিরকালই কি এই সকল মানব-জীবন, নারী-জন্ম বেদনাবিহীন ব্যর্থতার মধ্যে দিয়াই জগতের কাজ শেষ করিতে থাকিবে? অমূল্য নারী-জীবন কি চিরকালই এই ভাবে—স্ফূরিত ও বিকশিত হইবার সুযোগ না পাইয়া, একটির পর একটি করিয়া নিরানন্দ জগৎ হইতে ঝরিয়া পড়িবে?

বাংলাদেশে মুস্‌লিম্ সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজে শিক্ষার বিস্তার অনেক বেশী। সংখ্যার অনুপাতে হিন্দু নারী মুস্‌লিম্ নারী অপেক্ষা ঢের বেশী শিক্ষিতা। মুস্‌লিম্‌গণ সংখ্যায় হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক; কিন্তু তবুও তাহারা যে সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে হিন্দুদের সমান নহে, তাহার কারণ, তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের সমান শিক্ষার অভাব। পুরুষদের হিসাবে হিন্দুসমাজ শিক্ষার দিক্ দিয়া মুস্‌লিম্ সমাজকে ছাড়াইয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, মেয়েদের হিসাবে তাহা হইতেও অনেক বেশী। ১৯২১ সালের আদম শুমারীর হিসাবে বাংলাদেশে লেখাপড়া জানা মেয়ের সংখ্যা মোট ৪০৭৮৩১। পাঁচ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের লেখাপড়া-জানা নারীর সংখ্যা হাজারকরা ২১ জন। তার মধ্যে হাজারকরা হিন্দুনারীর সংখ্যা ৩৬ জন ও মুস্‌লিম্ নারীর সংখ্যা ৬ জন। আবার সকল বয়সের গড় ধরিলে

হিন্দুনারীর সংখ্যা হয় হাজারে ১৪ এবং মুস্‌লিম্ নারীর ৭ অর্থাৎ তাহার অর্দ্ধেক। প্রাইমারী ইস্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে মুস্‌লিম্ বালিকার সংখ্যা যেমন দেখা যায়, হিন্দু সমাজের সহিত তুলনা করিয়া সেজন্য বেশী আক্ষেপ করা চলে না। কিন্তু এই সকল বালিকার শিক্ষা হিন্দু বালিকাদের মত বেশী দূর অগ্রসর হয় না কেন? মুস্‌লিম্ সমাজের অর্থকষ্টই কি কেবল সে জন্য দায়ী?

হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুস্‌লিম্ সমাজে আর্থিক অভাবের তীব্রতা অধিক, এ কথা মানি। কিন্তু তাহাই যদি স্ত্রীশিক্ষার পথের কণ্টক হয়, তবে পুরুষের শিক্ষায় তাহা সমান অন্তরায় হয় না কেন? অনেক ক্ষেত্রে এই জন্যই নারী পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা বাধা পায় বটে, তবে সকল স্থলে তাহা স্বীকার করিবার যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ পুরুষের শিক্ষার আবশ্যকতা যতটুকু স্বীকার করা হয়, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ততটা স্বীকার করা হয় না। আবার উপযুক্ত শিক্ষালয়ের অভাবও অনেক সময় স্ত্রী-শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সকল সত্ত্বেও মুস্‌লিম্ সমাজে স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বড় অন্তরায় পর্দা সম্বন্ধে তাহাদের অন্ধ কুসংস্কার। দীর্ঘকাল হইতে তাহাদের মধ্যে এই লজ্জাকর ভ্রান্ত বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, কোন রকমে ছাড়া পাইয়া কঠোর অবরোধের বাহিরে গেলেই নারী ভ্রষ্টা হইয়া পড়িবে। মূঢ়তার সীমা আর কোথায় হইতে পারে! হতভাগ্য মুস্‌লিম্ সমাজ, ইহাই কি তোমার শাস্ত্রের অনুশাসন? ইস্‌লামের উদার শাস্ত্র কি কোনো দিন মানুষের ন্যায্য অধিকার খর্ব্ব করিয়া তাহার প্রকৃত উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে? কিন্তু অজ্ঞ মুস্‌লিম্ সমাজের ধারণা আছে, এই কঠোর পর্দার ব্যবস্থাই শাস্ত্রের আদেশ; তাহারা 'ধর্ম-ব্যবসায়ীদের' কাছে এই কথাই শুনিয়াছে।

মুস্‌লিম্ সমাজের মেয়েরা অল্প বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করিতে পায়। তার পর একটু বড় হইলেই তাহারা স্কুলে যাইবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। দুঃসহ অবরোধের অমঙ্গলকর বোঝা মাথায় লইয়া বিবাহিত হইবার পর তাহারা সংসার ধর্মে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষার কল্যাণের সহিত নারী-জন্মের সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে আমরা ইউনিভর্সিটীর পরীক্ষা পাশ করাকেই শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরিয়া থাকি; ইহাই আমাদের উচ্চশিক্ষার আদর্শ। কিন্তু আজকালও বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুস্‌লিম্ বালিকার নাম সকল বৎসর একটি করিয়াও পাওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী মুস্‌লিমের মেয়ে এম-এ পাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। যতদূর জানা আছে, আজ পর্য্যন্ত ডাক্তারী কলেজেও কোন মুস্‌লিম্ ছাত্রী ভর্ত্তি হন নাই। মেয়েদের জন্য এ সকল শিক্ষা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিতেছি না। আপাততঃ শিক্ষার ব্যবস্থা এইরূপই আছে,—অন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়াই এই কথা বলিতেছি। এ রকম শিক্ষা স্ত্রীজাতির উপযোগী না হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি হিন্দু ছাত্রীগণ তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন? আর ইহা স্ত্রীজাতির উপযোগী নহে বলিয়াই যে মুস্‌লিম্ বালিকারা এ দিকে ঝোঁক দেয় না, এরূপ বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু নাই। শিক্ষার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা বিচার করিবার প্রথম অধিকার তাঁহাদেরই আছে, যাঁহারা সেই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও আশানুরূপ ফল পান নাই; এবং শুধু তাঁহারাই তাহাকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দোষগুলি ধরিয়া দিতে পারেন।

যথেষ্ট লেখাপড়া না জানায় মুস্‌লিম্ মহিলাগণ নিজেদের অভাব অভিযোগ বা অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের জ্ঞান ও কাল্‌চারের পথ সংকীর্ণই থাকিয়া যায়। তাহার ফলে সাধারণ সমাজের জ্ঞানও একচোখোই রহিয়া যায়। ইহাতে সমাজের সামান্য ক্ষতি হয় না। তাহাতে মায়ের কোলে বসিয়া সন্তানের শিক্ষালাভের ও মানসিক পুষ্টির পথ সুগম হইতে না পারায়, সমাজ-শরীর যথেষ্ট স্বাস্থ্য ভোগ করিতে পায় না। দুইটি দিক্ সমান ভাবে বাড়িতে না পাওয়ায়, তাহা নিজেকে একপেশে ও কম-জোর করিতে থাকে।

বাংলার হিন্দু মহিলাগণ কংগ্রেস প্রভৃতি সভা সমিতিতে যোগ দিয়া থাকেন; অনেক কাজের ভার লইয়া যোগ্যতার সহিত তাহা সম্পাদন করেন। ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের মুস্‌লিম্ মহিলাগণও সেরূপ কার্য্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু শুধু বাংলার অভি-

শপ্ত মুস্‌লিমাই সে সুযোগে বঞ্চিত। পর্দার কঠোরতা মুস্‌লিম্ নারীর দেহ-মনের উপর যে বিতৃষ্ণার ছাপ দিয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে মারাত্মক ব্যাধির মতই অনিষ্টকর। এই বিতৃষ্ণা ও অস্বাস্থ্যের ভাব ক্রমশঃ সন্তানের দেহে সংক্রামিত হইয়া ক্ষীণজীবী সমাজকে দিন দিন আরো ক্ষীণ করিতে থাকিবে। সর্ব্বনাশী পর্দা আমাদের উন্নতির অন্তরায় ও ধ্বংসের কারণ হইতেছে; কিন্তু অন্ধ আমরা তাহা দেখিতে বা দেখিয়া তাহার প্রতীকার করিতে কোন চেষ্টাই করিতেছি না। পুরুষ একা চেষ্টা করিয়াও প্রতিকার করিতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে কয়েকজন সুশিক্ষিতা মহিলাকেই বিদ্রোহী হইতে হইবে। এই বিদ্রোহ অচিরে ঘটিতে দেখিব বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি কি? মুস্‌লিম্ নারীর পর্দার জন্য শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট বিধান মানিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সকল অবস্থায় নিজের স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার পুরুষের মত নারীরও আছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—বাংলার মুস্‌লিমার সে অধিকার অক্ষুণ্ণ নাই। এদেশে শিশুমৃত্যুর মত শিশু-বিবাহের সংখ্যাও অত্যধিক। বাংলাদেশে মুস্‌লিম্ সমাজে ইহার প্রভাব বোধ হয় হিন্দু সমাজের চেয়েও বেশী। ইহার ফলে শিশু কনেরা অনেক সময় বিধবা হইয়া থাকে। তাহাদের অনেকেই আবার শৈশব হইতে আমরণ বৈধব্যের অস্বাভাবিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, যদিও শাস্ত্র তাহার তীব্র নিন্দা করে। ইহাতে ব্যভিচারের পথও যে কিছু প্রশস্ত হয় না, এমন কথা বলা যায় না। যাই হোক, এই ব্যবস্থাটা সমাজের শরীফ্ (সম্ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে,—সকল স্তরে ইহা খাটে না; এবং ক্রমশঃই এ প্রথা ক্ষীণ হইতেছে। এই ব্যবস্থাটি আমাদের দেশে হিন্দু-সমাজ হইতে আসিয়াছে। কোন কোন বিধবা শুধু অসঙ্গত সংস্কারের বশে এই ব্যবস্থাকে এত বেশী মানে যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, হিন্দু-সমাজে সহমরণ প্রথা এখনো বজায় থাকিলে, তাহারা স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে নিজের জীবন্ত দেহটাকেও কবরে সমাহিত রাখিতে প্রলুব্ধ হইত। কেবল শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবেই এই সকল মুস্‌লিম্ বিধবার এই দুর্দ্দশা।

বিবাহের সময় কনেদের মত জিজ্ঞাসা করা হয় বটে, কিন্তু বেশী না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাকে মত দিতে বাধ্য করা হয়। তবে সমাজে শাস্ত্রের এই মতটুকু এখনো বাতিল হইয়া যায় নাই যে, কন্যার বিনা অনুমতিতে বিবাহ হইতে পারে না। দরকার হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য স্বামীর মত স্ত্রীরও অধিকার আছে,—এ কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু-সমাজের মত মুস্‌লিম্ সমাজেও আমরা বালিকা বধূর নির্য্যাতন দেখিতে পাই। অথচ বিবাহ-বিচ্ছেদের নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও, সে সকল বধূ স্বামিগৃহের দুঃসহ যন্ত্রণা ও অত্যাচারের উপর নিজেদের দুঃখময় জীবন বিসর্জন দিয়া ক্ষান্ত হয়। তাহারা তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারে না; বরং কেবল অসন্তোষের বোঝা লইয়া আত্মবিনাশের পথেই অগ্রসর হয়। এ অবস্থাতেও যে তাহারা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে না, তাহার কারণ শিক্ষা ও সাহসের অভাব; এবং সমাজের ভয় ও পরমুখাপেক্ষিতা তাহাদের হৃদয়ে সে বল জাগাইতে পারে না।

বাংলার মুস্‌লিম্ সমাজ যে দুরবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে, হিন্দু সমাজও তাহা হইতে একেবারে মুক্ত নয়। হিন্দু সমাজেও পর্দা আছে, কিন্তু তাহার কড়াকড়ি মুস্‌লিম্ সমাজের মত নয়। হিন্দু নারীর সামাজিক অবস্থা যে কোন কোন বিষয়ে মুস্‌লিম্ নারীর চেয়ে ভাল, তাহার কারণ, গত শতাব্দীতে যে সংস্কারের ঢেউ আসিয়া হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে, মুস্‌লিম্ সমাজে তাহা আসে নাই। বাংলার নবাবী হাতছাড়া হইবার পর হইতে মুস্‌লিম্ হৃদয়ে যে জড়তা দেখা দিয়াছিল, তাহা বহুকাল ধরিয়া তাহার মৌলিক চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে দেয় নাই; হিন্দুর উন্নতি-প্রচেষ্টার কোলাহলও তাহাকে জাগাইতে সমর্থ হয় নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের মৌলিক প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বল ছিল অসাধারণ। হিন্দু সমাজের সংস্কার শুধু তাঁহার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। বারুদ প্রস্তুত ছিল, কেবল আগুনের অপেক্ষা। গাছে যখন প্রথম ফুলটি ফুটে, তাহার আশে পাশে তখন অনেক কুঁড়ি দেখা যায়; প্রথম ফুলটি ঝরিবার সঙ্গে সঙ্গে

সেগুলিও ফুটন্ত ফুলের সুবাসে সকলকে মাতাইয়া তুলে। রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গেই কেশবচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব সেই ভাবেই হইয়াছিল। তাঁহাদেরই সাধনার ফল ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের লোকসংখ্যা অতি সামান্য হইলেও বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মদের প্রভাব বড় অল্প নহে। ব্রাহ্ম নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বঙ্গনারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই সংস্কারের তুফান শুধু ব্রাহ্ম সমাজ গড়িয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—হিন্দু সমাজের উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। সেই প্রভাবের ফলেই আজ হিন্দু সমাজ মুস্‌লিম্ সমাজকে এতটা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছে। একটি সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজে যোগ দিতে হইলে অনেকখানি মনের বল ও বুকের পাটা দেখাইতে হয়; সকল লোক তাহা পারে না। হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া অনেকে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেকে ব্রাহ্ম মত ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষা লইবার সাহস পান নাই। তাঁহারা হিন্দু সমাজেই থাকিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে থাকিয়াই অনেক নূতন মত দরকার মত কাজে লাগাইয়া নিজেদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। এই ভাবেই হিন্দুনারীর শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার মূলে রামমোহন প্রভৃতির সংস্কার। ইহা বাংলার রেনেসাঁস্।

কিন্তু এই রেনেসাঁসের প্রধান বিষয় ছিল ধর্ম্ম। কাজেই বাংলার অর্দ্ধেক লোক,—মুস্‌লিম্ সমাজ ইহা হইতে কোন উপকার পায় নাই। এই সংস্কারের ক্ষেত্র ছিল হিন্দু সমাজ, তাই এই বিপ্লবটার সকল বিষয় হইতেই মুস্‌লিম্ সমাজ দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের জড় প্রকৃতি তাহাদের বুঝিতে দেয় নাই যে, তাহারাও এই সমাজ-বিপ্লব হইতে কিছু সামাজিক উপকার পাইতে পারিত। তাই এতকাল তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল। এমনি করিয়া তাহারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও সুফল ভোগ করিতে পারে নাই। ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের অন্ধতা তাহাদিগকে মূঢ়তারই পথ দেখাইয়া আসিয়াছে। মুস্‌লিম্ পুরুষেরই এই অবস্থা,—সুতরাং নারীর উন্নতির আশা কোথায়?

আবার অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ সারা দেশটার মধ্যে জাগরণের একটা বিপুল সাড়া আনিয়া দিয়াছে। এ আন্দোলনের দেহটা আর নাই, তবে প্রাণটা সাধারণের চোখের আড়ালে এখনো নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। এই দেহের অভাবে এখন প্রায় সকল নেতাই নিজ নিজ সমাজের উন্নতির জন্য মন দিয়াছেন। যদি সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই কাজ করা হয়, তবে অল্প পরিশ্রমেই অধিক মজুরী মিলিতে পারিবে। কিন্তু নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য যদি সবিশেষ চেষ্টা না করা হয়, তবে সমাজের উন্নতি আরো কিছুকাল স্থগিত থাকিতে বাধ্য হইবে। বাংলার মুস্‌লিম্ নারীর উন্নতির আশা এইবার করা যায়,—সমাজের ঘুমঘোর বোধ করি অনেকটা কাটিয়াছে। কিন্তু পর্দার অনুচিত কঠোরতা অপসারিত করা প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

বাংলার মুস্‌লিম্ সমাজ নারীর প্রতি যে সকল অনাচারের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে তাহার নিজেরই ক্ষতি। এই সকল অনাচারের জন্য প্রধানতঃ তথাকথিত শরীফ্‌রাই দায়ী। তাঁহাদের ফাঁকা শরাফৎ (সম্ভ্রম) সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক। পর্দার এত কঠোরতা ভারতের বাহিরে অন্য কোন দেশের মুস্‌লিম্ সমাজে নাই। এখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত—কিসে আমাদের মঙ্গল হয়। তার পর শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া প্রয়োজন মত তাহা কাজে পরিণত করা কর্ত্তব্য। কাজটা কঠিন বটে,—ইহাতে ত্যাগের প্রয়োজন বিলক্ষণ এবং কার্য্যক্ষেত্রে বাধাও অনেক আছে; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে কাজ চিরকাল অসম্পন্নই থাকিয়া যাইবে? সমাজের এ অবস্থাতেও বোধ হয় বাংলাদেশে এমন মুস্‌লিম্ নারীর একেবারেই অভাব হইবে না, যাঁহারা যথেষ্ট শিক্ষার সহিত ত্যাগ ও নির্ভীকতার আশ্রয়ে থাকিয়া, এই সকল সমাজ-ধ্বংসী প্রথার প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহাদের কাজে সহায়তার জন্য উপযুক্ত পুরুষেরাও আত্মপ্রকাশ করিতে ভীত বা বিরত থাকিবেন না বলিয়া আশা করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, এরূপ নিয়ম ভাঙ্গা বিদ্রোহের জন্য প্রধানতঃ যৌবন-জলের তরঙ্গ চাই; কেন না বার্দ্ধক্যের পুরাতন সংস্কার ও গোঁড়ামি প্রায়ই এরকম চেষ্টার কণ্ঠরোধ করিতেই অগ্রসর হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনদের সৎপরামর্শ ভক্তিভরে সুযুক্তির সহিত গ্রহণ করা উচিত।

সব জিনিসেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে, আমাদের পৃথিবীও তাহার পুরান খোলস ছাড়িয়া নূতনের সন্ধানে ফিরিতেছে। এখন দুনিয়ার গতি প্রজ্ঞার উন্নতি চায়; মহাসমরের সূচনা হইতেই এই লক্ষণটি অতি স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। এই স্বাভাবিক গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। যাহারা সেজন্য চেষ্টা করে, তাহারা শুধু নৈরাশ্য ও বিফলতার গ্লানি লইয়া ফিরিয়া আসে; এবং তখন আর প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে না পারিয়া, মিছামিছি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া, কেবল লাঞ্ছনার পাত্র হয়। মুস্‌লিম্ নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আমরা যাহা চাই, তাহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে না; তাহা তের শত বৎসর আগেকার শাস্ত্রের পুরাতন ভাবের নব আবিষ্কার মাত্র। তবে সে আবিষ্কার অবশ্যই সময়োচিত পোষাকে সাজিয়া আসিবে। এই প্রস্তাব যে কিছুমাত্র অসঙ্গত ও অযৌক্তিক নহে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ মুস্‌লিম্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখনো যদি সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ নারী সমাজের মধ্যে, নড়াচড়ার কোন সাড়াশব্দ না পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, অল্-কুর্‌আনের এই বাণী বিশেষ করিয়া আমাদেরই উদ্দেশে বলা হইয়াছে;—"তাহাদের হৃদয় থাকিতেও তাহারা বুঝে না, চোখ থাকিতেও দেখে না এবং কাণ থাকিতেও শোনে না; তাহারা পশুর মত, বরং আরো ভ্রান্ত; ইহারাই অমনোযোগী।" (৭ অধ্যায়, ১৭৯ শ্লোক।) এবং "মূক, বধির ও অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।" (২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।)

কান্না-বিলাসী

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের বনের গহন পথের
সে এক উদাসী;
বাজিয়ে চলে ব্যথার বাঁশী
করুণ হুতাশি!

হিয়ার পাষাণ কুরে কুরে
কোন্ লিপি সে লিখতে সুরে—
আঁখির পাতা ভিজিয়ে চাহে
কান্না-বিলাসী;
আদ্যিকালের কি প্রণয়ী
আস্‌তেছে সে বেদন বহি'
আমার লাগি—কাঁদন-ঝরা
দূরের প্রবাসী!

মনের বনের গহন পথের
পথিক উদাসী!

ও তার বিলিয়ে দেবার আপনাকে
বুঝতে নারি সহজটাকে
শেষটাকে কি জয় করে সে
বেড়ায় উলাসি;
ও তার, সজল-চাওয়া বাসি ভাল
মিষ্টি তাতে প্রাণের আলো—
দীপ জ্বালি' তাই দুয়ার খুলে
বসি—প্রত্যাশী;
মোর আসবে কখন গহন রাতের
পথিক উদাসী!

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৬)

বেলা এখনও বোধ হয় ঘণ্টা খানেক আছে,—শিবগঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। দৃশ্যটি মনোরম, যেন প্রকাণ্ড একখানি ফ্রেমে বাঁধা আরসি। তাহার বক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষাবলীর প্রতিবিম্ব পড়ায় এবং সোপানের প্রান্তোপরি একটি সুদৃশ্য রাজধর্ম্মশালা থাকায়, তাহাদের ছায়া প'ড়ে শিবগঙ্গা যেন একখানি ছবির মতই দেখাইতেছিল। সংসার-কোলাহলের বাহিরে ইহা স্বতঃই শান্তি আনিয়া দেয়। মনে হয়—এমন সব স্থান থাকিতে সহরের সহস্র চাঞ্চল্যকে মানুষ কি সুখে বরণ করিয়া নিজেদের অশান্তির ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলিয়াছে। কিন্তু জীবন-যাত্রা বলিয়া জিনিষটা মনে পড়িলে এ মোহ ভাঙিয়া যায়।

হঠাৎ একটি সুগভীর শ্বাস মোচনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-স্পর্শী সুরে "গুরুদেব" শব্দটি আমার প্রাণে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহ-মনকে করুণ আঘাতে সেই দিকে ফিরাইয়া দিল। দেখি একটি সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনত নেত্রে চিন্তার প্রতিমূর্ত্তি রূপে মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পরক্ষণেই আমাদের পরিচিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজী দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কোন চিন্তা রাখবেন না বাবা, মায়ের কাছে আমি নিজে উপস্থিত থাকব', ভয়ের কোন কারণ নেই। বাবার কাছে আরও কত লোক হত্যা দিয়ে রয়েছে,—তিনি সকলেরই কামনা পূর্ণ করেন।"

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বেশ নিবিষ্টভাবে দেখিয়া শেষে বলিলেন, "বাবা, তুমি কে,—তোমাকে তো পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই; তোমার সহৃদয়তা আমার অর্দ্ধেক ভাবনা লাঘব করে দিয়েছে।"

পাণ্ডাজী বলিলেন,—"বাবা আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমাদের তিন পুরুষ এই স্থানে কেটেছে—তাই আমাকে এই রকম দেখছেন। আমরা বাবার সেবক, আপনাকে বড় কাতর দেখে ছুটে এলুম। আপনি মায়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি মাকে দেখব।"

এই কয়েক দিন মধ্যে পাণ্ডাজিকে আমি যতই দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে; তিনি "বাঙ্গালী" শুনিয়া আজ একটা গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিলাম। আমার মনটা আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল, "অহো ভগবান, তুমি কোথায় যে কি মাধুরী লুকিয়ে রেখেছ! গর্ব্বিত মূঢ় মানব কেবল আঘাত করিতেই জানে,—দীন জনেরাই যথার্থ ধনী। অসহায় চিন্তাকুল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এইমাত্র পাণ্ডাজী যতটা দিলেন, ততটা সম্পত্তি আমাদের কয়জনের আছে!

ব্রাহ্মণ ছলছল নেত্রে পাণ্ডাজীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি সত্যই ব্রাহ্মণ,—বৈদ্যনাথ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় চললুম।" পাণ্ডাজী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি থাকিতে পারিলাম না, একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে এত কাতর দেখ্‌ছি কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা, আমি বড় বিপদগ্রস্ত, ভগবান কি পাপে যে আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে এত বড় কঠিন শাস্তি দিলেন তা বলতে পারি না। বলতে পারি না-ই বা কেন,—নিজে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়ে—চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হয়ে—বাপ পিতাম' যা করেন নি, তা করতে গেলুম কেন? আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল বাবা;—আমাদের একমাত্র পুত্রকে ইংরাজী পড়তে দিছলুম; কেন দিছলুম তা এখন স্মরণ নেই বাবা। প্রথমতঃ গ্রামের পাঁচজন ভদ্রবাবুরা এ প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন বটে, সেটা আমি কারণ বলে ধরি না, পশ্চাতে নিশ্চয়ই আমাদের একটা লোভ ছিল যা ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। এ সেই পাপের সাজা। কিন্তু ভগবান যে আমাদের এত বড় সাজা দেবেন—ওঃ গুরুদেব!"

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভাবিলাম ছেলেটির নিশ্চয়ই কোনও শক্ত পীড়া, তাই এঁরা বাবার দ্বারে হত্যা

দিতে আসিয়াছেন। বলিলাম "বাবা বৈদ্যনাথের যখন শরণ নিয়েছেন তখন আর দ্বিধা রাখবেন না—মঙ্গলই হবে।"

ব্রাহ্মণ চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আমি যে অপরাধী বাবা;—তবে এই বিদেশে এত অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি পেয়ে আশা হয় বাবা বৈদ্যনাথও আমাকে সদয় হবেন। ছেলেটির গর্ভধারিণী তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বাবার দ্বারে আজ হত্যা দিচ্ছেন; পাড়াগাঁয়ে চিরদিন গৃহ কর্ম্মে আবদ্ধ ছিলেন, কখনো ঘরের বার হননি; ভয় লজ্জা সঙ্কোচ সবই তাঁর অত্যধিক,—আজও কারুর সামনে আমার সঙ্গে কথা কইতে সঙ্কুচিত হন, তাই বাবা তাঁর জন্যেও বড় চিন্তা হচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে ওই দেবতার মত লোকটি আশ্বাস দিয়ে যাওয়ায় তবে বাসায় যেতে পারছি—তা না তো পা উঠছিলনা বাবা।"

বলিলাম, "উনি অতি সজ্জন লোক— দেবতাই বটে; মন্দিরে ওঁর প্রভাবও যথেষ্ট, আপনি ও-চিন্তা আর রাখবেন না। ছেলেটির পীড়াটা কি?"

ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল নেত্রে বলিলেন "শ্যামসুন্দর আমার বরাবরই যেমন পিতৃমাতৃভক্ত তেমনি বাধ্য ও বিনয়ী ছেলে; কলকাতা থেকে লেখাপড়া করছিল। আজ পনেরো ষোল দিন হ'ল মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছে। কিন্তু আমাদের পাপে শ্যামসুন্দরের মাথাটি একটু বিগড়ে গেছে বাবা,—উন্মাদের লক্ষণ,—গুরুদেব!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া চক্ষু মুছিলেন।

বলিলাম, "যদিও সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন দেখে থাকেন, সেটা পরীক্ষার তরে অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, চিন্তা প্রভৃতির জন্যই হয়ে থাকবে, সপ্তাহ খানেক ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করলে বা একবার পুরীতে সমুদ্রের ধারে দিনকতক থেকে এলেই সেরে যাবে;—আর যখন বাবাকে ধরেচেন তখন ত চিন্তাই নেই। আচ্ছা—আপনাদের এরূপ অনুমানের কারণটা কি, পরিবর্ত্তনটা কিসে লক্ষ্য করলেন,—কথা-বার্ত্তায়, ভাবভঙ্গীতে, কি, ব্যবহারে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না বাবা সে সব কিছু নয়, তা হলে তো এত সত্বর গ্রামে এ নিয়ে একটা লজ্জাকর কানাঘুষো সৃষ্টি হ'ত না। আমি বাবা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—রসময় ন্যায়ালঙ্কার,—গ্রামটিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস, সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন,—চতুষ্পাঠীতে এসে বসেন।

শ্যামসুন্দর যেদিন কলকাতা থেকে বাড়ী এল—অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন। এসে সকলেরই পায়ের ধুলো নিলে, সকলকেই যথাযথ প্রণাম করে তবে বাড়ী ঢুকল। হা ভগবান! সকলে কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন—শ্যামসুন্দরের দুদিককার গোঁফ্ আধাআধি কামানো! সেদিন সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, যাবার সময় বলে গেলেন—'আহা এমন ছেলে—নারায়ণ না করুন—আপনি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবেন না।'

"আমি ভেবেছিলুম বাবা—কোনো মেড়ো নাপিতের ভুলচুক। তাঁদের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্র হানলে—আমি অন্ধকার দেখলুম। সত্যইতো—যখন চুল ফিরিয়েছে তখন আয়না সামনে ছিলই,—মুখও দেখেছে; ভুলচুক হলে সবটা কামিয়ে ফেলতে পারত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের সেইটাই তো নিয়ম। তাতে তো আর লজ্জা বা অপমানের কিছু ছিলনা। কিন্তু ওই বিকৃতি সত্ত্বেও ছেলে কি করে এতটা পথ ওই মুখ দেখাতে দেখাতে গ্রামের মধ্য দিয়ে বাড়ী এসে ঢুকল! এতো প্রকৃতিস্থের লক্ষণ নয়—বিশেষ যে শিক্ষিত—জ্ঞানবান। আবার কি না প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে নিজের হাতে ওই কাজটিই করে—হা ভগবান! গোঁফটা ফেলে দিতে বলায় বলে 'ওতে কি হয়েছে',—আর হাসে। যে জ্ঞানবান চক্ষুষ্মান এটা বোঝেনা 'ওতে কি হয়েছে', তাকে কি বলব বল! নীলমণি আচার্য্য বলছিলেন—পাগলা গারদে,—গুরুদেব!" ব্রাহ্মণের সে কি মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস!

একটু সামলাইয়া বলিলেন, "যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলুম বাবা,—তার পরিবর্ত্তে পেলুম একটী পাগল! আজ কি না গ্রাম ও গ্রামান্তরের ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষেরা ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ীর চারিদিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে উঁকি মারছে, কেউ বলছে 'পাশকরা-পাগল দেখে আসি!' ব্রাহ্মণী গোপনে দিনরাত অশ্রু মুছছেন, বউমা ধরাশয্যা নিয়েছেন;—শ্যামসুন্দর নির্ব্বোধের মত বসে বসে হাসছে। তার গর্ভধারিণী কত করে পাগলকালীর বালা আনালেন,—ধারণ করাতে পারলেন না।

"সেদিন শরৎবাবু বললেন, 'ন্যায়ালঙ্কার মশাই কচ্ছেন কি, আর বিলম্ব করবেন না, রোগটি এদেশী রোগ নয়,

তার ওপর আক্রমণটা মস্তিষ্কের পাঁচইঞ্চির মধ্যে হওয়ায় বড়ই আশঙ্কার কথা রয়েছে। হঠাৎ বিকটাকারে প্রকট হতে পারে। শ্যামসুন্দরের জন্যে বাবা বৈদ্যনাথের কাছে হত্যা দেওয়া হোক। দেবতা প্রসন্ন না হলে এ সব রোগ যায় না, 'ডাক্তার বদ্দির কাজ নয়।' শরৎবাবু এ সব বিষয়ে বোঝেন ভাল, তাই বাবার চরণে এসে পড়েছি বাবা, এখন তাঁর কৃপাই ভরসা—গুরুদেব!"

আমি ত একদম অবাক্! কি সর্ব্বনাশ,—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! বাংলা দেশে এমন গ্রামও আছে যেখানে এই অভিনব গোঁপ-শিল্পটা এখনও অপরিজ্ঞাত! এই "ডেয়ার্কির" ষ্টাইলটা বাঙ্গলাদেশে পুরাতন হয়ে ক্রমে একদিক কামিয়ে একদিক মাত্র রাখবার সময় হয়ে এলো, এখনো দেবগ্রামে এর সাড়া পর্য্যন্ত নেই! সে দেশে কি জামাই-ষষ্ঠীও নেই!" বলিলাম, "আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি আপনার কাছে সকল বিষয়েই ছোট; আমি বলছি, বাবার কৃপায় কাল বেলা দশটার মধ্যে আপনারা শান্তি পাবেন, আপনাদের এই মানসিক কষ্ট সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাবে।"

তিনি বলিলেন, "তোমার বাক্য বাবা বৈদ্যনাথ সার্থক করুন; আমি অপরাধী, এতটা আশা কোন্ সাহসে করি। প্রার্থনা করি পুত্র সংস্রবে তুমি সুখী হও।"

বলিলাম, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভগবান আমাকে সে সুখ দিয়েছেন,—আমি অপুত্রক।"

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "এঁ্যা,—উঃ খুব বেঁচে গেছ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবা! এঁ্যা, পুত্র নেই—কি শান্তি!"

ব্রাহ্মণ যে কতটা কষ্টে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা অনুমানের বিষয় হইয়া থাকাই ভাল।

পরে তাঁহার বাসা দেখিয়া ও কাল সকালে নয়টার সময় আসিব বলিয়া আমরা নিজের বাসায় ফিরিলাম।

জয়হরি আমাদের কোন কথাই শোনে নাই; শিবগঙ্গার ধারে বসিয়া মুড়ির চাকৃতি খাইতেছিল—মাছেদেরও খাওয়াইতেছিল। বাসার পথে হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মশাই, উনি রাঙা আলু কেন কিনলেন? কই, তার তো কিছু দেখলুম না।"

আমি প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলাম না, পরে কর্ত্তার তত্ত্ব ও গবেষণামূলক আলুর দর নির্ণয় ব্যাপারটা মনে পড়িল, বলিলাম, "বাড়ীতেই যখন রয়েছে, তাড়াতাড়ি কেন? তুমি যেন প্রশ্নটা তাঁদের কাছে কোরো না।"

কি মুস্কিল, বলে 'ওঁরা যদি ভুলে যান!' বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'ভুলে যান যাবেন, তোমার মাথাব্যথায় কাজ নেই।"

"না, আমি ভাবছিলুম, ওতে কি কি হতে পারে।"

সেই ভাবেই বলিলাম, "ওতে মুখ হেঁট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

জয়হরি বেশ সপ্রতিভের মত সহাস্যে বলিল, "সেত' খাবার সময় হবেই মশায়, কিন্তু—"

আমি চাপা-গলায় "ব্যস্" বলিয়া বাসার রোয়াকে উঠিয়া পড়িলাম।

বেলা নয়টা আন্দাজ ন্যায়ালঙ্কার মশায়ের বাসায় উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, "এসেছ,—বড় ভাল হয়েছে, আমাদের তো মাথার ঠিক নেই বাবা; ব্রাহ্মণীর কথা শুনে কিছু ঠিক করতে পারছি না, বড় বিচলিত হয়েছি। তিনি বলেন—কে যেন তাঁর কানে বললেন—"উঠে যা।" এর অর্থ তো বুঝতে পারছি নে বাবা; এর মানে কি—"অসুখ সেরে গেছে, আর পড়ে থাকতে হবেনা, বাড়ী যা?" দেবতার কথা—কি করে বুঝবো বাবা—এর টীকাই বা করবে কে! এই কষ্ট করে এতদূর এসে শেষ সন্দেহের ওপর ফেরাটা কি ঠিক্ হবে? ভবভূতির পুঁথিও তো এমন শক্ত ঠ্যাকেনি; ভারবীও এমন অর্থ-সঙ্কটে ফেলেন নি, বড় সমস্যায় পড়েছি বাবা।"

বলিলাম—"অত বিচলিত হবেন না—বাবা বৈদ্যনাথ আপনাকে তাঁর কথার অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্যেই এই অধমকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওর অর্থ মুখে বলে বা টীকার দ্বারা বুঝিয়ে আপনার মত পণ্ডিতকে বিশ্বাস করান কঠিন,—তাই প্রমাণ সহ সেটা সুস্পষ্ট দেখিয়ে দেবার আদেশ আমার ওপর হয়েছে, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন।"

* * * *

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়েই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। পোষ্ট অফিসের চিঠি বিলি শেষ হইয়া গেল, ভদ্র বায়ুভুক্‌দের মজলিশ্ ভাঙিল। ওই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমার

সঙ্কেত-মত উভয়েই অবাক্ বিস্ফারিত নেত্রে সতেরোটি অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন! বলিলাম "এই সব দিব্য পুরুষদের মধ্যে—জমীদার, ডাক্তার, ডেপুটী, এমন কি ব্যারিষ্টার সাহেব হইতে মোসাহেব পর্য্যন্ত আছেন,—এখন বাবা বৈদ্যনাথের প্রত্যাদেশের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি? না এঁদের সকলেরই মাথা খারাপ বলতে চান?"

"না বাবা—এখন বলতে চাই—আমারই মাথা খারাপ! কিন্তু কারণ তো বুঝলাম না; আর কোন্ টোলই বা এর বিধান দিয়েছেন?"

বলিলাম—"কারণ নির্ণয় করা কঠিন; বোধ হয় এটা কোনও একজাতীয় কলা, তাই মুখের সঙ্গেই নিকট সম্বন্ধ। এ সব হাওয়ার খেলা, আমাদের সুজলা সুফলা বাঙলায় চট্ করে। উর্ব্বর ভূমির গুণই এই। কোনও টোলের বিধানে এ ভোল আসেনি; এ সম্বন্ধে অত বড় বিশ্ব-বিখ্যাত "অক্সাটোল্" পর্য্যন্ত নীরব। এটা একটা ইভলিউসনি ব্যাপার—দিন কতক থাকবে; এগিয়ে চলাই এর ধারা। ক্রমোন্নতি কল্পে এর পর ডুবতে সুরু হতেও পারে।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। এই সময় ছেঁড়া অনষ্টর গায়ে, খালি পা, চুল ফেরানো, হাতে বাজারের সুদৃশ্য সাজি বা বাস্কেট্,—একটি যুবক window delivery (চিঠি) লইবার জন্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে হাফ্ছুটে হাজির। দেখি তাহারও ন্যাজা-মুড়ো বাদ দেওয়া গোঁফ্! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তমলুকে তার বাড়ী। মস্ত বড় বাবুর রাঁধুনী বামুন। প্রশ্ন করিলাম, "গোঁফের এ দুর্দ্দশা কেন?"

শুনিলাম "খানার সময় বাবুদের বৈঠকে যেতে-আসতে হয়, তাই ছোটবাবুর হুকুম—অসভ্যের মত থাকলে চলবে না। ছোটবাবু তো কেও-কেটা লন্। পাট সাহেবের লিবি (levy) খান্। "লিবি" কি বাবু,—এঁটো?"

বলিলাম—"এঁটো নয়—ঘেঁটো।" সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণকে বলিলাম "আপনার ত' স্বচক্ষে সব দেখাও হ'ল, স্বকর্ণে সব শোনাও হ'ল, এখন ঠাওরাচ্ছেন কি?"

ব্রাহ্মণ চিন্তাকুল ভাবে বলিলেন, "ছেলেটাকে মিথ্যা অনেক পীড়া দেওয়া হয়েছে,—না বুঝে উপযুক্ত ছেলেকে অপমানও করা হয়েছে। এখন সত্বর বাড়ী ফিরে সে সব স্বীকার করাই উচিত। আজই ফিরবো;—সে না অভিমানে একটা কিছু করে বসে;—উঃ কি অন্যায়ই করেছি!" ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

বলিলাম,—"আর বৃথা ভাব্‌বেন না; চারটের মধ্যেই গাড়ী, বাবা বৈদ্যনাথের পূজা দিয়ে সত্বর আহারাদি সেরে প্রস্তুত হয়ে পড়ুন গে।" আমি প্রণাম করিলাম। ব্রাহ্মণ আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "বাবা বৈদ্যনাথ তোমাকে একটি পুত্র দিন। তোমাকে না পেলে আমাদের কি দশাই হ'ত।"

বলিলাম, "আবার এ কি বলছেন, পুত্র কি!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তখন কি মাথায় ঠিক ছিল বাবা! পুত্র সুদুর্লভ জিনিষ,—না হলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা থাকত' না; ওটি চাই বাবা। ওর চেয়ে বড় প্রার্থনা, কি বড় আশীর্ব্বাদ আর নেই। আচ্ছা, তা হলে তোমাদের উচ্চ শিক্ষিত অঞ্চলে মেটে কার্ত্তিকের গোঁফেও এ কলা ফলতে সুরু হয়েছে কি বাবা? কুমোরটুলি কলকেতায় না!"

বুঝিলাম, রসময় ন্যায়ালঙ্কার নিতান্ত বেকায়দায় পড়েই এতক্ষণ বিরস মেরেছিলেন; বলিলাম, "বাঙলা দেশে বোধ হয় শিল্পোন্নতি আসন্ন, তাই এই সৌন্দর্য্যবোধটা দেখা দিয়েছে; এগুলো সাময়িক আপৎকাল মাত্র, তার পরেই নিন্‌না—।

"আমাদের শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র বাবুও বলছেন—"শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশের শিল্পই এমনই এক একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, একটা থেকে একটায় যাবার মুখ্যের পথে এই সব সঙ্কট দেখা দেয়।" ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রানুসারেও এ সময়—অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতং;—নয় কি?"

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, চিরসুখী হও। তোমাকে পাবার মত লাভ আমার কোন দিন ঘটেনি। দুঃখ এই—এখনি হারাতে হবে,—শ্যামসুন্দরকে ছাখবার জন্যে ভেতরটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বাবা।"

তাঁহাদের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া প্রণামান্তে ফিরিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি—মানুষ অবস্থার দাস না

হইলে জগতে বৈচিত্র্য বলিয়া কথাটা একটা কথার-কথা হইয়া অভিধানের মধ্যে আত্মহত্যা করিত। সে নানা অবস্থায় জগৎটাকে নানারূপে উপলব্ধি করায় বলিয়াই বৈচিত্র্য।

কানে আসিল "এই যে আপনি!" চাহিয়া দেখি—জয়হরি। সে বলিল, "আপনার জন্যে বসে বসে শেষ ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে দু-কাপ্ চা-ই খেতে হ'ল।" বলিলাম "তাইত, বড় কষ্ট দিয়েছি ত! অনুপানগুলো থাকলেই হবে, তার ত' ঠাণ্ডা হবার ভয় নেই।"

"ভয় নেই কি মশায়! ওঁরা যে আজ এক রেকাবী গরম গরম সিঙাড়া দিছ্লেন, ভেতরে বাদাম আর পেস্তার পুর ছিল। খেতে যা হয়েছিল মশাই, একেবারে স্বর্গং! এখন আপশোষ হচ্ছে আপনাকে খাওয়াতে পারলুম না।"

বলিলাম—"বাড়ীতে আর নেই কি? নিশ্চয়ই আছে।"

জয়হরি মাথা নাড়িয়া দুঃখের সুরে জানাইল, "না মশায়, ওইটেই আমার ভুল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবেননা বলে আমি যে সব চেয়ে নিলুম।"

বলিলাম,—"বুদ্ধির কাজই করেছ, ও জিনিষ ঠাণ্ডা খেলে কি আর রক্ষে ছিল!"

জয়হরি ভীতভাবে বলিল, "কেন বলুন দিকি! আমি যে খান দশেক ঠাণ্ডাও খেয়ে ফেলেছি!"

বলিলাম,—"তাতে আর হয়েছে কি? ভেতরে তো গরম জিনিষ পোরা।"

জয়হরি—"তাই বলুন মশাই!"

বলিলাম—"চা-টা ত খেতেই হবে জয়হরি।"

জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল, "চলুন না—বাজারে দোকান মজুদ, মুখ বদলান যাবে।"

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] বংশীধর

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে, ওরে মরণটাকে দেখতি চল!—দ্বিজেন্দ্রলাল

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার কলিকাতা

অন্নচিন্তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

আমাদের ছেলেরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখ্‌ছে, দুতিনটা পাসও দিচ্‌ছে, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সময় অন্ন-চিন্তায় কাতর হয়ে চোখে আঁধার দেখ্‌ছে। শিক্ষিতের সজাতি, শিক্ষিত। কাজেই শিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের দরদ দেখা যাচ্‌ছে। বিজ্ঞজন এদের অবস্থা ভাব্‌ছেন, বেকার-সমস্যা এদেরই জন্য উঠ্যেছে।

কিন্তু এরা বা ক জন! আ-শিক্ষিত ভদ্র গণ্‌লে বেকার ও পেটভাতায় চাকরের দল বিপুল দেখা যাবে। বহু বহু ভদ্র আছেন, যাঁরা বিদ্যামন্দিরে প্রণামী দিতে পারেন নাই, তাঁরা নীরবে অর্ধাশনে দারিদ্র্যপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ছেন। গ্রামবাসী যাঁরা পার্‌ছেন, তাঁরা গাঁ ছেড়ে শহরে যাচ্‌ছেন, বস্ত্রের আবরণে মলিন ও ক্ষীণ দেহ আর ঢাক্‌তে পার্‌ছেন না।

ব্যাপার তুমুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, যারা 'ইতর' নামে খ্যাত, তারাও যে সকলে সুখে আছে, তাও নয়। এরাই দেশের কারু ও কার্মিক। এদের কর্মের অভাব ছিল না; কিন্তু দুর্দৈব এই, বাহির হ'তে লোক না এলে বাঙ্গালা দেশ অচল হয়ে থাক্‌ত। কলিকাতায় পা দিলেই মনে হয়, কলিকাতা বাঙ্গালা দেশ নয়। জেলার শহরে গেলেও দেখি, কায়িক-কর্মে ও শ্রমসহিষ্ণুতায় বাঙ্গালী পরাভূত হচ্‌ছে।

যে সকল কারু ও কার্মিক শহরে ও শহরের কাছে বাস ক'র্‌ছে, তাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল হয়েছে। হয়েছে বটে; কিন্তু সেটা কর্ম-সামর্থ্যের গুণে নয়, অ-বাঙ্গালীর সহিত সংগ্রাম বাধে নাই বল্যে হয়েছে। যেখানে সংগ্রাম বেধ্যেছে, সেখানে বাঙ্গালীকে হঠ্যে আস্‌তে হ'চ্‌ছে। অনেকের রোজগার বেড়্যেছে, কিন্তু স্থিতি হ'চ্‌ছে না। চওড়া ফিন্‌-ফিনা ধুতি ও গেঞ্জি ও কোটে, মদে ও জুয়ায় টাকা উড়ে যাচ্‌ছে। 'হঠাৎ বাবু'র কাঁচা পয়সা সহজে জীর্ণ হয় না। গ্রামে যাদের দুই এক বিঘা চাষ আছে, তারা বরং ভাল। কৃষির উৎপন্নের সঙ্গে বেতন যোগ হয়ে মোট আয় বৃদ্ধি হয়েছে, সঞ্চয়প্রবৃত্তিও আছে। যারা কৃষিজীবী, কৃষিকর্মই এক সম্বল, অভ্যাপাত না ঘ'ট্‌লে, তারাও এক রকম কর্য্যে খাচ্‌ছে। কিন্তু সঞ্চয় নাই বল্যে একটু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, অমনই হাহাকার।

এই সকল 'ইতর' লোকের অবস্থা দেখে হঠাৎ মনে হতে পারে, 'ভদ্র' বেকার-সমস্যার এই ত পূরণ চোখের সাম্‌নে রয়েছে। 'ভদ্রেরা' চাষ করুন না, হাতুড়ী দিয়ে লোহা পিটুন না, মাথায় মোট নিয়ে কুলির কর্ম করুন না। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা ভুল্যে যান ভদ্রেও এই কর্ম ক'র্‌লে ইতরে কি কর্ম ক'র্‌বে? ভদ্রে কতক কর্ম করেন না বল্যেই ইতরের অবস্থা ভাল হয়েছে, কর্মপটুতা হেতু নয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসী অধিকাংশ ভদ্রের জমি আছে, কিন্তু কৃষাণ অভাবে কৃষি হ্রাস হ'চ্‌ছে। যে কৃষিকর্মে পোষায়, তা একজনের কায়িকশ্রমে নয়। তৃতীয়তঃ, 'ভদ্র' তাঁরা, যাঁরা পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রম করেন নাই, এখন ক'র্‌লে সমাজে মান থাকে না, নিন্দা হয়। অনেক উপদেশক কিন্তু এ কথা জেন্যেও কানে তোলেন না, মনে করেন দেশটা বুঝি আমেরিকা, একটু ব'ল্‌বার অপেক্ষায় বস্যে ছিল! যাঁরা অন্নচিন্তায় কাতর, তাঁরা মূর্খ হ'লেও নির্বোধ নন। ঘরের আনাচ-কানাচ হাতড়্যেও কিছু না পেয়ে জড়বুদ্ধি হয়ে পড়্যেছেন।

উচ্চশিক্ষিত বেকারের প্রতিও এই উপদেশ শূন্যে আস্‌ছি। "বাপু হে, চাকরি চাকরি করিও না, চাষ কর, ব্যবসা বাণিজ্য ধর।" কিন্তু চোরা যে ধর্মের কাহিনী শোনে না, সে কি তার দুষ্টামি? দেখ্‌ছি, উপদেশটা হাওয়ায় উড়্যে যাচ্‌ছে! এর অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ, যাঁরা উপদেশ দিচ্‌ছেন, তাঁরা লেখা-পড়া শিখ্যে লেখা-পড়ার কর্মই ক'র্‌ছেন, কখনও ক্ষেতে গিয়ে রোদে

তেতে জলে ভিজ্যে কোদাল ধরেন না, সিন্দুকের মতন দোকানঘরে চটের উপর বসেন না, কিম্বা হাটে হাটে গাঁয়ে গাঁয়ে ধান ও পাটের দর চর্চ্চে বেড়ান না। আমি চাকরি ক'র্‌ব, কিন্তু তুমি ক'র্‌বে না, যেহেতু চাকরি খালি নাই, এই যে যুক্তি সেটা কটূক্তি। তা ছাড়া, লেখা-পড়ার চাকরও ত চাই, নইলে সংসার অচল। চাকরির উমেদারও চাই, নইলে ভাল মন্দ বাছ্‌তে পারা যায় না। বড়লাট সাহেব চাকর, ভারত-সেনাপতিও চাকর; হাইকোর্টের জজ চাকর, আর মুদীর দোকানের কেষ্টাও চাকর। তফাৎ এই, বেতনের ও মানের। বেতনেরও তত নয় মানের যত। কুলীর সর্দারি ক'র্‌লে অনেক রোজগার হয়, কিন্তু মান নাই। মারোআড়া মোটরেই চড়ুন, আর টাকার গদীতেই বসুন, মানীর মান পান না। মান সেখানে, যেখানে প্রভুত্ব আছে, বেতন যতই হ'ক। বাহ্‌বলে বলার্থীর মধ্যে, ধনবলে ধনার্থীর মধ্যে প্রভুত্ব ঘ'ট্‌তে পারে, কিন্তু নৃপত্ব ও বিদ্বত্ব কদাচ তুল্য নয়। লেখাপড়ার কর্ম, বিদ্বানের কর্ম, মানের কর্ম। কেবল ধন উপাস্য নয়; ধন ও প্রাণ অপেক্ষা মান কাম্য। আদালৎ তার সাক্ষী।

এই যে প্রবৃত্তি, মানরক্ষার ও মানবৃদ্ধির ইচ্ছা, এটা বঙ্গদেশ নয়, ভারতখণ্ড নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, বর্বর ও সভ্য, সকল মানুষকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্‌ছে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন কর্য্যে সন্ন্যাসী হ'তে গেলে নূতন কর্য্যে সৃষ্টি ফাঁদ্‌তে হবে। বিলাতে কি অভিজাতি নাই? 'ভদ্র' ও দোকানদারের মানের প্রভেদ নাই? আমেরিকায় প্রেসিডেণ্টের পুত্র মাথায় মোট নিয়ে যেতে পারেন, কারণ সেখানে ব্রাহ্মণ নাই শূদ্র নাই, লাট নাই, লাটীও নাই। কিন্তু এ দেশ ত আমেরিকা নয়। কেবল মাথায় মোট বইবার বেলা আমেরিকা, আর বর্ণাশ্রম-ধর্মের বেলা ভারত? তাই কি ছাই বর্ণাশ্রমধর্ম আছে? বামুনের ছেলেকে আদালতের পেয়াদা হ'তে দেখ্‌লে বুঝি, বর্ণাশ্রমধর্মে দিন চলে না।

এই সুযোগে সমাজসংস্কারপ্রার্থী বলেন, বালাই গেছে, দেশটা পশ্চিমের কাছাকাছি হ'চ্‌ছে। কিন্তু যদি টাকার গরবে বিদ্যার গৌরব ভুল্‌তে হয়, তা হ'লে পশ্চিমের দিকে না গেলেই ভাল ছিল। পশ্চিমের রক্তচ্ছটায় চোখ খর্য্যে গিয়েই ইতর ভদ্র, সবার অন্নচিন্তা দারুণ হয়ে পড়্যেছে। ইস্কুল কলেজের ছেলেদিকে রাখ্‌লাম বিলাতী উদ্যানের মনোহারী নিকুঞ্জে; এখন ব'ল্‌ছি বাইরে এস! শেখালাম বিলাতী মতিগতি; এখন ব'ল্‌ছি, টেরি কাটা, মোজা পরা, বাবু সাজা চ'ল্‌বে না! কায়িক শ্রম, প্রাণধারণের নিমিত্ত কায়িক শ্রম, যাকে চৌদ্দ পনর বছর ক'র্‌তে দিই নাই, সে এখন কেমন কর্য্যে ক'রবে? কাজেই সে বণিকের দোকানে লেখা-পড়ার কাজ ক'র্‌ছে।

আরও কথা আছে। বৃত্তিমাত্রেই পাদবিশিষ্ট। চাকরি একপাদ, একা স্বশরীরে হাজির হ'তে পার্‌লেই বৃত্তি চ'লতে থাকে। আর কোনও বৃত্তি একপাদ নয়। কোনটা দ্বিপাদ, যেমন মহাজনি, ধন ও বুদ্ধি থাক্‌লে ক'র্‌তে পারা যায়; কোনটা ত্রিপাদ, যেমন কৃষি ও বাণিজ্য, ধন জন মন বা বুদ্ধি থাকা চাই। ব্যবসায় (industry), কলা (manufacture) চতুষ্পাদ, ধন জন মন ও সরণী (system) চাই।

আসল কথা এইখানে। বিদ্যাহেতু শিক্ষিতের গৌরব আছে, কিন্তু যে বুদ্ধির কথা ব'ল্‌ছি সে বুদ্ধি নাই। ছবছর বয়স হ'তে বিশ বছর তক যাকে কেবল লিখ্‌তে প'ড়তে শেখালাম, লেখাপড়ার কর্মেরই যোগ্য ক'র্‌লাম; যাকে এই সব বৃত্তির সহিত পরিচিত করাই নাই, যাকে সে বুদ্ধিই দিই নাই, সে সাতার না শিখ্যে কেমন কর্য্যে জলে ঝাঁপ দিতে পা'র্‌বে?

এই অভিযোগ খাড়া কর্য্যে কয়েকজন বিজ্ঞ দোষ দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের। তাঁরা এমন আড্ডা খোলেন কেন, যদি চাকরি জোটাতে না পা'র্‌বেন? যেন গিরিমেণ্ট ছিল ছাত্রদের খোর-পোষের ভার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নিতে হ'বে! ধমকে চমকে কর্ত্তারা কিন্তু ভয় পেলেন; ব'ল্‌লেন ইস্কুলে বৃত্তি শেখানা হবে, কলেজে বাণিজ্য বিদ্যায় ডিগ্রি দেওয়া যাবে। আশ্চর্যের কথা, কেহ ভাব্‌লে না, সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর পেচক প'শলে দুজনের একজনকে পলায়ন ক'র্‌তেই হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল রিদ্যা-প্রতিষ্ঠা। আর, বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, অর্থ উপার্জন। বিদ্যা ও প্রয়োগ-কৌশল এক ত নয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশপথে রেখা-চিত্র

পরীক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না, তাঁরা বৃত্তিশিক্ষার কি পরীক্ষা ক'র্‌বেন, ভেবে পাই না। বসালাম ময়দার কল, এখন লোকের কথায় তাতে শুরকী ভাঙ্গ্‌তে গেলে, না পাব ময়দা, না পাব শুরকী, কলটাই ভেঙ্গে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি শেখাচ্‌ছেন না, তা নয়। উকীলি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারি শেখাচ্‌ছেন। কিন্তু সে নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান আছে, বিপুল অর্থ ব্যয়ও হ'চ্‌ছে। বিশ্ববিদ্যালয় অন্য বৃত্তিও শেখাচ্‌ছেন। লেখা-পড়ার বৃত্তিও বৃত্তি। কেরাণী ও মাষ্টার, হাকিম ও উকীল, পত্রসম্পাদক ও লেখক, লাটের মন্ত্রী ও সভাসদ,—এঁরা আগাছার মতন আপনই জন্মেন নাই।

তথাপি, জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালীর পরাভব দেখ্‌তে পাচ্‌ছি। এই পরাভব দুই প্রকারে দেখ্‌তে পাই। অন্য ভারতীর সহিত প্রতিযোগিতায় যে পরাভব, সেটা স্পষ্ট। আর, অন্নচিন্তায় যে আর্ততা, সেটা অস্পষ্ট। মনে করি যেন, বাঙ্গালী ছাড়া স্বদেশী বিদেশী কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালা দেশে নাই। তা হ'লেই কি বাঙ্গালীর কর্মসামর্থ্য বেড়ে যেত, ধন উপার্জনের শক্তি বাড়্‌ত, না অকাল-মৃত্যু হ'তে রক্ষা পেত, না জীবনকে উৎসবময় কর্য্যে রাখ্‌তে পার্‌ত?

অনেকদিন হ'ল ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন,—

ব্যবসায়ে পটু নহে, সাহসবিহীন।
আলস্যের দাস হয়ে, থাকে চিরদিন॥
সর্ব্বদা ব্যসনে রত, ক্ষীণ কলেবর।
নিয়ত নির্ভর করে, দৈবের উপর॥
অতিশয় ভয়শীল, সদা মরে ত্রাসে।
জন্মভূমি ছেড়ে কভু, না যায় প্রবাসে॥
শ্রমভয়ে অল্পেতে, সন্তোষ হয় মনে।
তাদের মহত্ত্ব লাভ হইবে কেমনে॥

কিন্তু দেখ্‌ছি, অনেক বাঙ্গালী শৌর্যে ও বীর্যে, শ্রমে ও ব্যবসায়ে, ও অন্য বহুবিধ গুণে মহত্ত্ব লাভ কর্য্যেছেন। যখন বাঙ্গালীরই মধ্যে আদর্শ পাচ্‌ছি, তখন উত্থানের সম্ভাব্যতা স্বীকার ক'র্‌তে হবে।

কিন্তু যখন দেখি অগণ্য বাঙ্গালী আদর্শের ধার দিয়াও যায় না, বহু দূরে পড়্যে আছে, তখনই মনে চিন্তা হয়, দোষ স্বভাবজ হয়ে গেছে, নানা দিকে নানা প্রতীকার চিন্তা ক'র্‌তে হবে, গোরু-হারালে-গোরু-পাওয়া-যায় মার্কা-মারা ওষুধের সাধ্য নয়। এই দোষ গ্রাম্যজনের চোখও এড়ায় নাই। তারা বলে, বাঙ্গালী তালপাতার সিপাই, বাতাসে হেলে, সোজা দাঁড়াতে পারে না। যদি দৈবক্রমে আগুনের ফুল্‌কি গায়ে পড়ে, অমনই দাউ-দাউ কর্য্যে জ্বল্যে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, তালপাতার আগুন থাকে না।

আমরা তাল-পাতা বটি, তেল জল মাখিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে মন্দ দেখাই না। কিন্তু মেষ নই, আজ্ঞানুগামিতা আমাদের কোষ্ঠীতে নাই। যদি সংহতি-শক্তি থাক্‌ত, তা হ'লে এই তাল-পাতা অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পার্‌ত, মদমত্ত হাতীকেও ধর্‌তে পার্‌ত।

এই যে বাঙ্গালী প্রকৃতি, এর গোড়া কোথায়? যখন দেখি, শিক্ষিত বাঙ্গালী এই বিপুল ধরিত্রীতে কমক্ষেত্র খুজ্যে পান না, স্ব-স্থ হ'তে পারেন না, এক মুঠা অন্নের তরে ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ঘুর্য্যে বেড়াচ্‌ছেন, তখন বুঝি মনের বোঝা নিজের বাঁধা, কর্ম করবার সামর্থ্য নাই, নিজের সামর্থ্যে বিশ্বাস নাই। অতএব কর্ম-সামর্থ্য বাড়াতে হবে, বিশ্বাস জন্মাতে হবে। যে কায়িক শ্রমে পরাভূত হয়, সে মানসিক শ্রমেও পরাভূত হয়, মন বইতে চাইলেও শরীর বইতে চায় না, একাগ্রতা থাকে না, বহুকালব্যাপী কর্ম সাধ্য হয় না।

এই অবস্থার তিন কারণ মনে হয়। (১) দেশজ, (২) জন্মজ, (৩) উপার্জিত। এই কারণত্রয় প্রতিপন্ন ক'র্‌তে হ'লে অনেক কথা ব'ল্‌তে হয়। এখানে সংক্ষেপে সার্‌ছি।

দেশ ব'ল্‌তে জলবায়ু সম্বলিত ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে মানুষ বাস করে, তার প্রভাব মানুষের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। জঙ্গলদেশের মানুষ দারুণ হয়, পাহাড়্যে দেশের মানুষ শ্রমপটু হয়, উষ্ণ ও আর্দ্রদেশের মানুষ অলস হয়, ইত্যাদি। বাঙ্গালী চরিত্রের সুকুমার ভাব যে দেশের গুণে স্থায়ী হয়ে আছে, তাও স্বীকার ক'র্‌তে হবে। প্রাচীনকালের আর্যেরা সেকালের বাঙ্গালীকে বিহঙ্গম বল্যে গেছেন। কি দেখ্যে বল্যেছিলেন, কে জানে। হয়ত লঘুগতি ক্ষীণদেহ দেখ্যেছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ, জন্মজ। পিতামাতার ও পূর্বপুরুষের

দোষগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়। আমাদের প্রাচীন মনস্বীরা এই দেখ্যে সু-জন সৃজনের জন্য যে কত দিক ভেবেছিলেন, তা স্মরণ কর্‌লে আধুনিক পাশ্চাত্য সু-জন্য বিদ্যাকে মাথা নোয়াতে হবে। কিন্তু তাঁদের উপদেশ কেহ শুন্‌লে না মান্‌লে না। পশ্চিমদেশেও শুন্‌ছে না মান্‌ছে না। লোকে বুঝ্‌লে, সকলকে বিবাহ কর্‌তেই হবে, নইলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ। বুঝলে না যে-সে পুত্র দ্বারা নরক হ'তে ত্রাণ হয় না। তাঁরা চারি বর্ণ দেখ্যে চারি বর্ণ স্বীকার কর্যে গেলেন। পরে ঘট্‌ল, চারি বর্ণের চারি কুড়ি জাতিভাগ, চারি কুড়ির চারি কুড়ি 'ঘর' ভাগ। তাঁরা ব'ল্‌লেন, সবর্ণ বিবাহ যদিও শ্রেষ্ঠ, অনুলোম বিবাহও ক'র্‌তে পার। লোকে বুঝলে, বর্ণ ও জাতি এক, জাতি ও ঘর এক। তাঁরা মৌলিক হ'তে কুলীন উৎপাদনের তরে কুলীনের লক্ষণ দিয়ে গেলেন। লোকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিশুদ্ধ রেখা' (pure line) বুঝ্‌লে না, উত্তম সঙ্কলন হ'ল না; অশুদ্ধ বিশুদ্ধ মিশ্যে গেল। অতএব না প্রাকৃতিক না ব্যবস্থানুগত, বিবাহ হ'ল না, ঘুণ-ধরা কাঠে ঘুণ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ—এই সত্য ভুল্যে গিয়ে সন্তানে কি ধর্ম কি গুণ থাক্‌লে সে জয়ী হবে, সে ভাবনা কারও হ'ল না। কিন্তু দেশের হাওয়া বদ্‌লাবার নয়, সমাজবিধিও সহজে পরিবর্তিত হয় না। কাজেই উপার্জিতের প্রতিই লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

গোড়ার কথা আবার ভাবি। জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী অযোগ্য হয়ে প'ড়্‌ছে; শিক্ষিত, আ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র অ-ভদ্র সবাই। দুদশজনের কৃতিত্ব দেখ্যে একটা রয়ের (race) কৃতিত্ব বুঝ্‌তে পারা যায় না। বরং ক্রম দেখ্যে বুঝি, এরণ্ডের অরণ্যে আরও দ্রুম জন্মিতে পা'র্‌ত। অসামর্থ্যের কারণ দেহের বলের অভাব ও শিক্ষার দোষ।

কৃশ দেহেও বল থাক্‌তে পারে, আর স্থূল দেহও দুর্বল হ'তে পারে। অতএব দেহ দেখ্যে বলাবল নির্ণয় ক'র্‌তে পারা যায় না। আয়ুর্বেদে বলবানের লক্ষণ উক্ত আছে, সে লক্ষণ, চেষ্টা-পটুতা। চেষ্টা—কায়িক কর্ম, সে কম শরীর দ্বারা সাধ্য। যে কায়িক কর্মে পটু, সমর্থ, সে বলবান্। যে শ'তে পেলে ব'স্‌তে চায় না, ব'স্‌তে পেলে উঠতে চায় না, যার মুখ ম্লান, শরীর বিবর্ণ, যার তন্দ্রা ও নিদ্রা সর্বদা, তাকে বলবান্ ব'ল্‌তে পারা যায় না। কারণ বলের এমনই গুণ, মানুষকে নিশ্চেষ্ট হ'তে দেয় না। তখন উৎসাহ, অধ্যবসায়, নিরালস্য আপনই আসে। সুস্থ ব্যক্তিরও লক্ষণ কতকটা এই। তার শরীরানুরূপ কর্মসামর্থ্য থাকে, তার ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকে। যার না থাকে, তাকে আমরা রো-গা, অর্থাৎ রুগ্ন বলি।

গণ্‌তিতে বাঙ্গালী সাড়ে চারি কোটি, কিন্তু ক জন স্ব-স্থ, এবং ক জন বলবান্? নারী, বালক, বৃদ্ধ বাদ দিলে যে যুবা থাকে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলেও ক জন? নগরবাসী দেখ্‌লেও চল্‌বে না। গ্রামবাসী দেখতে হবে। কলিকাতায় যে সব ছাত্র কলেজে প'ড়্‌ছে, তারা দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী ভদ্র শ্রেণীর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রায় সাত হাজার ছাত্রের দেহ নিরীখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, শতকে ষাটি স'ত্তর জনের দেহ রুগ্ন। অর্ধেক কুঁজা হয়ে দাঁড়ায়, আর মাত্র আটজন সংহত-গাত্র! বাকি নিরানব্বই জন কি কর্মের যোগ্য? বাঙ্গালী যে টানা-পাখার নীচে চেয়ারে হেলান দিয়ে কেরাণী হ'তে ভালবাসে, তার একটা কারণ এখানে। বাঙ্গালীর যে সংহতি-শক্তি নাই, তারও একটা কারণ এখানে। বলবান্ পরস্পর মিল্‌তে পারে; দুর্বল পারে না। একাকী প্রাণগতিক ভালয় ভালয় চালাতে চায়। দুষ্টবুদ্ধি আশ্রয় ক'র্যে পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজে বড় হ'তে চায়। এ কথা সত্য, বাঙ্গালী মেলেরিয়ায় জর্জর। দু পুরুষ ধর্যে এই দারুণ ব্যাধি ভোগ ক'র্‌লে, বল-বীর্য কত থাকবে? বিপদ এই, কার্য ও কারণ এক হয়ে গেছে, বলহানির কারণ মেলেরিয়া, মেলেরিয়ার কারণ বলহানি।

আমাদিকেই কিন্তু এই সঙ্কট হ'তে মুক্তির পথ দেখ্‌তে হবে। স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র আস্‌বেন না, বরুণও আস্‌বেন না, হাত ধর্যে পথ দেখিয়ে দিবেন না। "দেশ ত দেশেই আছে কি তার উদ্ধার—" এ কথা আর কতকাল বল্‌তে থাক্‌ব? গ্রাম পরিষ্কার, পুকুর পরিষ্কার কে না চায়? কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লেও চেষ্টার অভাব; কারণ খাট্‌বার শক্তি নাই, এই হেতু প্রবৃত্তি নাই।

আশা এই, অভ্যাস দ্বারা শক্তি বাড়াতে পারা যায়।

ব্যায়াম দ্বারা বল লাভ ক'র্‌তে পারা যায়। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা হয়, কর্মসামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, দেহ সুঠাম হয়, আর রোগও দৃঢ়গাত্রকে সহসা আক্রমণ কর্‌তে পারে না। ব্যায়াম ও খেলা এক নয়। ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা হাডুডুডু নুনকোট প্রভৃতি খেলার গুণ আছে। কিন্তু ব্যায়ামের চারি গুণ ক্রীড়াতে নাই। ইস্কুলে যে চলন (Drill) ও চার-কর্ম (scouting) শেখানা হ'য়, তারও গুণ আছে, বিনয় লাভ হয়। কিন্তু ব্যায়ামের ফল হয় না। বি-আয়াম—দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রসারিত করা। প্রসারণের পর সঙ্কোচন। যে অঙ্গ যেমন সরু যেমন মোটা হ'লে শরীর সুন্দর হয়, সুঠাম হয়, তা ব্যায়াম দ্বারা হ'তে পারে, ক্রীড়া দ্বারা নয়। ব্যায়ামের এক রূপ মল্লক্রীড়া বা কুস্তি। ইহার প্রধান লক্ষ্য, আত্মরক্ষা। বাহু দ্বারা, লাঠি দ্বারা, অসি দ্বারা, যাহা দ্বারা হউক, ব্যায়ামের লক্ষ্য আর মল্লক্রীড়ার লক্ষ্য এক নয়।

বাল্যকালে দেখেছি, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আখড়া ছিল। সে আখড়ায়, ভদ্র ইতর, সকলকেই দেখ্‌তে পেতাম। কিন্তু মেলেরিয়ার পর হ'তে আখড়া-টাখড়া সব উড়্যে গেছে। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, জ্বরের কোঁ-কোঁ-রবে বাহুর অস্ফোট ডুব্যে গেল। এখন সামান্য চোরের ভয়ে লোকে দরজায় খিল আঁটে, তখন ডাকাত পড়্‌লে ধ'র্‌তে দৌড়াত। পুরীতে এখনও পঞ্চাশটা আখড়া আছে, পাণ্ডাদের শরীর দেখ্‌লে বুঝি সে গুলায় এখনও চাবি পড়ে নাই। চাবি দিবার জো নাই, পাণ্ডারাই যাত্রীর রক্ষক। পূর্বকালে শত্রুর আক্রমণ হ'তে তাঁরাই মন্দির রক্ষা কর্‌তেন। কিন্তু আর বুঝি সে দিন থাক্‌ছে না। একদিকে মেলেরিয়া ঢুক্‌ছে, অন্যদিকে ছেলেরা ইস্কুল কলেজে পাঠ পড়তে আরম্ভ কর্যেছে। এ এক আশ্চর্য-কথা, ইংরাজী ইস্কুলে ঢুক্‌লে মতি আর পূর্বপথে চলে না। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশের কি ঘোর পরিবর্তন হয়েছে, তা স্মরণ হলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। আজ যদি বিদ্যাসাগর নব্য হ'য়ে জন্মিতেন, একখান বাঁশ নিয়ে দামোদরের বানে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে কদাপি পার্‌তেন না।

বলহানির আরও এক কারণ ঘট্যেছে। পূর্বকালের দুধ ঘি নাই, মাছ মাংস নাই, যেন শনির দৃষ্টিতে অন্তর্হিত হয়েছে। সে ভোক্তা নাই, সাবু খেলেও অম্বল হ'চ্‌ছে। শাগ-ভাত-মুড়ি—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীর নিত্য খাদ্য হয়েছে। পূর্ববঙ্গ এখনও ভাল আছে, পুষ্টিকর ও বলকর অন্ন এখনও পাচ্‌ছে। আমার বিশ্বাস, এই খাদ্যগুণে পূর্ববঙ্গের ওজস্বিতা ও উদ্যম দেশের মুখ রক্ষা ক'র্‌ছে। সেন্‌সস্ রিপোর্টেও আমার যুক্তির সমর্থন আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রজাক্ষয় হ'চ্‌ছে; সারা বঙ্গে যে কিছু বৃদ্ধি, সে পূর্ববঙ্গের কল্যাণে।

কি দুঃখ! শক্তিসাধকের দেশ শক্তিহীন হ'চ্‌ছে! ক্রমশঃ নিরামিষাশী হয়ে প'ড়্‌ছে, কিন্তু নিরামিষাশীর বলকর ও পুষ্টিকর দুধ ঘি পাচ্‌ছে না। কেবল ভাত ও ডালের জলে জীবন রক্ষা হ'তে পারে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। ঘিয়ের নাম নাই, তেলও না থাকার মধ্যে। লোকে জানে না, কিসে কি হয়, একটা খাদ্য ক'ম্‌লে তার কি পরিবর্ত ধ'র্‌তে হয়। আর কত অগণ্য নরনারী দুবেলা পেট ভর্যে নুন-ভাতও পায় না, তা ধনশালী কলিকাতাবাসীর কল্পনাতেও আস্‌বে না। এক বেলা ভাতডা'ল, আর বেলা ডা'লরুটি খেতে ব'ল্‌লে দেশকে উপহাস করা হবে। তথাপি জানি, পশ্চিমা দরিদ্র লোকেও ডাল রুটি খায়। এমন কি, ভারতীর প্রধান খাদ্য ভাত নয়, রুটি। কেবল বাঙ্গালা দেশ নিয়ে ভারতের পূর্বভাগে ভাত প্রধান খাদ্য। সে যা হ'ক, ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেখা উচিত। কৃশ ও ক্ষুধিতের ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ক্ষুধার্ত হ'লে, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর; যদিও ইস্কুলে ইস্কুলে এই বিধি নিত্য ভাঙ্গা হ'চ্‌ছে। আহারের পর, প্রকৃতি বলেন, বিশ্রাম কর। কিন্তু কে সে আজ্ঞা পাল্‌ছে, খেয়েই সকলে বিদ্যাস্থানে ও কমস্থানে ছুট্‌ছে। সে বিদ্যায় কি হবে, যদি লাভ ক'র্‌তে অগ্নিমান্দ্য জন্মে, বাড়ন্ত মুখে শরীর ভেঙ্গে যায়? দুবেলা ইস্কুল কলেজ স্বচ্ছন্দে চ'ল্‌তে পারে; চ'ল্‌ছে না, যেহেতু যাঁরা চালিয়েছেন, তাঁরা দুবেলা ইস্কুলে যান নাই।

সুস্থ থাক্‌বার নিমিত্ত আনন্দ-উৎসবের কি প্রয়োজন, তা এখন যুক্তি দ্বারা বুঝতে হ'চ্‌ছে। কলেজের উচ্চ শ্রেণীর এক ছাত্র একবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তৃষ্ণা কাকে বলে। সে লক্ষণ দিয়ে মিলাতে চায়, তার তৃষ্ণা পায় কি না। আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধেও আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, লোককে বুঝাতে হ'চ্‌ছে, আনন্দ চাই। ইন্দ্রিয় ও মনের স্ফূর্তি না থাক্‌লে স্বাভাবিক মানুষের

বাঁচাই কঠিন। দেশে বহু উৎসব ছিল, হিন্দুর জীবনই উৎসবময়; দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা প্রভৃতি পূজা পূর্বকালের যজ্ঞ। কিন্তু সে ঘটা গেছে, উৎসাহ গেছে, যজ্ঞের হোমমাত্র আছে। এর এক কারণ অর্থাভাব; প্রধান কারণ, ইংরেজী শিক্ষিতেরা এখন সমাজশাসক, যাঁরা মনে করেন উৎসবে যোগ দেওয়া কুসংস্কার। আরও শোচনীয়, তাঁরা আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য হারিয়েছেন। থিয়েটার হ'লে মন্দ নয়, কিন্তু উপলক্ষ কই? বারোয়ারী, বার ভূতের কাণ্ড! এখন শিখেছেন, "দরিদ্র নারায়ণ"! আত্মারাম না হয়ে নারায়ণ দেখ্‌ছেন, দরিদ্রে! বর্ত্তমান শিক্ষার এ কি পরিণাম! বিদ্যা-আয়তনের ভিৎ না বদ্‌লালে রক্ষা নাই।

অন্নচিন্তা লঘু ক'র্‌তে হলেও ভিৎ বদ্‌লাতে হবে। কিন্তু সে ত অল্প কথায় ব'ল্‌বার নয়। সাত আট বৎসর পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রে তিন প্রবন্ধে শিক্ষার ধারা পরিবর্তনের কথা লিখেছিলাম। সূত্রটা সেখানে আছে, এখানেও আছে। বিদ্যালয় চাই, বিশ্ববিদ্যালয় চাই; সে সবে লক্ষ লক্ষ বালক ও যুবা কাতারে কাতারে প্রবেশ করুক। কিন্তু যারা পূজারী, তারাই করুক; অন্যে গেলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। কারণ এরা সন্ন্যাসী নয়, ভেখধারী। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও শ্রমশীল, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য। এমন ছাত্র শতকে পাঁচ জন মেলে কি না, সন্দেহ। এদিকে পড়াতে হবে, দক্ষিণা নিয়ে নয় দরকার হ'লে বেতন দিয়ে পড়াতে হবে, এদের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত রাখ্‌তে হবে, যত কাল চাইবে তত কাল পালন ক'র্‌তে হবে। কারণ দেশে বিদ্বান্ চাই, পণ্ডিত চাই। এরা পরে চাকরি করুক, কি বাণিজ্য করুক, যে কমই করুক তাতেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। শিক্ষার ব্যয় বহু লাভে পূরণ হবে। পূর্বকালে এমনই কর্‌ত্তে ব্রাহ্মণ জন্মেছিলেন। আর এক শ্রেণী আছে, যাদের অন্নচিন্তা নাই, লক্ষ্মীর কৃপায় চাকরির উমেদার হ'তে হবে না, এরাও কলেজে যাবার যোগ্য। এখানেও দেশের স্বার্থ দেখ্‌ছি। অনেকে বিলাতী ব্যসনে মত্ত হবে বটে, কিন্তু এমন লোকও পাব যাদের ধন ও বিদ্যার গুণে দেশের নানা দিকে হিত হ'তে পার্‌বে।

এই দুই শ্রেণী ছাড়া, যাকে অন্নচিন্তা ক'র্‌তে হবে, তাকে প্রথম হ'তে শ্রমসহিষ্ণু আত্মনির্ভরশীল স্ব-স্থ ক'র্‌তে হবে। এর অর্থ এমন নয় যে সে মূর্খ থাক্‌বে, অবিনীত হবে। চাকর্য্যে, কারু, কলাজীবী, বা বণিক হ'তে গেলে যে বিদ্যা চর্চা কমাতে হবে, তা নয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় কিন্তু এই হ'চ্‌ছে। দোকানী জাহাজের খবর রাখ্‌ছে না, উকীল মকদ্দমা ছাড়া কথা কন না, হাকিম বড় হাকিমের মেজাজ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেন না। অবশ্য বহু বহু ব্যতিক্রম আছে। তথাপি ব'ল্‌তে পারি জীবিকা উপার্জন ছাড়া আরও কিছু আছে, যা নইলে জীবন অপূর্ণ থাকে। মানব জমীন্ যে কত পতিত আছে, তার সংখ্যা হয় না।

ইস্কুল, কলেজ, হোষ্টেল, প্রভৃতি নামগুলি তুল্যে দিয়ে দেশী নাম রাখা আবশ্যক হয়েছে। কারণ ভাবানুষঙ্গ হেতু বিলাতের অনুকরণ ইচ্ছা হয়। বোধ হয়, এখন কোনও শিক্ষক বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের বিরোধী নন। শুন্যেছি, নাকি শিক্ষকের ধুতি চাদরে বাঙ্গালী হয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার হুকুম নাই। আপাদকণ্ঠ বস্ত্রাচ্ছাদিত না হ'লে যে শিক্ষণ কর্মে বিঘ্ন হয়, তাও ত নয়। ইংরেজ শিক্ষক তাঁর দেশের পোষাক পরেন, আমরাও আমাদের দেশের প'র্‌ব। শিক্ষা বিভাগের আইনে যদি আমাদের ধুতি পরা নিষেধ থাকে, তা হ'লে অবিলম্বে তার রদ হওয়া উচিত। বেশভূষা, চা'ল-চলন, ভাব-ভঙ্গি, ক্ষুদ্র বিষয় নয়। কৃত্রিমতার আবরণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষ কৃত্রিম হয়ে পড়ে, নিয়মের দোহাই দিয়ে আত্মরক্ষা করে। ইংরেজী ভাষা শেখাতে যদি ইংরেজ সাজ্‌তে হয়, জাপানী শেখাতে জাপানী সাজ্‌তে হয়, তা হ'লে দেশকে ছোট কর্‌য়ে ভাষাটাকেই বড় কর্‌য়ে তুলি। ইস্কুল কলেজের হোষ্টেলের দেশী নাম, মঠ। তফাৎ এই, মঠ চলে ধার্মিকের দানে, হোষ্টেল চলে ছাত্রের দক্ষিণায়। যদি হোষ্টেলকে মঠ বলি, মঠের নিত্য নৈমিত্তিক বিনা আপত্তিতে চ'ল্‌তে পার্‌বে। মঠের ছাত্রদের চাকর নাই, বহু স্থলে পাচকও নাই। ধনীর ছেলে যদি নিজের কাপড় নিজে কাচ্‌তে, নিজের বাসন নিজে মাজ্‌তে, হাট বাজার গিয়ে দ্রব্যাদি বয়ে আন্‌তে না পারে, তা হ'লে মঠে তার না আসাই উচিত। এই ভাব কিন্তু এ দেশী নয়। আমাদের দেশে ছাত্রের আদর্শ,

ব্রহ্মচারী। এই আদর্শ হঠাৎ পরিবর্তন করাতে ছাত্রের চরিত্র দেশের বিসদৃশ হয়ে পড়েছে। সে আসন-আহ্নিক নাই, সে ব্যায়াম নাই, সে উৎসব নাই, সে আত্ম-সংযম ও আত্ম-মান নাই। ইস্কুল-কলেজে দুই এক ঘণ্টা 'নীতি' উপদেশ দিয়া ছাত্রদিকে 'মানুষ' কর্‌বার প্রয়াস, নিতান্তই হাস্যকর। মঠের নীতিতেই ছাত্রেরা মানুষ হয়ে ওঠে। এই হেতু সকল ছাত্রকে মঠে থাক্‌তে হবে; নিকটে বাড়ী কি বাড়ীর গাড়ি থাক্‌লেও মঠে থাক্‌তে হবে।

বিদ্যালয় অবশ্য বিদ্যালয় থাক্‌বে। শিক্ষার ক্রম প্রথম হ'তে প্রাচ্য ক'র্‌তে হবে; ইংরেজী শিক্ষা ছাত্রের বার বছর বয়সের পর আরম্ভ ক'র্‌তে হবে। শিক্ষার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ক্রম আছে। ইদানী বি-টি পাশ হয়ে শিক্ষকেরা বুঝ্‌ছেন, দুই ক্রমে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পশ্চিমদেশের বহু শিক্ষা-বিদ্যাবিৎ বালচরিত্র লক্ষ্য করে সে দেশের সনাতন বৃদ্ধশিক্ষা তুল্যে দিয়ে বালশিক্ষা প্রচলিত করেছেন। বালশিক্ষাক্রমই প্রাচ্যশিক্ষাক্রম। এই ক্রম সফল, অন্য ক্রম বিফল। তথাপি, ব'ল্‌তে দুঃখ হয়, ক্রমের সূত্রটা ছেড়্যে অনেকে কাঁচের পুঁতি কুড়িয়ে বেড়ান। বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষা চ'লবে না, রথ দেখা আর কলা বেচা কখনও এক সঙ্গে চ'লে না। তেমনই কলা-শিক্ষাও চ'ল্‌বে না, কিন্তু কলার সূত্রশিক্ষা, বিদ্যার নিমিত্ত, কর্তব্য। কণ্ঠে হ'ক, যন্ত্রে হ'ক, গীতের যেমন স্বরগ্রাম আছে, যাবতীয় কলারও তেমন আছে। এটা যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) নয়, কর-শিক্ষা (manual training)। শুন্যেছি, বঙ্গদেশে মাত্র কয়েকটা ইস্কুলে কর-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। যদি চিত্র-লেখনের তুল্য বাহ্যবস্তু বিবেচিত না হয়ে মানব-প্রকৃতির সহিত কর-শিক্ষার সম্বন্ধ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, তা হ'লে এই শিক্ষা সার্থক হবে, অন্যথা কালক্ষেপ মাত্র।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, কলেজেও দেখা গেছে, বালশিক্ষাক্রম সফল হয়, বৃদ্ধশিক্ষাক্রম চর্বিতচর্বণ মাত্র। কিন্তু চর্বিত-চর্বণে আমরা এত দক্ষ হয়েছি যে আখের ক্ষেতে আখ ভেঙ্গে চিবাতে গেলে দাঁতই ভেঙ্গে যায়; যেখানে যাই, সেখানেই থোড়-বড়ি-খাড়া। খেয়ে খেয়ে ছেলেদের অরুচি জন্মে, তারা ঘড়ীর ঘণ্টা গণ্‌তে থাকে, ছুটি পেলে মুখ বদ্‌লাতে ঘরে দৌড়ে। কিন্তু পালাবার জো নাই, অষ্ট বাঁধনে অষ্টাঙ্গ বাঁধা আছে, না শিক্ষকের না ছাত্রের হাত পা মেল্‌বার জো আছে। ছাত্রেরা চৌদ্দ পনর বৎসর কারা ভোগ কর্‌য়ে পাকা কয়েদী হয়ে যায়, মুক্তির পরোয়ানা পেলেও ঘরে যাবার পথ খুজ্যে পায় না। পোষা পাখী পিঁজরা ভুল্‌তে পারে না, ঘুর্‌য়ে ঘুর্‌য়ে পিঁজরার কাছে আসে। চাকরি, সেই পিঁজরা, ছাতু আছেই আছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় বল্যেছিলাম অনেক জায়গায় অনেক হাঁড়ীতে থোড়-বড়ি-খাড়ার ডাল্‌না রান্না হ'চ্‌ছে, নূতন হাঁড়ীতে একটু নূতন ব্যঞ্জন রান্না হ'ক, বালক্রমে প্রয়োগ হ'তে বিদ্যায়, মূর্ত বিজ্ঞান হ'তে অমূর্ত বিজ্ঞানে যাবার পথ খোলা হ'ক। কথাটা কর্তাদের মনে লাগে নাই। কারণ এর মানে সীমা-লঙ্ঘন! গণ্ডীর মাহাত্ম লোপ, জাতি-নাশ! আমার হাঁড়ীর ডাল্‌না তুমি খাবে, তোমার হাঁড়ীর ডাল্‌না আমাকে খেতে হবে! সুজ্জিঠাকুর দুদশ দিন নাই উঠুন, কিন্তু বিহার-ওড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালা দেশে যাবে, আর বাঙ্গালা-বাসী বিহার-ওড়িষ্যায় আস্‌বে, টাকার জন্য যেতে আস্‌তে পারে, কিন্তু বিদ্যার জন্য যাবে আস্‌বে? দেশভক্তেরাও ব'ল্‌লেন, সে যে প্রলয় কাণ্ড! এই সকল রুদ্ধগবাক্ষ অচলায়তন উৎপাটিত না হ'লে কোনও প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হবে না।

অথচ কলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌তে গেলে এই প্রলয়-কাণ্ড না ঘটিয়ে গতি নাই। জেলার শহরে দু চারিটা বিদ্যালয় থাক্‌তে পারে, কিন্তু কলা-শিক্ষালয় একটা বই দুটা থাক্‌তে পারে না, একটা কলা বই দুটা কলা শেখানা যেতে পারে না। ব্যয় বাহুল্য ভাব্‌ছি না, ভাব্‌ছি শিক্ষিতের অন্ন। মনে করি যেন কোথাও কামারের কাজ শেখানা হ'চ্‌ছে, বছর বছর বিশ পঁচিশ দক্ষ কামার তৈয়ার হ'চ্‌ছে। কিন্তু পরে খাবে কি? গোলাম-খানা, উকীলখানার বিরুদ্ধেও ত এই অভিযোগ।

অথচ দেখ্‌ছি, অকর্মণ্য অ-শিক্ষিত কারু সচ্ছন্দে গ্রামে থেকেই অন্নচিন্তা লঘু ক'র্‌তে পেরেছে। এরা যে জীবনসংগ্রামে টিক্যে আছে, তা তাদের নিজের গুণে নয়, কর্মসামর্থ্যে নয়, লোকের দয়ায় নয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় ও আমাদের নির্বুদ্ধিতায়। যে দেশে মুড়ি-মুড়কির সমান দর, সে দেশে মুড়কি দুর্লভ। কর্ণিক হাতে

নিলেই যে রাজমিস্ত্রী হয়, আর বিকালবেলা একটা চক্‌চক্যে টাকা হাতে পায়, তার শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? এইরূপ, সকল কর্ম্মেই। আমরা গুণীর আদর ক'র্‌তে শিখি নাই, তাই গুণহীনে দেশ ভর্য্যে গেছে।

অথচ কারুর কর্মসামর্থ্য বাড়াতে হবে; কেবল মাথার সামর্থ্য বাড়ালে হাত পা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হবে। কারর কর্ম-সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়াবার অভিপ্রায়ে দুপাঁচটা কারু-শিক্ষালয় (Industrial school) স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে সব অভাবের পর পূরণ নয়, কারুকরি শিক্ষার্থীর ইচ্ছায় নয়, কাজেই জলপানি যুগিয়ে চালাতে হ'চ্ছে। প্রথম প্রথম এতে দোষ নাই; কিন্তু শিক্ষিতকে দেখ্যে অন্যে শিখ্‌তে আস্‌ছে না কেন? অতএব ব'ল্‌তে হবে, উদ্দেশ্য সাধু বটে, কিন্তু কল্প প্রশস্ত নয়। পৃথক শিক্ষা-লয়ের সময় এখনও আসে নাই, পৃথক শিক্ষাশালা আমাদের দেশের কল্পও নয়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্তমানে এম্‌ই ইস্কুলগুলা প্রায় উঠ্যে যাচ্‌ছে। কোনটা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে পরিণত হচ্‌ছে, কোন্‌টা কম বেতনে উচ্চ ইস্কুলের নীচের ধাপ হয়েছে। কারণ ইস্কুলে ঢুকলেই কর্ম-তীর্থে যাবার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়। দরিদ্র যাত্রী পাসেঞ্জার ট্রেণে ওঠে, ধিকি ধিকি যায়, থার্ড ক্লাসে কষ্ট খুব, কিন্তু ভাড়া কম। তীর্থের গরিমা শূন্যেছি, কিন্তু কষ্ট ভুগে নাই। এ সকল যাত্রীর নিমিত্ত চাই ধর্মশালা; শিক্ষালয় সে ধর্মশালা। শিক্ষালয়, বিদ্যালয় বটে, আরও কিছু। গ্রামে শিক্ষালয়, চারি পাশের গ্রামের ছেলেরা আসে। বার বছর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমান হবে। তার পর প্রভেদ। বিদ্যালয়ের যোগ্য ছাত্র বিদ্যালয়ে যাবে, শিক্ষালয়ের যোগ্য ছাত্র সেখানে থাক্‌বে। দেখ্‌তে হবে, চারি পাশের গ্রামে কোন্ কারুর অভাব আছে। প্রথমে তার কর্ম শেখাতে হবে। কতকগুলি আমাদের সর্বদা আবশ্যক হয়, যেমন গৃহনির্মাণ। গৃহনির্মাণ একার দ্বারা হয় না। পূর্বকালে চারি ভাগ ছিল, এবং যদিও চারি ভাগের সবাই শি-ল্পী নাম পেত, প্রত্যেকের নাম ও কর্ম পৃথক ছিল। প্রথম শিল্পী স্থপতি, যিনি গৃহ স্থাপনা (plan) করেন। তিনি স্থাপনা কর্মের যোগ্য, সর্ব-শাস্ত্রবিৎ, ধার্মিক, গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্বদেশজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ, সত্যবাদী, মৎসরাদিরহিত। এইরূপ স্থপতি ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন, যে-সে কারুর দ্বারা হয় নাই। তার পর সূত্রগ্রাহী, স্থপতির পুত্র বা শিষ্য, গুণে প্রায় তুল্য, স্থপতির মতিগতিপ্রেক্ষক হয়ে মান উন্মান প্রমাণাদি নির্ণয় ক'র্‌তেন। তদনুসারে তক্ষক কাষ্ঠাদি স্থূল বা সূক্ষ্ম ক'র্‌তেন। তার পর মৃৎশিলা কাষ্ঠাদি সম্মেলনপটু বর্ধকি গৃহ নির্মাণ কর্‌তেন। এই চতুষ্টয় বিনা দেবালয়, মনুষ্যালয়, কোন গৃহ নির্মিত হ'ত না। প্রাসাদশিল্প হ'ক, কুটীরশিল্প হ'ক, যে শিল্পই হ'ক, একটা বিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা। এখন সে বিদ্যা লুপ্ত হ'তে চল্যেছে, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয়। এই রূপ, কামারের কর্ম। বহু গ্রাম আছে যেখানে দুই এক ক্রোশের মধ্যে কামার নাই, যদি বা আছে, হাতুড়্যে। এইরূপ, অভাব দেখ্যে যদি কলাশিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষিতেরা অক্লেশে আত্মমান রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে, অন্যে অন্য বৃত্তি শিখ্‌তে প্রবৃত্ত হবে, চাকরির মোহও কাট্‌তে থাক্‌বে।

যেখানে তাঁত ব্যবসায় আছে, পিতল কাঁসার ব্যবসায় আছে, যেখানে যে ব্যবসায় আছে, সেখানে সে-সে ব্যবসায়ের বিদ্যা শেখালে ছাত্রের সহজে পটুতা হবে, ব্যবসায়ে যোগ দিতে প্রবৃত্তি হবে, পরে তা সফলও হবে। যেখানে গঞ্জ আছে, সেখানে ব্যাপার কর্ম। মারোআড়ী কত সহজে ব্যাপার করে, আমরা আশ্চর্য হই। তারা যে পাঠশালায় প'ড়্‌বার সময় ব্যাপার ক'র্‌তে শেখে, সে বার্তা রাখি না। তার পক্ষে ব্যাপার করা নূতন নয়। কে না দেখ্যেছে, যে ছেলে দোকানে বসে, সে বড় হয়ে অক্লেশে দোকানী হয়। এম-ই, ইস্কুল, ইস্কুল; ছেলেরা আস্‌বে, বিদ্যা অর্জন ক'র্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিজ্ঞানও ক'র্‌বে। শূন্যেছি, এমন ইস্কুল আছে, পাদ্রী সাহেবেরা করেছেন। ক্রমে এই কল্পনা উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলে চালাতে হবে, ক্রমে কলেজেও চল্‌তে পার্‌বে।

এখানে একটা কথা উঠ্‌বে। এ সব শেখাবার টাকা কোথায়, শিক্ষক কোথায়? বাস্তবিক, যদি অট্টালিকা না হলে কিংবা অমুক কোম্পানীর বেঞ্চি না পেলে শিক্ষালয় হবে না মনে হয়, তা হ'লে টাকা নাই, হাত পা গুটিয়ে কুবেরের মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেও নাই। যদি সর্বশাস্ত্রবিৎ স্থপতি নইলে শিক্ষালয়ের স্থাপনা হ'তে পারে না মনে হয়, তা হ'লে বাস্তবিক শিক্ষকও নাই। শিক্ষক গড়্যে নিতে

হ'বে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক হ'তে বেছে নিতে হবে। শিক্ষক যে অনেক চাই, তাও নয়। কারণ এক একটা বৃত্তি দু চারি বছর মাত্র এক শিক্ষালয়ে চ'ল্‌তে পার্‌বে, তার পর বদ্‌লাতে হবে। জেলার শহরে নানা বৃত্তি চ'ল্‌ছে, বিলাতী কলের জিনিসে বাজার ভর্য্যে আছে। সেখানেও দু চারি বছর পরে কলা বা বৃত্তি বদ্‌লাতে হবে। মনে করি যেন একটা জেলায় উপস্থিত দশটা বৃত্তি শেখার প্রয়োজন আছে। মনে করি যেন সকল প্রয়োজন সমান. টাকাও অল্প। তখন দশ জন শিক্ষক স্ব স্ব সাজ নিয়ে দু চারি বছর ছাড়া শিক্ষালয়ে শিক্ষালয়ে শিখিয়ে বেড়াবেন। কি কর্য্যে সাবান ক'র্‌তে হয়, কিংবা জুতার কালী ক'র্‌তে হয়, সে সব কলা গ্রামিক নয়। গ্রামে যা ছিল বা লুপ্তপ্রায়, আগে তাকে রক্ষা করি; প্রথমে ক্ষেম তার পর যোগ।

গ্রামে ও নগরে কত যুবা কার ও কার্মিক আছে, শিক্ষা অভাবে কর্মপটুতা নাই, দক্ষতা নাই। কেহ কেহ এদের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় করেছেন, অশেষ যত্নে পাঠ পড়াচ্‌ছেন। কিন্তু শিক্ষা শব্দের অর্থে লেখা-পড়া বুঝ্যে ঠিক পথ ধ'র্‌তে পারেন নাই। কর্মে দক্ষতা জন্মাবার এ পথ নয়। কর্ম ধর্য্যে বিদ্যায় পঁহুছিয়ে দিলে বালক্রমে শিক্ষা হবে, সে বিদ্যা স্থায়ী হবে। অশিক্ষিত মাত্রেই বালক, বয়স যতই হ'ক। তাদের পক্ষে আগে ক্ষেত্র, পরে ক্ষেত্রতত্ত্ব; আগে শব্দজ্ঞান, পরে বানান; আগে বানান, পরে লিখন। অতএব নৈশবিদ্যালয় নাম তুল্যে দিয়ে শিক্ষালয় রাখ্‌লে ভাল হয়।

এখানে অন্নচিন্তা শেষ করি। কারণ এ চিন্তা শেষ হবার নয়। যাবৎ মানুষ, তাবৎ চিন্তা থাক্‌বে, কখনও লঘু হবে কখনও গুরু হবে। গুরু হ'লেই লঘু হ'বে, প্রকৃতি দ্বারা হ'ক মানুষের দ্বারা হ'ক। দেখা গেল, একটী কারণে দাস্যবৃত্তি আমাদের অবলম্বন হয় নাই। এই বৃত্তি কারও প্রিয় নয়। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ বিহঙ্গম; যেখানে বিহঙ্গম আছে, কার সাধ্য তাকে পিঁজরায় পোরে? না খেতে পেয়ে শুখিয়ে থাক্‌বে, কুলি হ'তে পার্‌বে না, বাড়ীর চাকর হ'তে পার্‌বে না। যেখানে বাগ্‌বুরায় বদ্ধ হয়েছে, সেখানেও পোষ মানে নাই, পালাবার তরে ছট-ফট ক'র্‌ছে। আমাদের নন্দনেরা নিন্দার্হ নয়; নিন্দার্হ আমরা, বৃদ্ধেরা। কে তাদিকে বাবু কর্য্যেছে? কে বাপু বাপু বল্যে দুলাল কর্য্যে তুল্যেছে? কে বাঙ্গালীকে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত কর্য্যেছে? কে পশ্চিম দেশের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছে?

বলের অভাবে, চেষ্টা-পটুতা নাই। এই অভাবে লেখাপড়ার কাজেও অবসাদ আসে। ক্ষুর দিয়া কাঠ কাট্‌তে পারা যায় না, কাটারী কুড়াল চাই। ক্ষুর-ধার বুদ্ধি যার, সে যে বলহীন, কর্মসামর্থ্যহীন, 'ভেতো' হয়ে থাকে, সেই ত আশ্চর্য! দেশ বদ্‌লাবার নয়, জন্ম বদ্‌লাবার নয়, কিন্তু শিক্ষা দ্বারা দেহের ও মনের বল আন্‌তে পারা যায়। এই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে দুচারি কথা ব'ল্‌তে হয়েছে। যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধি, এই বাক্য স্মরণ কর্য্যে সেই ভাবনা-তরঙ্গের একটা কণা উপস্থিত কর্য্যেছি। *

* ভবানীপুরে বারোয়ারীতলায় পঠনের অভিপ্রায়ে গত ২০ চৈত্র লিখিত।

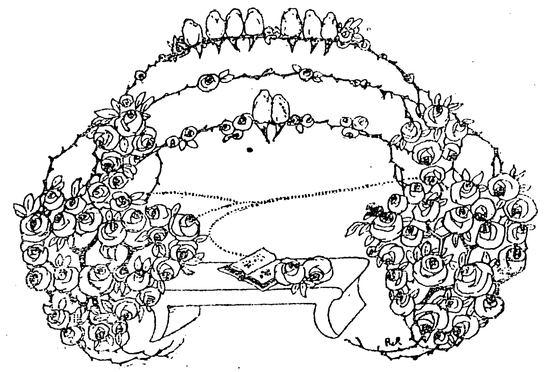

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন **স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী**

গান

আয় আয় আমার সাথে ভাসবি কে আয়
আজ আমার জোড় লেগেছে ভাঙ্গা বেলায়
ঐ দেখ চাঁদের আলো
ঐ শোন কল কল
কেমনে থাকবি বল শুক্নো ডাঙ্গায়
আয় তোরা কুলকুলানো কূল ভুলানো
এই দরিয়ায় !

নায়ে মোর নাই কিছু নাই
(তাই) সবার লাগি হবেরে ঠাঁই
ভুলেছি কূলের বালাই
ভেসেছি তাই !

কে তোরা বাঁধা বাটে
কে তোরা বাঁধা ঘাটে
সুখেতে থাকিস্ যদি থাক্ তোরা ভাই
যার আঁখি ছলছল চলচল আমার এ নায় !

ঐ দেখ সুরধুনী
ওঠে কার ডাকটী শুনি
আমিও ডাক শুনেছি
আয় আয় আয় !

চল আজ স্রোতের সনে
ছুটী সেই ডাকের পানে
যেখানে জীবন মরণ সব ভেসে যায়
সেখানে পাবে জানা সেই অজানায় !

কালেংড়া—দাদরা

II { গা | মা পা দা | পা দা র্সনা | দা পা । | মগা । মা | পা মপা দপা | মগা । গা |
আ য় আ য় আ মা র সা থে - ভা স্ বি কে আ - য় - আ

মা গমা পদা | মগা -া } { র্সা | র্সা সর্ঋসা ঋ্সনা | না সা না | দা পা (-া | -া) }
য় আ - য় - আজ আ মা র জো ড় লে গে ছে - - -

দা | না র্সা না | দা পা -া | -া -া II II
ভা ঙ্গা - বে লায় -

II { পা দা না র্সা ঋ্সা র্সা । | না র্সা -া | -া । না | র্সা র্সা র্জ্ঞা | জ্ঞ্ঞা র্সা -া |
ও ই দে খ চাঁ দে র আ লো - - - ও ই শো ন্ ক ল -
কে তো রা - বাঁ ধা - বা টে - - - কে তো রা - বাঁ ধা -
চ ল আ জ স্রো তে র স নে - - - ছু টী সে ই ডা কের -

র্সা নর্সা ঋ্সা | না দা পা | -া -া -া | -া । } { পা |
ক ল - - - - - - - - কে
বা টে - - - - - - - - সু
পা নে - - - - - - - - সে

পদা দা । | পা । দা | পা ণদা পা | মগা -া মা | পদা মপা -া | -া । } র্সা |
ম নে থা ক্ বি ব ল - শুক্ নো ডা ঙ্গায় আয়
খে তে থা কি স্ য দি - থাক্ তো রা ভাই যার
খা নে জী ব ন্ ম র ন্ সব ভে সে যায় সে

র্সা সর্ঋসা ঋ্সনা | না র্সা না | দা পা দা | না র্সা না | দা পা দা | না র্সা না | দা
তো রা - কু ল্ কু লা নো - কূ ল ভু লা নো - এ ই দ রি
আঁ খি - ছ ল - ছ ল - চ ল - চ ল - আ মা র্ এ
খা নে - পা বে - জা না - (- - - -) সে ই অ জা

পা দপা দপা | মগা -া | II II
যা - - য় -
না - - য় -
না - - য় -

II সা | ঋ্সা গা মা | মা -া মা | মা গমা পদা | পধা -া পমা | গা -া মা |
না য়ে মো র্ না ই কি ছু না - - - - ই - তাই

গা মা গা | গঋ্সা সা ঋ্সা | গা মা গা | ঋ্সা সা -া | -া । { দা | দা দা -া |
স বা র্ লা গি - হ বে - রে ঠাঁ ই ভু লে ছি -

পা পা দা | পা ণদা পা | মা গা মা | পদা মপা -া | -া । } II
কু লে র্ বা লা ই ভে সে - ছি তাই - -

• + ০ + •
সা | ঋা গা মা | মা মা -া | মা মা পম | পমা গা মা | গা সা ঋা |
ও ই দে খ সু র ধু নী - - - ও ঠে কা র্

+ ০ + ০ + •
গা মপা মগা | ঋা সা -া | -া া { দা | দা দা -া | পা -া দা | পা ণদা পা |
ডা ক্ টী শু নি - - আ মি ও - ডা ক্ শু নে ছি -

+ • +
মগা -া মা | গমা পা ণদা | পা -া } II
আ- - য় আ - য় আয়

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

(২)

আশু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ, এম-এ ও বি-এল পড়িত,তখন আমি অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় তাহার বাসা-বাড়ীতে ৺চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় দ্বারা চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিলাম। আমাদের পিসতাত-ভ্রাতা ৺আনন্দ-নাথ সান্ন্যাল মহাশয় আমাদিগের সহিত সেখানে ছিলেন। সেকালের খাঁটি ভদ্রলোক,—রোগে সেবা ও আত্মীয়গণকে সতত সকল প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য তিনি উন্মুখ থাকিতেন। তিনি কখনও জীবনে তোষামোদের ধার ধারিতেন না। রাজসাহীর কোন এক রাজা এক সময় শীতবস্ত্র বিলাইবার দিন তাঁহাকে একযোড়া গঙ্গাজলী শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সেই বাহকের হাতেই সে শাল ফেরত পাঠাইয়া অতি অপমানসূচক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে রাজা বাহাদুর স্বয়ং আসিয়া তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন "আমি জাতে কুলীন ব্রাহ্মণ; অতি গরীব হইলেও, অব্রাহ্মণের দান কখন স্পর্শ করিতে পারি না। তোমাকে যে দাদা বলিয়া ডাকিবার অধিকার দিয়াছি, ইহা সৌভাগ্য মনে করিবে। শাল-দোশালা কখন উপহার পাঠাইবে না। সেই হইতে রাজসাহী জেলার রাজা-মহারাজা, জমীদারবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। কিন্তু আপদ বিপদে সকলের দ্বারেই তিনি অযাচিতভাবে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি আমাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; কখনও আমাদের কোন ত্রুটি ধরিতেন না।

আশুর চাঁপাতলার বাসা একটা বিদ্যাপীঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বড় সুখের দিন গিয়াছে। কত ছাত্র, কত সম্পাদক, কত লেখক ও কত গণ্যমান্য ব্যক্তি শনি-রবি-বারে আশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আশু তখন যুবক মাত্র। তাঁহাদিগের সহিত সাহিত্যচর্চ্চা হইত। "Indian Mirror"এর সহকারী সম্পাদক আশু বন্দ্যো-পাধ্যায়, কবি ঈশানচন্দ্র (কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়েরা অনেকেই সাহিত্যালোচনা করিয়া যাইতেন। সেই সময় এক দিন "সাধারণী" সম্পাদক অক্ষয়বাবু তাঁহার যুক্তাক্ষরশূন্য

"গোচারণের মাঠ" আমাদিগের ভ্রাতা-ভগিনীকে উপহার দিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত বইখানি নিজে পড়িয়া শুনাইয়া গেলেন। "গোচারণের মাঠ" পড়িয়া আশু তাহার একটা হাস্যকর Parody লেখে—

"গোরথ ধাবন"

"তে-কোণা বাঁশের ঠাঠ চাকার উপর
সিঁদুরে দামড়া জোড়া করে লড়বড়।
সোয়ার তাহাতে পাঁচু হাতে এক লড়ি
নবাবী খেয়ালে আছে গোরথেতে চড়ি।"

(সম্পূর্ণ কবিতাটা হারাইয়া গিয়াছে)

এই কবিতা বন্ধুগণের মধ্যে হাতে হাতে চারিদিকে ফিরিতে লাগিল। অক্ষয় বাবুর নিকট সংবাদ পৌঁছিবা-মাত্র তিনি চুঁচুড়া হইতে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সম্পূর্ণ কবিতাটী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গেলেন যে, আশুর "গোরথ ধাবন" আমার "গোচারণের মাঠ" অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহা পড়িয়া মনে হইতেছে, আশুকে আগে লিখিতে দিলে, যোগ্যতর হস্তে তাহা সমর্পণ করা হইত।" কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত আশু কৈশোরে একবার বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর "মেজদাদা" সঞ্জীববাবু পিতৃদেবের পরম বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে উভয় পরিবারে বেশ একটা আত্মীয়তা থাকায়, বঙ্কিমবাবু আশুকে অত্যন্ত যত্ন-আদর সহকারে এক রাত্রি নিজের কাছে রাখিয়া বড় আনন্দ বোধ করেন। তিনি গোপনে কবিবর নবীন বাবুকে বলিয়া-ছিলেন "ভবিষ্যতে এ ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হবে হে,—দুর্গাদাস বাবুর বংশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত করিবে। শিকারী বেড়ালের গোঁপ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।"

আশু কলেজের পাঠের জন্য সময়াভাবে সেখানে আর যাইতে পারে নাই। বঙ্কিমবাবু তাহাকে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দু' চার বার বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কার্য্যতঃ তাহা পুনর্ব্বার ঘটিয়া উঠে নাই। সুস্থ শরীর; যৌবনের উদ্যমে হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ। আশু বি-এ, এম-এ, বি-এল এক সঙ্গে অধ্যয়নে অতিশয় যত্নশীল; এবং কলেজের প্রফেসার-দিগের অতিশয় প্রিয় ছাত্র। কৃষ্ণনগর কলেজের রো সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। আশুকে তিনি আশৈশব ভালবাসিতেন। যাহাতে আশু বি-এর সহিত এম-এ দিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষা দিয়াই আশু এম-এ দিবার জন্য সহৃদয় সুপণ্ডিত টনি সাহেবের মত জানিতে গিয়াছিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইলে, তাহার কৃতিত্বে অতি পরিতুষ্ট হইয়া তিনি আশুকে এম-এ দিবার আদেশ দেন। আশু বি-এ পাশের পরে এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই প্রথম বি-এ, এম-এ এক সঙ্গে দেওয়ার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল।

বি-এল পড়া ছাড়িয়া দিয়া সেই বৎসরই আশু বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮৮১ সালেই সে বিলাত রওনা হইয়া যায়। সে কেম্ব্রিজের সেণ্টজন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন অধ্যয়ন ও সেই সঙ্গে অঙ্কে Tripos দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। দুই পরীক্ষাই সে খুব যশের সহিত পাশ করিয়াছিল।

আশু কেম্ব্রিজেরও বি-এ। কেম্ব্রিজ ছাত্র-সভায় প্রতিযোগিতায় "সাভানারোলা"র উপর কবিতা লিখিয়া সে প্রথম হয়। পরে সে কলেজের 'ঈগল' নামক কাগজের সম্পাদকতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অসংখ্য ইংরাজ যুবকের মধ্যে একজন বাঙ্গালী যুবক "ঈগল" কাগজের সম্পাদকের পদ লাভ করায়, কলেজে তাহার অতিশয় যশঃ লাভ হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রমণ্ডলী সবাই তাহার বন্ধু স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সহপাঠীরা কখনও তাহাকে কোন প্রকার হিংসা করেন নাই; সকলেই ছুটীর সময় তাহাকে নিজেদের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; আশুর সহিত ব্যবহারে শ্বেত কৃষ্ণের তারতম্য পরিলক্ষিত হইত না।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

নিঃশ্বাসে সামর্থ্য-নির্ণয়

খনির ভিতরে কাজ ক'রবার জন্য লোকের যেরূপ সামর্থ্য থাকা উচিত তা' পরীক্ষা ক'রবার জন্য ডাঃ হান্‌টিংটন্ (Dr. Huntington) নামে একজন চিকিৎসক একপ্রকার নূতন ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা তিনি কর্ম্ম-প্রার্থীর সামর্থ্য পরীক্ষা ক'রে তা'কে খনির কাজে গ্রহণ করেন। পরীক্ষার প্রণালী হ'চ্ছে—একটি ঘরের ভিতরে কর্ম্ম-প্রার্থীকে বসিয়ে রেখে শ্বাসের গতি নিরূপক যন্ত্রটী তার বুকের উপর বসিয়ে দেওয়া হয় এবং অপর একটি ঘরে পরীক্ষক বসে থেকে আর একটি শ্বাসের গতি-জ্ঞাপক যন্ত্র-সাহায্যে কর্ম্ম-প্রার্থীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি পরীক্ষা ক'রে তার সামর্থ্য নির্ণয় করেন।

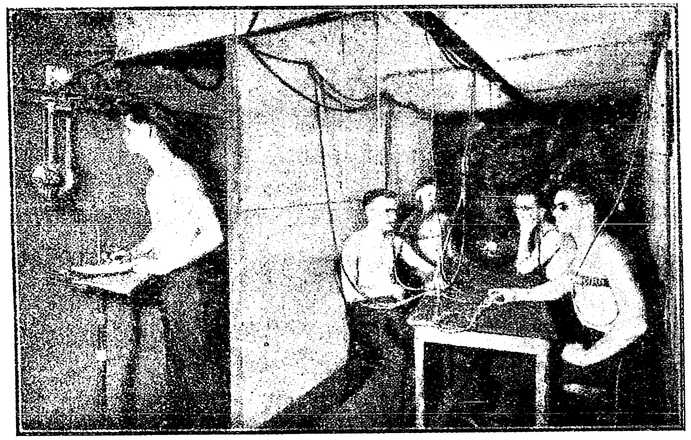

নিঃশ্বাসে সামর্থ্য নির্ণয়।
(একটি ঘরে কর্ম্মপ্রার্থীকে বসিয়ে তার পরীক্ষা হ'চ্ছে। অপর একটি ঘরে (বাম পাশে) চিকিৎসক তা'র নিঃশ্বাসের গতি পরীক্ষা ক'রছেন)

বেতারে নারী

মেরি গিলক্রাইষ্ট (Mary Gilchrist) নামে একজন নারী বেতারবিদ্ একপ্রকার নূতন ধরণের বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন। এই যন্ত্র-সাহায্যে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থান থেকেও তিনি অতি সহজে বেতার বার্ত্তা গ্রহণ ক'রতে পারেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর আমেরিকার বাটীতে ব'সে সুদূর জার্ম্মাণীর কোনও একটি বেতার ষ্টেসন থেকে বেতার বার্ত্তা গ্রহণ ক'রছেন।

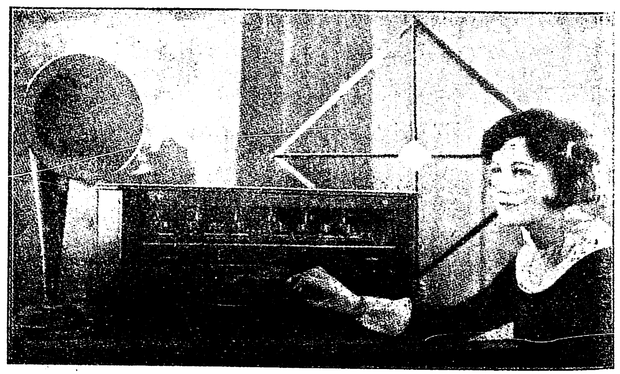

বেতার নারী।(মেরি গিলক্রাইষ্ট তাঁর পরীক্ষাগারে বসে জার্ম্মাণীর বেতার বার্ত্তা গ্রহণ করছেন)।

বাত্যানির্দ্দেশক যন্ত্র

সম্প্রতি ভি, এল, ক্রিষ্টলার (V. L. Christler) নামে একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যার সাহায্যে তিনি দশ বারো ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঝড়ের আগমন সংবাদ জান্‌তে পারেন। এমন কি, এই যন্ত্রের দ্বারা তিনি ঝড়ের গতিবিধি, শক্তি, ইত্যাদিও জান্‌তে পারেন, এবং তদনুযায়ী তিনি সকলকে সাবধান ক'রে দেন।

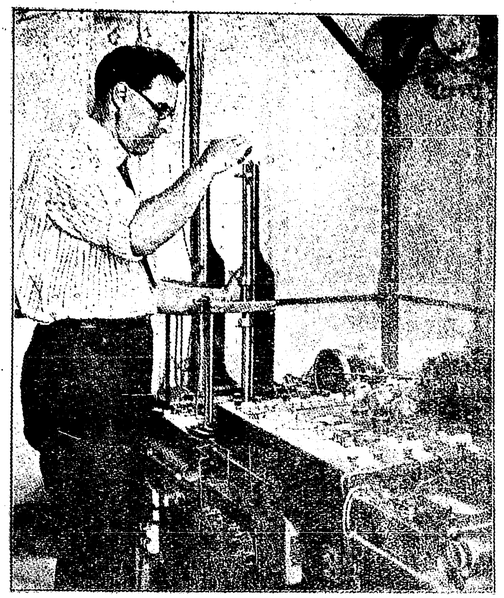

বাত্যানির্দ্দেশক যন্ত্র।
(বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যন্ত্রের পরীক্ষা ক'রছেন)

জনসভায় বেতার

প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা শোনবার জন্য মহতী সভায় লোকের সমাগম হ'য়ে থাকে। কিন্তু সেই বিরাট সভার চারিদিকে বক্তার কণ্ঠস্বর পৌঁছিতে পারে না বলে সকলকে সন্তুষ্ট করা কোনও বক্তার পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। এজন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে যাতে সকল শ্রোতাকে সমভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, সেজন্য বেতার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ ক'রেছেন। বিরাট জনসভার স্থানে

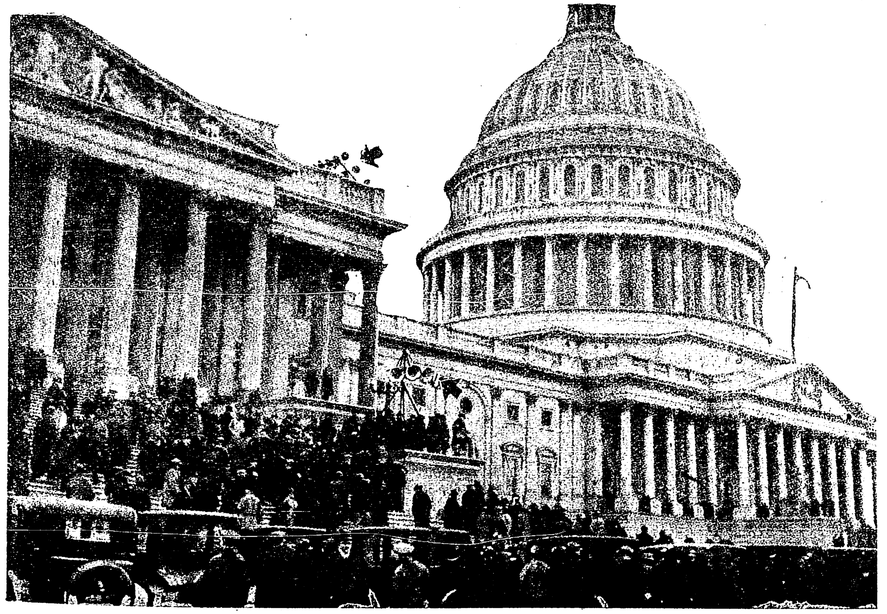

জনসভায় বেতার। (একটি বিস্তৃত ময়দানের সামনে loud speaker সাহায্যে লোকেরা বক্তৃতা শুনছে)

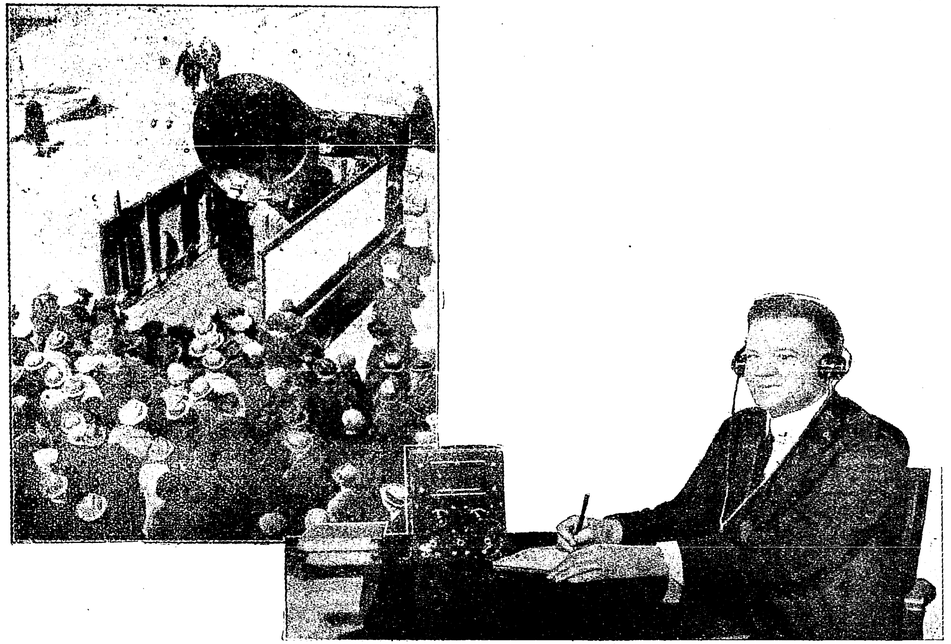

আর একটি দৃশ্য
(ময়দানের আর একটি স্থানে loud speaker সাহায্যে লোকেরা বক্তৃতা শুন্‌ছে)

স্থানে বেতার শব্দগ্রাহী যন্ত্র রেখে বেতার শব্দবর্দ্ধক বা উচ্চ কথকের (loud speaker) দ্বারা চারিদিক হতে শ্রোতাদের বক্তৃতা শোনান হয় এবং সকল শ্রোতাই এক-কালে বক্তৃতা শুনে সন্তুষ্ট হয়।

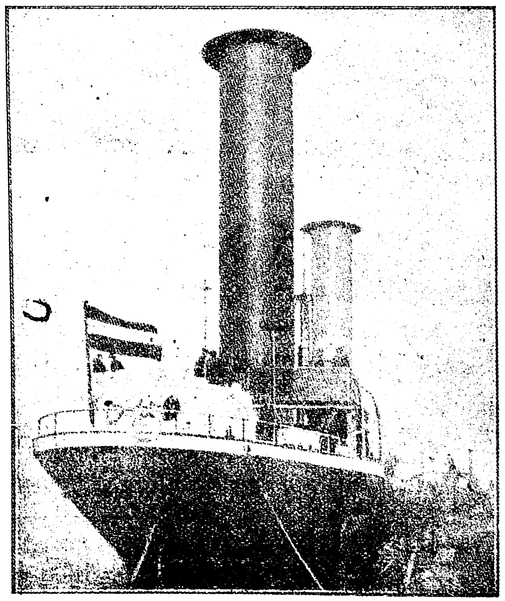

অভিনব জাহাজ। (সমুদ্রবক্ষে "অভিনব জাহাজখানি" যাত্রা ক'রবার জন্য সজ্জিত হ'চ্ছে

অভিনব জাহাজ

এণ্টন ফ্লেটনার (Anton Flettner) নামে একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এক প্রকার নূতন ধরণের জাহাজ নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যাহার গতি সাধারণ জাহাজের গতির অপেক্ষা পনেরো গুণ বেশী। তিনি নানারূপ যন্ত্র সাহায্যে

এণ্টন ফ্লেটনার (এণ্টন ফ্লেটনার (বাম দিকে) ও কাপ্তেন গার্হার্ড ডুভেন্‌ জাহাজখানি চালাবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন)

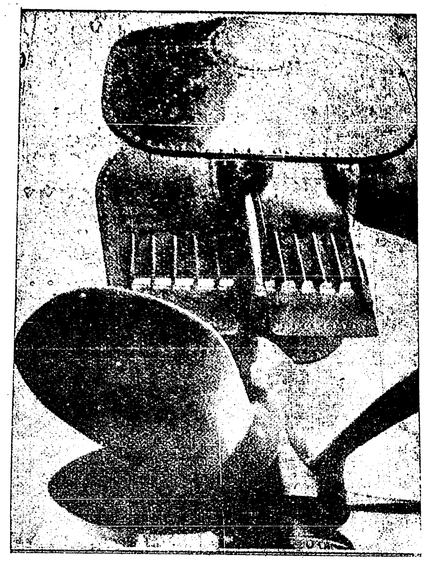

অভিনব যন্ত্র। (অভিনব জাহাজের অভিনব যন্ত্রের চিত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজ চালিত হয়ে থাকে)

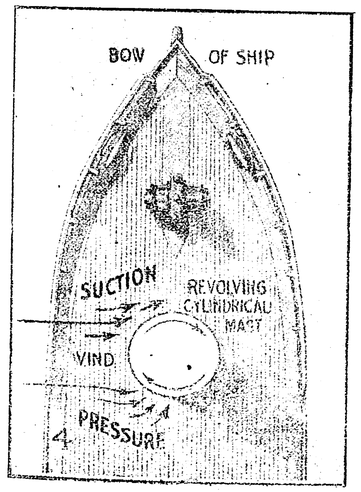

বায়ুর চাপে জাহাজের গতিবৃদ্ধি

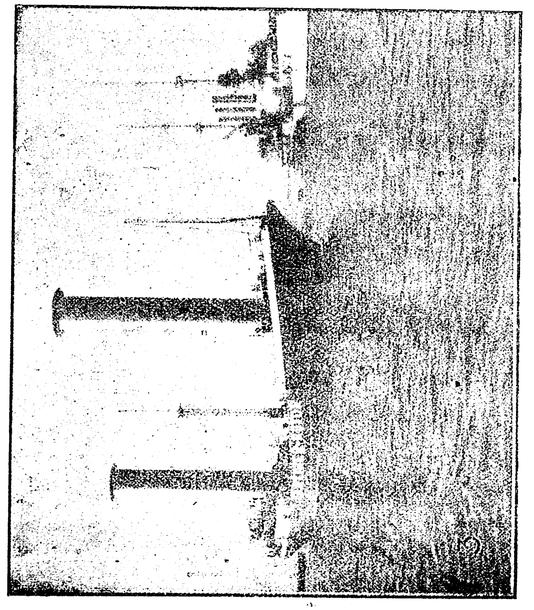

আর একটি চিত্র। (বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে সেই বায়ুর সাহায্যে জাহাজ কিরূপ চালিত হয় তাহা এই চিত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে)

জাহাজটিকে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলেছেন যে, বোধ হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর নবনির্ম্মিত জাহাজ বর্ত্তমানের সমস্ত প্রসিদ্ধ জাহাজকে দ্রুতগতিতে পরাজিত ক'রে জলের উপর মোটর গাড়ীর তুল্য প্রাধান্য লাভ ক'রবে।

তরঙ্গ-ভঙ্গ।(জাহাজখানি তরঙ্গ-ভঙ্গ করে নির্ব্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে)

তরঙ্গ ভঙ্গ

ফিলিপ ব্রাসার (Philip Brasher) নামে একজন মার্কিণ নাবিক উত্তাল তরঙ্গে জাহাজ যা'তে বিপন্ন না হয় তার একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সেই উপায়টি হ'চ্ছে এই যে একটি বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ ক'রে সেই বায়ু যন্ত্রের দ্বারা

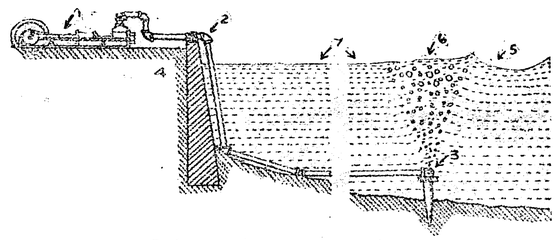

তরঙ্গ-ভঙ্গের কারণ নির্ণয়। (যন্ত্রটী (ক) বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করে নল (খ) সাহায্যে সেই বায়ু সছিদ্র নলের (গ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া তরঙ্গ ভঙ্গ ক'রছে)

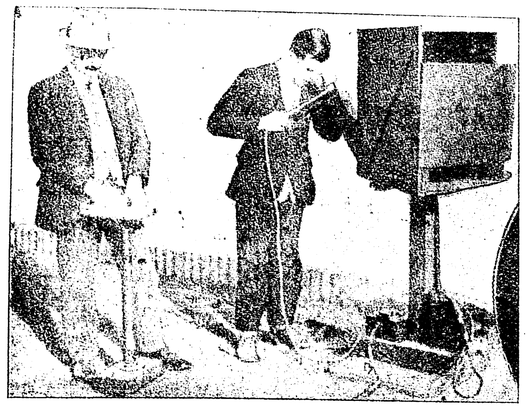

তেজ পরীক্ষা। তাপ পরীক্ষা।
(বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম দিবালোকের তেজ পরীক্ষা ক'রছেন)

তীব্রবেগে সম্মুখস্থিত উত্তাল তরঙ্গের উপর নিক্ষেপ করা হয়। বায়ুর তীব্র চাপে তরঙ্গ ভাঙিয়া গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় এবং জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে পথ অতিবাহিত ক'রে।

কৃত্রিম দিবালোক

লণ্ডনের টেট্ চিত্রশালায় (Tate Art gailery in London) ভাল ভাল প্রসিদ্ধ চিত্রগুলি যাহাতে আলোক অভাবে খারাপ না দেখায়, সেজন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত

যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে রাখবার জন্য বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার বাক্স তৈয়ারী হ'চ্ছে)

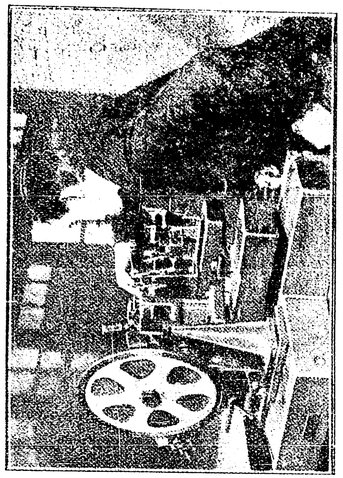

দিবালোকের যন্ত্র।
(এই যন্ত্রের দ্বারা বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম দিবালোক তৈয়ারী করেন)

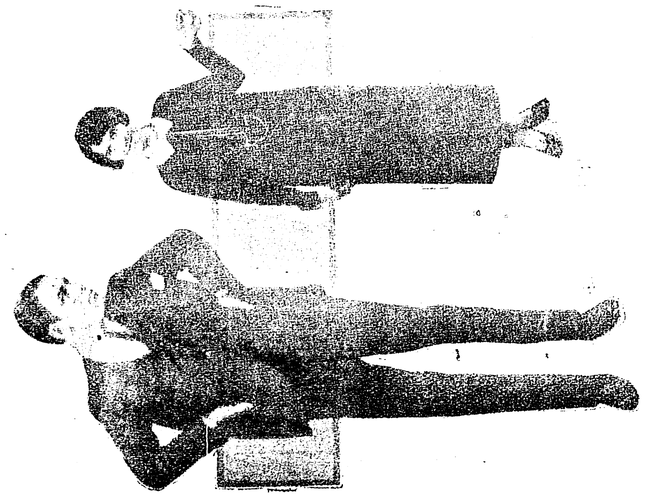

শ্রবণশক্তির পরীক্ষা।
(একটি ঘড়ির দ্বারা বাটীতে বসিয়া শ্রবণশক্তির পরীক্ষা ক'রবার একটি অভিনব উপায়)

হয়ে "হারমেরা ফটোমিটার" (Hermera Photometer) নামে একটি নূতন ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা কৃত্রিম সূর্য্যকিরণ তৈয়ারী ক'রে সেই কিরণ এমন ভাবে চিত্রশালার ভিতরে নিক্ষেপ করা হয় যে চিত্রশালাটী তীব্র অথচ স্নিগ্ধ দিবালোকে আলোকিত হয়ে থাকে, এবং সেই আলোকে আলোকিত হয়ে চিত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়।

বধিরত্বে বেতার

বহুকাল ধরে রোগ ভোগের পর বা কোনও কারণে লোকের শ্রবণ শক্তির অভাব হ'লে প্রারম্ভেই তার ব্যবস্থা করা উচিত; নতুবা অনেক সময়ে তাকে পরে কষ্ট-ভোগ ক'রতে হয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য কয়েকজন চিকিৎসক মিলিত হয়ে কয়েকটি নূতন উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন। তার মধ্যে বেতার শব্দ বর্দ্ধক যন্ত্র প্রধান স্থান অধিকার করেছে। মনে সন্দেহ হলেই সেই যন্ত্র ব্যবহার ক'রে কোনও স্বল্পশ্রবণ ব্যক্তি নিজের শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা ক'রে তার ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।

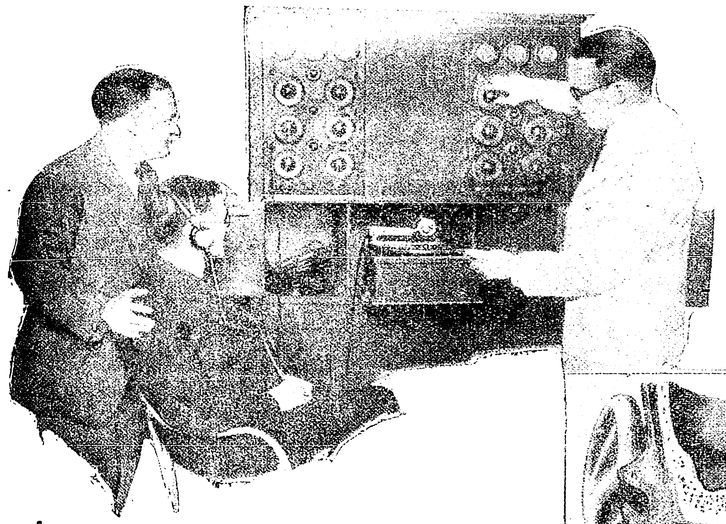

বধিরত্বে বেতার।
(বেতার দ্বারা চিকিৎসক রোগীর শ্রবণশক্তি পরীক্ষা ক'রছেন)

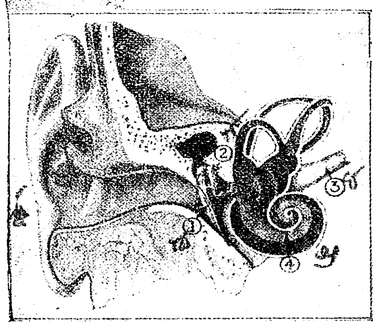

শ্রবণ যন্ত্রের চিত্র।
(কর্ণের ছিদ্র (ক) দিয়া শব্দ 'খ' চিহ্নিত স্থানে গিয়ে বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে তিনটি অস্থির (গ) সাহায্যে শ্রবণ যন্ত্রের অন্তর্দেশে (ঙ) গমন করে এবং তথা হইতে শ্রবণশক্তির স্নায়ু (ঘ) দ্বারা মস্তিষ্কে পরিচালিত হয়)

প্রলয়ঙ্করী

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

১

বেলা দশটা আন্দাজ তার বেতো ঘোড়ায় চ'ড়ে পঞ্চানন সাহা ওরফে পঞ্চু, যশোদা চাটুয্যের বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার বয়স হ'য়েছিল, তাই এই দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে তার যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু এই ক'রেই ত' তার এত দিন কাটল—অত গ্রাহ্য করতে গেলে চলেনা। পঞ্চু ডাকসাইটে সুদখোর। লোকের রক্ত-শোষণ করেই তার এতটা বয়স কাটল। নিজের ইমারত, ধন-দৌলত অনেক হ'য়েছে; কিন্তু তবু সে এখনও এই ব্যবসার প্রত্যেক উঞ্ছকর্ম্ম নিজেই করত, অন্যকে দিতে ভরসা হ'তনা। তার এই অনন্য-পরায়ণ সেবায় লক্ষ্মীও প'ড়েছিলেন বাঁধা; এবং পাছে এই চঞ্চলা দেবীটি তার অনবধানতার কোন সুযোগের ফাঁকে তাকে ফাঁকি দেন, এই ভয়ে সে তাঁকে অতি সাবধানতার অবরোধের মধ্যে নিত্য রেখে দিত। যশোদা চাটুয্যে দুশ টাকা ধার নিয়েছিল, যা এখন চক্র এবং অচক্র নানারকম বৃদ্ধির হারে দাঁড়িয়েছিল পাঁচশ'য়। তাগিদ যে ইতিমধ্যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাই আজ অত্যন্ত কঠিন তাগিদের সঙ্কল্প করে পঞ্চু নিজেই এসেছে।

ঘোড়াটিকে গাছের ছায়ায় বেঁধে পঞ্চু বাইরের রোয়াকে উঠে ডাকলে, 'যশোদা বাবু, অ যশোদা বাবু'—

উত্তরে ভেতর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ এলো, 'ওগো কি হ'ল গো!'

পঞ্চু মাথার ঘাম মুছে, চুপটি করে দাঁড়িয়ে রৈল। এ কি রকম জবাব হ'ল? তবে কি—?

এমন সময় রাস্তার একজন লোক পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে ডাকছ কত্তা?

পঞ্চু বললে, যশোদা বাবুকে।

লোকটি তালু ও জিহ্বায় বিচিত্র আওয়াজ ক'রে বললে, সে আর তোমার ডাকে জবাব দেবে না কত্তা। সে যে আজ ষোল দিন হোল মারা গেছে।

পঞ্চুর চোখের সামনে যেন পৃথিবী দুলতে লাগল, সে আর দাঁড়াতে পারলেনা। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, তার ওয়ারিস?

লোকটি বললে, তার স্ত্রী আর তার এক ছোট ছেলে। তুমি পঞ্চু সা নয়? টাকা ধার দিয়েছিলে বুঝি?

পঞ্চু বললে, হাঁ।

মাথা নেড়ে লোকটি বললে, সে টাকা আর পেয়েছ, —সে গেছে! বলে একটুখানি হেসে সোজা চ'লে গেল।

এই অভাবনীয় সংবাদে পঞ্চুর সারা দেহ থেকে বিন্ বিন ক'রে ঘাম বেরোতে লাগল। সে চুপটি ক'রে ব'সে রইল। পাঁচ-পাঁচ শ' টাকা! যাবে না কি? এত সহজে? আচ্ছা পাজী লোক ত' যশোদা চাটুয্যে,—টাকা না দিয়েই সরে পড়ল? কিন্তু এর একটা উপায় না ক'রে ত' ফেরা চলবেনা। টাকা না থাকে বাড়ী ত' আছে।

তেষ্টা পাচ্ছিল, তাই নিকটস্থ কুয়োয় গিয়ে পঞ্চু খানিকটা জল চেয়ে খেয়ে নিলে। সেখানে একবার ভাল ক'রে খবর নিলে যে, যশোদা সত্যি আছে না গেছে।

তার পর আবার রোয়াকে এসে গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলে, যশোদা বাবু—ইয়ে—।

পাশে রমণী-কণ্ঠের জড়িত আওয়াজ এলো, আপনি কে?

পঞ্চু বুঝলে যে সে যশোদার বিধবা। বল্লে, আমি পঞ্চানন সাহা,—আহা যশোদা বাবুর পরলোক যাওয়া শুনে অবধি আর চোখের জল মানচেনা। বড্ড ভাল লোক ছিলেন। তা হাঁ তিনি আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন, এখন হ'য়েছে পাঁচ শ'—

রমণী কহিল, "সে টাকার কথা তিনি মৃত্যুশয্যায়

শুয়েও ভোলেন নি, কতবার বলেছেন," বল্‌তে বলতে তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে এলো।

পঞ্চু বললে, হাঁ, তা তেমনি লোকই ছিলেন বটে। কিন্তু এখন যে ও-টাকাটার ব্যবস্থা করতে হয়, তা নইলে তাঁবাদি হয় যে!

এই কঠিন ব্যক্তির নির্ম্মমতা সৌদামিনীর মর্ম্মভেদ ক'রে দিলে! সে এর কথা যে ইতিপূর্ব্বে শোনে নি তা নয়, কিন্তু শোনা যে সবটা হয়নি, তা সে বেশ বুঝতে পারলে। জবাব তার মুখ দিয়ে কিছুই বেরোলো না, সে শুধু কাঁদতে লাগল।

পঞ্চু বললে, তাঁবাদি হ'য়ে গেলে সবটাই গেলো। আর নালিশও চলবেনা!

সৌদামিনীর কান্না ছাড়া আর কোন উত্তরই ছিলনা।

পঞ্চু বললে, তা হ'লে কি বলো মা?

সৌদামিনী বল্লে, আমি আর কি বলব? টাকা ত' তিনি রেখে যাননি! তাঁর ঋণ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কোথা থেকে দি?

অপ্রসন্ন মুখে পঞ্চু রোয়াক থেকে নেমে প'ড়ে, তার বেতো ঘোড়ার দড়ি খুলে তার পিঠে সওয়ার হ'য়ে ব'সে, গাঁয়ের দিকে হাঁকিয়ে দিলে। সেখানে খবর নিতে হবে, যে পাজী যশোদা বাড়ীটাও বাঁধা রেখে গেছে কি না!

২

অতি-সাবধানী পঞ্চু সাহার এক ভাই ছিল, তাকে নিয়ে যত গোল। দেশের আইন না কি বেয়াড়া, কখন কি গোল পাকায় তার ঠিক নেই,—সুতরাং দেনার খত তমস্থক সব তার স্ত্রী ভামিনী সাহানীর নামে লেখা হোত—ঐ ভাইয়ের সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। ভাই বেচারার কোনও দিন পঞ্চুর এই কারবারের ওপর লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল কি না, ভগবান জানেন,—কিন্তু যেহেতু সাবধানের মার নেই, সেই জন্যে পঞ্চু অভিজ্ঞদের অনেক গোপনীয় পরামর্শ নিয়ে, তার কারবার এই রকম ক'রেই চালাত।

নালিশ হ'য়ে গেল। নালিশ করলেন শ্রীমতী ভামিনী সাহানী জোজে শ্রীপঞ্চানন সাহা বাদী; এবং প্রতিবাদী হ'ল সৌদামিনী আর তার নাবালক ছেলে।

লঘু হাওয়ায় পাল তুলে নৌকা যেমন কূলের দিকে চলে, তেমনি এই মামলা ডিক্রীর কূলে ভিড়ল; এবং তার পর ক্রমে ক্রমে নিলাম খরিদ পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল যে ভামিনী সাহানীর নামে, তিনি রইলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। শেষকালে এসে পড়ল দখল নেবার দিন।

সৌদামিনীর গ্রামের এক ব্যক্তি—হরিচরণ দখল নেবার আগের দিনটিতে এসে পঞ্চু সার কাছে পড়ল, যে বিধবাকে যেন স্থানচ্যুত না করা হয়।

পঞ্চু সা তার একরাশ খাতাপত্রের মধ্যে ব'সে কড়া-ক্রান্তি হিসেব করছিল। সে তার বিস্মিত দুই চোখ হরিচরণের দিকে তুলে বল্লে, সে কি কথা। তবে এত খরচ-পত্র ক'রে ডিক্রি নিলাম কেন? ওর বাড়ী ছাড়া ত' অন্য সম্পত্তি নেই, যা নিয়ে আমার টাকা পরিশোধ হয়!

হরিচরণ বললে, কিন্তু সৌদামিনী বিধবা, নিরাশ্রয়,—তাকে ওই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তার দাঁড়াবার জায়গাটি পর্য্যন্ত নেই।

পঞ্চু হেসে বল্লে, তোমরাই ত' তার সব হিতাকাঙ্ক্ষী র'য়েছ—তোমরাই না হয় টাকাটা দিয়ে দাও না। ও বাড়ীটার ওপর আমার কোনও লোভ নেই। আমার টাকা পেলে, আমি স্বচ্ছন্দে বিধবাকে থাকবার জন্যে ওই বাড়ী ছেড়ে দেবো। বলে' সে এমনি ব্যঙ্গের হাসি হাসলে, যার অর্থ বুঝতে একটুও দেরী হয় না।

হরিচরণ বল্লে,—আমাদের যদি দেবার মত টাকা থাকত ত' দিতাম। আমাদের তা' নেই। কিন্তু আপনার ত' অভাব নেই। সুতরাং ও টাকাটা ছেড়ে দিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় ত হত না; অথচ একজন বিধবা বেঁচে যেত!

পঞ্চু হেসে বল্লে, আমি যদি এমনি ক'রে ছাড়তে সুরু ক'রে দি, ত' পঞ্চু সা কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে, তার ঠিক নেই। টাকা দিয়ে কেউ কখন ছেড়েছে শুনেছ? কাজের কথা কইতে যদি, টাকার ব্যবস্থা করতে, ত' ভেবে দেখা যেত। মিছে কাজে সময় নষ্ট করবার আমার অবসর নেই, তা জানো বোধ হয়।

হরিচরণ চলে যাবার সময় বল্লে, অথচ বোধ করি মিছে কাজে সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হল!

ক্রুদ্ধ পঞ্চু সাহা রোষ-দৃষ্টিতে তার দিকে যখন তাকালে, তখন হরিচরণ চলে গেছে!

৩

ভামিনী সাহানীর চেহারাটা কতকটা ভামিনী ধরণেরই, অর্থাৎ নামের মতই মোটা-সোটা, কালো-কোলো। নাকে একটা মস্ত বড় নথ, তাতে একটা দামী পাথরও ছিল। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছিল। শুনে তার মনের ভেতর কোন্‌-খানটা যেন জ্বলছিল! পুরুষের এই অর্থ-তৃষ্ণার কাছে অসহায়া সদ্য-বিধবারও পরিত্রাণ নেই।

স্বামী আসতে সে তার নথ নেড়ে বললে, রায়গাঁর যশোদা চাটুয্যের বিধবাকে তুমি কাল বাড়ী ছাড়া করবে?

পঞ্চু হাসবার মত ক'রে বললে, আমি কি করছি? সে ত' নিজেই হ'চ্ছে—টাকাটা দিয়ে দিলেই ত' হ'ত।

ভামিনীর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। সে বল্লে, সে কোথা থেকে দেবে? নতুন বিধবা হ'য়েছে,—আহা, তোমার কি দয়ামায়া একটুও নেই? এই যশোদা চাটুয্যের মা-ই না সাত বছর আগে তোমার ভারি অসুখের সময় তোমার জন্যে মা মঙ্গলচণ্ডীর ওষুধ পাঠিয়ে তোমাকে ভাল করেন? এ সব কথাও কি ভুলতে হয়?

পঞ্চু বল্লে, কিন্তু টাকা ধার নিলে ত সেটা দিতে হয়।

ভামিনী বল্লে, যে ধার নিয়েছিল, তার কাছ থেকে নাওগে না! এর ভেতর মেয়ে-মানুষকে জড়াও কেন? ও বেচারা কি জানে, কেমন করে দেবে? আর তোমার টাকার ত' কমি নেই, না হয় এটা ছেড়েই দিলে। পর-কালে ত' তবু একটা কিছু বলবার থাকা চাই। ছেলে নেই পুলে নেই, কার জন্যে এ অধর্ম্ম করা?

পঞ্চু রাগ করার মত ক'রে বললে, তোমার কথা আমি শুনতে চাইনে। এর ভেতরে মেয়ে-মানুষ কেন? শাস্ত্রে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

ভামিনী বল্লে, এর মধ্যে যে মেয়ে-মানুষকে জড়িয়েছ! তোমরা পুরুষে পুরুষে লাঠালাঠি করগে না,—আমাদের ব'য়ে গেছে। কিন্তু এর ভেতরে এনেছো যে একজন মেয়ে-মানুষকে। না—তাকে কিছুতেই ভিটে-ছাড়া করতে পারবেনা!

পঞ্চু গরম হ'য়ে বল্লে, তবে টাকা আদায় হবে কি ক'রে?

ভামিনী বল্লে, চুলোয় যাক্ গে তোমার টাকা।

পঞ্চুর দুর্ব্বল স্থানে পা পড়েছিল। সে চোখ পাকিয়ে বল্লে, খবরদার, আমাকে রাগিও না বলছি।

ভামিনী গর্জ্জন ক'রে উঠে বললে, ঢের ঢের রাগ দেখেছি। কোনও কথা বলিনে তাই! ও-বাড়ী আমি তোমাকে কিছুতেই নিতে দেবো না,—কেমন তুমি বিধবাকে ভিটে-ছাড়া করো দেখি ত'!

পঞ্চু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললে, আচ্ছা সে দেখা যাবে, কাল সকালে বই ত' নয়! দেখি কেমন ক'রে ওকে বাঁচাতে পার! কে আমাকে আটকাতে পারে?

ভামিনী খুব চটে মটে চলে গেল।

৪

পঞ্চু সার এই ব্যবহারে রায়-গাঁর লোক খুব মর্ম্মাহত হ'য়েছিল। কিন্তু এই দরিদ্র গাঁয়ে যাদের বাস ছিল, তাদের কারুরই এমন সংস্থান ছিল না, যে এর কোন প্রতীকার করে। এই মোটা টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই এর একমাত্র উপায় হোত, কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে? সুতরাং চোখের সামনেই ওরা পঞ্চু সার এই কীর্ত্তি চুপ করে দেখতে লাগলো।

সেদিন সকালে হরিচরণের মা সৌদামিনীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলেন। স্বামীর মৃত্যু এই সেদিন মাত্র হয়েছে,—তাঁর অবশেষ স্মৃতিটুকু মাত্রই এখন বিধবার সম্বল! সেই স্মৃতি-মণ্ডিত, বহু সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের কাহিনী-পূর্ণ এই তার একমাত্র স্বামীর ঘরটিকে ছেড়ে যেতে সৌদামিনীর সমস্ত অন্তর আজ কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল। অথচ তাকে চেপে রাখবার চেষ্টায় বুক যেন ভেঙ্গে আসছিল। আজ তাকে তার একমাত্র আশ্রয় ছেড়ে তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বেরোতে হবে সীমাহীন অনিশ্চয়তার পথে, অন্ধকারের মাঝখানে। আজ হরিচরণের মার এই স্নেহ তার দুঃখের সময়ে অমূল্য বটে, কিন্তু তার পর?

হরিচরণের মা বললেন, চলো মা, এই বেলা। এর পর পঞ্চুর লোকেরা এসে পড়বে। আমার কাছে থাকবে, দুঃখ কি মা?

দুই চোখ জলে ভরে এলো,—সৌদামিনী বল্লে, তাই চলুন!

বাইরে হরিচরণ এবং আরও দু' একজন গাঁয়ের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এখনই যে দৃশ্য তাদের দেখতে হবে, তারই করুণতায় তাদেরও চোখ ছলছল করছিল।

এমন সময় একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল, এবং তার ভেতর থেকে কষ্ট করে যে স্ত্রীলোকটি বেরোলো, সে ভামিনী। ভামিনী হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করলে যে, এই মৃত যশোদা চাটুয্যের বাড়ী কি না,—এবং তার কাছ থেকে খবর নিয়ে, সোজা চলে গেল বাড়ীর ভেতর।

সদ্য-বিধবা সৌদামিনীকে চিনতে তার দেরী হ'লো না। সে একেবারে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললে, বোন, তোমার এই দুঃখের ওপর যে আরও দুঃখ দিতে চায়, সে কি মানুষ? তোমাকে আমি এই দুঃখ থেকে বাঁচাব বোন। তুমি এই বাড়ীতে অচল হ'য়ে থাকো,—দেখি, কে নড়াতে পারে।

সৌদামিনী বিস্ময়ে ভামিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, তোমাকে ত চিনতে পারলাম না, দিদি!

ভামিনী বল্লে, তোমাকে ত' আমি চিনেছি বোন, তা হ'লেই হ'ল। না—তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি তোমার সঙ্গে রইলাম এখানে,—দেখি, কে কি করতে পারে? তার পর সৌদামিনীর ছেলেটিকে টেনে নিয়ে বল্লে, বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে—কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে। নাও ত বাবা, ব'লে পাতায় মোড়া খানিকটা খাবার বার করে তাকে দিয়ে বল্লে, খাও,—আহা, সকাল থেকে বাছার মুখে একটু জলও পড়েনি। নরকেও স্থান হবে না, নরকেও না!

হরিচরণের মা ও সৌদামিনী বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, এবং পাতা-শুদ্ধ খাবার নিয়ে ছেলেটি অবাক্ হয়ে বসে রইল।

তখন ভামিনী তাকে কোলে নিয়ে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগল।

এমন সময় বাইরে গোলমাল শোনা গেল। পঞ্চু খুব বড় গলা করে বললে, এই বাড়ী,—আর তার সঙ্গের লোকটি চেঁচিয়ে ডাকলে, সৌদামিনী দেব্যা, এই বাড়ীর দখল তোমাকে ছাড়তে হবে, এবং এর দখল আজ থেকে দিতে এসেছি মহামান্য আদালতের হুকুমে ডিক্রীদার শ্রীমতী ভামিনী সাহানীকে।

হরিচরণের মা বললেন, ঐ তারা এলো। এখন উপায়?

ভামিনী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, উপায় এখনই হবে মা; এই বলে সোজা বাইরে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে আদালতের সেই লোকটিকে বল্লে, কি চাও তোমরা?

পঞ্চু গলার আওয়াজে চেয়ে যখন দেখলে ভামিনী, তখন যেন সে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেল। চীৎকার ক'রে বললে, তুমি এখানে কেন ভামিনী?

ভামিনী অবজ্ঞার স্বরে বল্লে, চুপ করো,—এর সঙ্গে কথা কয়ে নি।

আদালতের সেই লোকটি বল্লে, আমরা দখল দিতে এসেছি।

ভামিনী বল্লে,—দরকার নেই, আমি দখল চাইনে। আমার সমস্ত টাকা আমি পেয়েছি,—আমার আর কোন দাবী নেই। তোমরা ফিরে যেতে পারো।

সে লোকটি বল্লে, আপনি?

ভামিনী বল্লে, আমি ডিক্রিদার খরিদদার শ্রীমতী ভামিনী সাহানী।

পঞ্চু পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠল, ভামিনী, ভামিনী, সর্ব্বনাশ করলে। না—ওর কথা তোমরা শুনো না, আমি দখল চাই!

আদালতের সেই লোকটি তার দিকে ফিরে বললে, আপনি কে? আপনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, উনিই ভামিনী সাহানী; আর আমাদের কাগজে দেখছি যে, উনিই ডিক্রীদার খরিদদার। সুতরাং আপনি মিছে চেঁচামেচি করলে ত' চলবে না,—ওঁর কথা আমরা শুনতে বাধ্য। তার পর ভামিনীর দিকে চেয়ে বললে, না—আমরা আর দখল দেবো না, আমরা ফিরেই চল্লুম মা।

পঞ্চু তাদের শাসাতে লাগল,—দেখে নেবো তোমাদের,—আজই আমি আদালতে গিয়ে সব কথা জানাবো। ও কে? কেউ না। টাকা আমার।

আদালতের লোকেরা ফিরে গেল, আর ভামিনী বাড়ীর ভিতর গিয়ে সৌদামিনীর ছেলেটিকে খাওয়াতে বসল!

হরিচরণের মা আর সৌদামিনী তেজোগর্ভ মেঘের মত এই অপূর্ব্ব মানুষটির দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রৈল!

ভামিনী হেসে বললে, চণ্ড-চামুণ্ডদের তাড়িয়েছি বোন। তোমার ঘর তোমার রৈল দিদি।

তার পর হরিচরণের মার দিকে চেয়ে বললে, মা, তুমি বরং ঘরে গিয়ে এঁর জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিও। আমাকে বোধ করি আবার আদালতে যেতে হবে।

সৌদামিনী ভামিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, দিদি, আপনি?

ভামিনী বল্লে, শুনলে না বোন, আমি তোমাদের মহাজনের স্ত্রী ভামিনী। কত দুঃখই দিয়েছে বোন, তোমাকে।

৫

সে-দিন কাছারীতে ভারী হুলস্থুল। হাকিমের সামনে গিয়ে পঞ্চু হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, বেইমান সব আদালতের লোক, আমাকে দখল দিলে না।

হাকিম কারণ জিজ্ঞাসা করলে, যারা দখল দিতে গিয়েছিল তারা বললে, হুজুর, ডিক্রীদার ভামিনী সাহানী বল্লেন, তাঁর টাকা তিনি সমস্ত পেয়েছেন, তিনি দখল নিতে চান না। সুতরাং আমরা ফিরে এসেছি।

পঞ্চু চীৎকার করে উঠল, কার টাকা কে পেয়েছে?

এমন সময় একজন উকীল এসে বল্লেন, আমি ডিক্রীদার ভামিনীর উকীল। আমার মক্কেলের সমস্ত পাওনা শোধ হ'য়ে গিয়েছে, সেই মর্ম্মে এই দরখাস্ত দিচ্ছি।

হাকিম বল্লেন, বেশ কথা।

পঞ্চু চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, মিথ্যে কথা। ও টাকা আমার,—ভামিনীর নয়। আমি এক পয়সাও পাই নি।

হাকিম বল্লেন, তুমি বলতে চাও—ও টাকা ছিল তোমার—বাদিনী ভামিনী সাহানীর নয়?

পঞ্চু উৎসাহিত হ'য়ে বল্লে, হুজুর ঠিক, একেবারে খাঁটি কথা।

হাকিম বোধ করি পঞ্চুকে ভাল রকমই চিনতেন। তিনি মোটা মোটা গোটা দুই বই উল্টে পাল্টে পঞ্চুর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি আসল মোকদ্দমায় হলফ নিয়ে বলে এসেছ—ও-টাকার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই, ও তোমার স্ত্রী ভামিনী সাহানীর। আজ আবার বলছ—ও-টাকা তোমার। দুটোর মধ্যে একটা কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা হবে। যদি তুমি এই মুহূর্ত্তেই সরে না পড়, ত' তোমাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করব।

পঞ্চু চোঁক গিলে প্রায় কেঁদে ফেলবার মত ক'রে বল্লে—হুজুর!

হাকিম বল্লেন, হাঁ, আমার কথার অন্যথা হবে না, বুঝে দেখ।

তখন পঞ্চু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল—তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছিল।

ভামিনী যে গাড়ীর মধ্যে ছিল, তার কাছে গিয়ে পঞ্চু চীৎকার করতে লাগল, দেখে নেবো তুমি কেমন আমার স্ত্রী! কেমন ক'রে তুমি আমার বাড়ী ঢোক! পঞ্চানন সাহাকে যা-তা লোক পাওনি!

গাড়ীর ভেতর থেকে ভামিনী গাড়োয়ানকে বল্লে, চলো।

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মা।

ভেতর থেকে উত্তর এলো—রায়গাঁয়ের যশোদা চাটুয্যের বাড়ী।

৬

দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—গাছের মাথায় সূর্য্যের কিরণ ঝিকমিক করছিল। সৌদামিনী তার ছেলেটিকে নিয়ে রোয়াকে বসে ভাবছিল, আজকার দিনের বিচিত্র ঘটনা। কোথা থেকে কে এসে যে কখন আপনার হ'য়ে বসে, তা চিন্তার অতীত।

এমন সময় ভামিনীর গাড়ী এসে দাঁড়াল। সে নেমে এসে, সৌদামিনীর পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, বোন, খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে?

সৌদামিনী বল্লে হ'য়েছে দিদি, কিন্তু তোমার?

ভামিনী হেসে বল্লে, আমার এখনও হয়নি, একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না ক'রে ত সোয়াস্তি পাচ্ছিলুম না। তা আমার কোন কষ্ট হয়নি। এইবার হবে।

সৌদামিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে, বাড়ী যাবে না?

ভামিনী হেসে বল্লে, এই ত' আমার বাড়ী। আমার স্বামীর বাড়ীতে আমার ঢোকা বারণ হ'য়ে গেছে।

শঙ্কিত নেত্রে সৌদামিনী ভামিনীর দিকে চেয়ে বল্লে, দিদি!

ভামিনী হেসে বল্লে—ভয় পাচ্ছ বোন? ভয় কিসের?

এই দেখ আমার এই হাত-বাক্সে গহনা ভরা। এতে আমাদের বাকী জীবন বেশ চলে যাবে। তার পর, ভগবান হাত-পাও ত' দিয়েছেন! মেয়ে-মানুষ, তা হ'য়েছে কি? আর পুরুষদের এখনও চিনলে না? তারা মুখে যত বড়াই করে, কাজে যদি তার সিকিও করত। যখন রাগ পড়ে যাবে, তখন দেখ না বুড়ো কি করে আবার"—বলে সে খুব হাসতে লাগলো।

সৌদামিনী খানিকক্ষণ মুগ্ধের মত চেয়ে রৈল। তার পর ভামিনীর হাত নিজের হাতে নিয়ে বল্লে, আর-জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার বোন ছিলে দিদি।

ভামিনী বল্লে, শোন কথা,—আর জন্মে কেন, এই জন্মেই যে আমরা বোন হলুম।

সৌদামিনী খানিকটা চুপ ক'রে রৈল,—চোখের জল আর বাধা মানতে চায় না। তার পর বল্লে, দিদি, দেখ, ভুলেই গিয়েছিলুম, তোমার খাবার উয্‌যুগ করি'—বলে উঠতে গেল।

ভামিনী তাকে ধরে নিজের কাছে বসিয়ে বল্লে, কিছু দরকার নেই বোন—সে কাল থেকে হবে। আজ আমি গাড়োয়ানকে চিঁড়ে দৈ আর চিনি আনতে বলেছি—দিব্যি খাওয়া হবে 'খন—ও আমার খুব অভ্যেস আছে। বলে হাসতে লাগল।

৭

ভামিনী ঠিক কথাই বলেছিল। দিন দুই রাগের মাথায় কেটে যাওয়ার পর, পঞ্চুর যখন রাগ প'ড়ে এল, তখন তার নিজের বাড়ী তার কাছে মরুভূমি ব'লে বোধ হ'ল। গৃহের অভ্যন্তরে যে ভামিনী কতখানি জায়গা অধিকার ক'রে বসেছিল, সে এখন পঞ্চু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগলো। ত্রিশ বৎসরের অভ্যাসই বল, আর স্নেহ-ই বল, আর ভালবাসাই বল,—পঞ্চুর কাছে বাড়ীটা বড়ই ফাঁকা ঠেকতে লাগলো। রাস্তায় বেরোবার জো নেই, ছেলেরা হাততালি দিয়ে ছড়া কেটে বলে—

পঞ্চানন সা
ঠোঁট কামড়ে খা,
বউ ছাড়ল বাড়ী
পঞ্চুর গলায় দড়ি।

ঘরের ভেতরও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, চিরদিনের প্রিয় খাতা-পত্র হিসেব শুদ্ধ ব'লে বোধ হয়; এবং সবচেয়ে বিপদের কথা—ভামিনী সাহানীর নামের কতকগুলো খত তমস্থক তাঁবাদি হ'য়ে যায়।

সুতরাং দিন পনেরো পরে এক দিন খুব ভোরে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে পঞ্চু আবার বেরিয়ে পড়ল,—রায়গাঁয় যশোদা চাটুয্যের বাড়ীর উদ্দেশে। বুক দুর-দুর করতে লাগলো। আর অপমানের যে জ্বালা বুকের মধ্যে জ্বলছিল, তারও ক্ষত টনটন করতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি?

খানিকক্ষণ যশোদা চাটুয্যের বাইরের রোয়াকে ব'সে নিজেকে সামলে নিয়ে ডাকলে, 'ভামিনী—অ ভামিনী।'

ভামিনী তখন সবেমাত্র সৌদামিনীর ছেলে সুকুকে খাবার খাওয়াতে ব'সেছে। স্বর চিনতে তার দেরী হ'লো না। সুকুকে বললে, 'বস ত' বাবা দেখে আসি।'

ঠিক বাহির-বাড়ী আর ভিতর-বাড়ীর মাঝখানে একটা অপ্রশস্ত যায়গায় দু'জনে দেখা হ'ল। পঞ্চু চুপ করে চেয়ে রৈল।

ভামিনী খানিকক্ষণ পরে কথা কহিল, এখানে এসেছ যে?

পঞ্চু শুষ্ক কণ্ঠে বললে, তোমাকে নিয়ে যেতে!

ভামিনী তার নথ নেড়ে বল্লে, আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলতে তোমার লজ্জা হয় না! মনে নেই—কাছারীতে হাজার লোকের সামনে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে! লজ্জা করে না?

পঞ্চু ধীরে ধীরে ভামিনীর হাত ধরলে,—ভামিনী কিন্তু ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। হাজার হোক নারী-হৃদয় ত!

পঞ্চু আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু না নিয়ে যাওয়ার লজ্জা যে তারও চেয়ে বেশী। দোহাই তোমার!

ভামিনীর দৃষ্টি নরম হ'য়ে এলো। সে বললে, দেখো, অনেক দিন পরে আমি একটি ছেলে পেয়েছি—সৌদামিনীর ছেলে সুকু। আমাকে যদি নিয়ে যেতে চাও, ত' তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা নইলে আমি কোথাও স্বস্তি পাব না।

পঞ্চু বললে, কি ব্যবস্থা?

ভামিনী বল্লে, তোমার টাকার ত' অভাব নেই,—হাজার পাঁচেক টাকা ব্যাঙ্কে ওর নামে জমা ক'রে দিয়ে, ব্যাঙ্কের খাতা নিয়ে ওবেলা গাড়ী নিয়ে এসো, আমি যাবো।

পঞ্চুর বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে উঠতে চাইলে। সে চুপ ক'রে খানিকটা ভেবে বল্লে, আচ্ছা তাই হবে।

ভামিনী পঞ্চুর শুষ্ক হাত আপনার হাতের ভেতর নিয়ে বললে, যাকে ছেলের মত স্নেহ করেছি, তার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা, না হয় খরচই হোল! কি বল? মনে কর যেন আমার একটা ভারী অসুখে তোমার ঐ টাকাটা খরচ হ'য়েছে।

পঞ্চুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন শিউরে উঠল। সে বল্লে, না—তা মনে করতে হবে কেন,—আমি অমনিই ওই টাকাটা দোবো।

ভামিনী বল্লে, তা হ'লে সকাল সকাল আসবে ত'? দেরী যেন না হয়।

অনেক দিন পরে পঞ্চুর বুকের ভেতরটা যেন হাল্কা বোধ হ'তে লাগল,—পাঁচ হাজার টাকার ক্ষতি সত্ত্বেও! সে স্পষ্ট অনুভব করলে যে, আজকের দিনের লাভ,—তার অনেক পাঁচ হাজারের চেয়ে বেশী দাঁড়াল,—সে তার মনের শান্তি!

এমন কি তার মুখে হাসিও দেখা দিলে। সে হেসে বল্লে, আচ্ছা, খুব সকাল সকালই আসব।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির] জল্‌কে চল্!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

শ্রীম—কথিত

গিরীশ-মন্দিরে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়-কথা-প্রসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বর্গীয় গিরীশ ঘোষের বসুপাড়ার বাটীতে ভক্তসঙ্গে-বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। বেলা ৩টা বাজিয়াছে। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আজ বুধবার ১৫ই ফাল্গুন, শুক্লা একাদশী—২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খৃঃ। গত রবিবার দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। আজ ঠাকুর গিরীশের বাড়ী হইয়া ষ্টার থিয়েটারে বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। কাজ সারিয়া আসিতে মাষ্টারের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। তিনি আসিয়াই দেখিলেন, ঠাকুর উৎসাহের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবের এই তিন অবস্থা।

"যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার; স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন দেহের পার; সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের পার; সমস্তই **মায়া**, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়; **ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু**।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, সোঽহং 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই অনুভূতি হয়।

একজন ভক্ত। তা হলে কি আমরা সব বিচার কোরব?

[দুই পথ ও গিরীশ। বিচার ও ভক্তি। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিচার-পথও আছে; বেদান্তবাদীদের পথ। আর একটী পথ আছে ভক্তিপথ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সে তাই পায়। জ্ঞান-যোগ ও ভক্তিযোগ।

"দুই পথ দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে লোক-শিক্ষার জন্য; যেমন অবতারাদি।

"দেহাত্ম-বুদ্ধি, 'আমি'-বুদ্ধি, কিন্তু সহজে যায় না; তাঁর কৃপায় সমাধিস্থ হলে যায়—নির্ব্বিকল্প সমাধি, জড় সমাধি।

"সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে—বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি। এই 'বিদ্যার আমি' দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।

"চৈতন্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন; ঈশ্বরীয় কথা কইতেন; নাম সংকীর্ত্তন করতেন।

"আমি তো সহজে যায় না, তাই ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণও লয়; ভক্ত দেখে তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন, জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন; আবার সাকার চিন্ময়রূপে দর্শন দেন।

"ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সাধু-সঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য এই সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে, যদি 'আমি' সহজে চলে না যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস' হয়ে 'ভক্ত' হয়ে।

"ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। স্বপ্নবৎ বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন; মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ।

"তবে পাকা ভক্তি হলে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে তবে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হোল্‌দে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময়

দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়; নড়ে না; শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি'।

"আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।

[নানা ভাবে পূজা ও গিরীশ। 'আমার মাতৃভাব'।]

"যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটী ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য—এই সব।

"আমি দাসী ভাবে এক বৎসর ছিলাম—ব্রহ্মময়ীর দাসী। মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম; আবার নথ পরতাম। মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।

"সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়; তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন; তাই আমার মাতৃভাব।

"মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।

"মাতৃ ভাব যেন নির্জ্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফল মূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জ্জলা একাদশী; আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

"এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। 'তুমি মা আমি তোমার ছেলে' এই শেষ কথা।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। গৃহস্থদের নিয়ম ও গিরীশ।।]

"সন্ন্যাসীর নির্জ্জলা একাদশী; সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই ভয়। কামিনী কাঞ্চন ভোগ। যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া। টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ—এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করাও ভাল নয়—নিজেরও ক্ষতি আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোক-শিক্ষা হয় না। সন্ন্যাসীর দেহধারণ লোক-শিক্ষার জন্য।

"মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশীক্ষণ আলাপ, তাকেও রমণ বলেছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুনছি; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে; ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (কীর্ত্তনম্) ও একরকম রমণ; মেয়েদের সঙ্গে নির্জ্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি; ও এক রকম। মেয়েদের কোন জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে; ও একরকম। স্পর্শ করা এক রকম। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই।

"সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম। সংসারীদের আলাদা কথা; দু' একটী ছেলে হলে ভাই ভগ্নীর মত থাকবে; তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই।

"গৃহস্থের ঋণ আছে। দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ; আবার মাগঋণও আছে, একটী দুটী ছেলে হওয়া আর সতী হলে প্রতিপালন করা।

"সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী কে মন্দ স্ত্রী; কে বিদ্যাশক্তি কে অবিদ্যাশক্তি। যে ভাল স্ত্রী বিদ্যাশক্তি, তার কাম ক্রোধ এসব কম; ঘুম কম; স্বামীর মায়া ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্য ভাবে; আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে, বেশী খরচ করে না পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়।

"আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ, টেরা, চোখ কোটর, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গালু।"

[সমাধিতত্ত্ব ও গিরীশ। ঈশ্বর লাভের উপায়—গিরীশের প্রশ্ন।]

গিরীশ। আমাদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তম, আছে।

"ভক্তির সত্ত্ব দীন হীন ভাব ; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত পড়া ভাব ; আমি তাঁর নাম করছি আমার আবার পাপ কি ? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।

গিরীশ (সহাস্যে)। ভক্তির তমঃ আপনিই তো শেখান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাঁকে দর্শন করবার কিন্তু লক্ষণ আছে। সমধি হয়। সমাধি পাঁচ প্রকার ; ১ম, পিঁপড়ের গতি, মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মত। ২য়, মীনের গতি ; ৩য়, তীর্য্যক্ গতি ; ৪র্থ, পাখীর গতি ; পাখী যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায় ; ৫ম, কপিব্য, বানরের গতি ; মহাবায়ু যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল, আর সমাধি হল।

"আবার দু রকম আছে ; ১ম, স্থিত-সমাধি ; একেবারে বাহ্যশূন্য ; অনেকক্ষণ, হয়ত অনেক দিন, রইল। ২য়, উন্মনা সমাধি ; হঠাৎ মনটা চার দিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।

[উন্মনা-সমাধি ও মাষ্টার।]

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি ওটা বুঝেছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশ। তাঁকে কি সাধন করে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নানা রকমে তাঁকে লোকে লাভ করেছে। কেউ অনেক তপস্যা সাধন ভজন করে ; সাধন সিদ্ধ। কেউ জন্মাবধি সিদ্ধ ; যেমন নারদ শুকদেবাদি ; এদের বলে নিত্য-সিদ্ধ। আবার আছে হঠাৎ-সিদ্ধ ; হঠাৎ লাভ করেছে। যেমন হঠাৎ কোন আশা ছিল না, কেউ নন্দ বসুর মত বিষয় পেয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গিরীশের শান্তভাব, কলিতে শূদ্রের ভক্তি ও মুক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর আছে স্বপ্ন-সিদ্ধ, আর কৃপা-সিদ্ধ। এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাহিতেছেন।

গান

শ্যামাধন কি সবাই পায়,
অবোধমন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়,
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

"ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। গিরীশ প্রভৃতি ভক্তেরা সম্মুখে আছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে গিরীশ অনেক কথা বলিয়াছিলেন ; এখন শান্তভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গিরীশের প্রতি) তোমার এ ভাব বেশ ভাল ; শান্তভাব। মাকে তাই বলেছিলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরীশ। (মাষ্টারের প্রতি) আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে ; আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, অন্তর্মুখ। বাহিরের ব্যক্তি বস্তু ক্রমে ক্রমে সব যেন ভুলে যাচ্ছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনকে নাবাচ্ছেন। ভক্তদের আবার দেখিতেছেন। (মাষ্টার দৃষ্টে) এরা সব সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যায় ;—তা যায় তো যায় ; মা সব জানে।

(প্রতিবেশী ছোকরার প্রতি)। কি গো ! তোমার কি বোধ হয় ? মানুষের কি কর্ত্তব্য ?

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য ?

(নারাণের প্রতি) তুই পাস করবিনি ? 'ওরে পাশ-মুক্ত শিব পাশ-বদ্ধ জীব'।

ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় আছেন। কাছে গ্লাস করা জল ছিল, পান করিলেন। তিনি আপনা আপনি বলিতেছেন, কইভাবে তো জল খেয়ে ফেললুম !

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত অতুল। ব্যাকুলতা।]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর গিরীশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলের সহিত কথা কহিতেছেন। অতুল ভক্তসঙ্গে

সম্মুখেই বসিয়া আছেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অতুলের প্রতি) আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে, সংসারও করবে ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী। ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন ? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল, এ সব আছে।

নারাণ। (সহাস্যে) ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সব এক।

ব্রাহ্মণ। এক জন্মে কি হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর দয়া হলে কি না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায় ? একেবারে আলো হয় !

(অতুলের প্রতি) তীব্র বৈরাগ্য চাই—যেন খাপ খোলা তরোয়াল। সে বৈরাগ্য হলে, আত্মীয় কালসাপ মনে হয়, গৃহ গাতকুয়া মনে হয়।

"আর আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর যাহা বলিলেন, এক মনে শুনিয়া সেই সকল চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অতুলের প্রতি) কেন ? অমন আঁট বুঝি হয় না।

অতুল। মন কৈ থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়, এক দিনে হয় না ; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

"কেবল রাত দিন বিষয় কর্ম্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে ? যদু মল্লিক আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত ; আজকাল আর তত বলে না, রাত দিন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, কেবল বিষয়ের কথা।"

[সন্ধ্যা সমাগমে, ঠাকুরের প্রার্থনা। তেজচন্দ্র।]

সন্ধ্যা হইল ; ঘরে বাতি জ্বালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, গান গাহিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন।

"বলিতেছেন, 'হরিবোল' 'হরিবোল' 'হরিবোল' ; আবার 'রাম' 'রাম' 'রাম' ; আবার 'নিত্যলীলাময়ী'। ওমা উপায় বল মা ; 'শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত।'

গিরীশকে ব্যস্ত দেখিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তেজচন্দ্রকে বলিতেছেন, তুই একটু কাছে এসে বোস।

তেজচন্দ্র কাছে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টারকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন, আমায় যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) ও কি বলছে ?

মাষ্টার। বাড়ীতে যেতে হবে, তাই বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি ওদের অত টানি কেন ? ওরা নির্ম্মল আধার—বিষয়-বুদ্ধি ঢোকেনি। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়।

"যে বাটিতে রসুন গুলেছ, সে বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ যায় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারে বৃষকেতু অভিনয়-দর্শনে, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করিবেন। বিডনষ্ট্রীটে যেখানে এখন মনোমোহন থিয়েটার, পূর্ব্বে সেই মঞ্চে ষ্টার-থিয়েটার অভিনয় হইত। থিয়েটারে আসিয়া বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়াছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা কাছেই বসিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। নরেন্দ্র এসেছে ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুই দিকে দুইজন ধরিয়া বৃষকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে মাংস রন্ধন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিতেছেন, এই বার এস, আমরা একসঙ্গে বসে রান্না মাংস খাই।

অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারব না; পুত্রের মাংস খেতে পারব না।

একজন ভক্ত সহানুভূতি-ব্যঞ্জক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন। ঠাকুরও সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গ-মঞ্চের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরীশ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, আমি এসেছি।

ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও ঐক্যতান বাদ্যের (কনসার্ট) শব্দ শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতাম; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এ সব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।

গিরীশ ও 'আমি আমার'।

কনসার্ট থামিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। এ কি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের?

গিরীশ। আজ্ঞা, আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমাদের কথাটাই ভাল; আমার বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজে এসেছি; এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে।

নরেন্দ্র। সবই থিয়েটার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ হাঁ ঠিক। তবে কোথাও বিদ্যার খেলা, কোথাও অবিদ্যার খেলা।

নরেন্দ্র। সবই বিদ্যার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ হাঁ; তবে উটি ব্রহ্ম জ্ঞানে হয়। ভক্তি ভক্তের পক্ষে দুইই আছে; বিদ্যা মায়া অবিদ্যা মায়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই একটু গান গা।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান।

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনয় ভাবত রঙ্গ;
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি ব'লে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশ কাল
ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল (আশা পুরিল রে,—
আমার সকল সাধ মিটে গেল) এখন আনন্দে
মাতিয়া দু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি।

নরেন্দ্র যখন গাইতেছেন, 'মহাযোগে সব একাকার হইল' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, এটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়; তুই যা বলছিলি, সবই বিদ্যা।

নরেন্দ্র যখন গাইতেছেন, 'আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বলরে মন হরি হরি,' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, ঐটী দুবার করে বল্।

গান হইয়া গেলে আবার ভক্ত সঙ্গে কথা হইতেছে।

গিরীশ। দেবেন্দ্রবাবু আসেন নাই; তিনি অভিমান করে বলেন আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নাই; কলায়ের পোর। আমরা এসে কি কর'ব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিস্মিত হইয়া)। কই, আগে ত উনি ওরকম করতেন না?

ঠাকুর জল সেবা করিতেছেন, নরেন্দ্রকেও যাইতে দিলেন।

যতীন। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। 'নরেন্দ্র খাও' 'নরেন্দ্র খাও', বলছেন; আমরা শালারা ভেসে এসেছি।

যতীনকে ঠাকুর খুব ভালবাসেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া মাঝে মাঝে দর্শন করেন; কখন কখন রাত্রেও সেখানে গিয়া থাকেন। তিনি শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ীর ছেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। ওরে (যতীন) তোর কথাই বলছে।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে যতীনের থুঁতি ধরে আদর করিতে করিতে বলিলেন, 'সেখানে যাস্ গিয়ে খাস্।' অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাস্।

ঠাকুর আবার বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় শুনিবেন; বক্সে

শেষ চিন্তা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমন চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

গিয়া বসিলেন। ঝির কথাবার্ত্তা শুনে হাসিতে লাগিলেন।

[গিরীশের অবতারবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ?]

খানিকক্ষণ শুনিয়া অন্যমনস্ক হইলেও মাষ্টারের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ যা বলছে (অর্থাৎ অবতার) তা কি সত্য ?

মাষ্টার। আজ্ঞা ঠিক কথা ; না হলে সবার মনে লাগছে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, এখন একটী অবস্থা আসছে ; আগেকার অবস্থা উল্টে গেছে। ধাতুর দ্রব্য ছুঁতে পারছি না।

মাষ্টার অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই যে নূতন অবস্থা, এর একটী খুব গুহ্য মানে আছে।

ঠাকুর ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অবতার বুঝি মায়ার ঐশ্বর্য্য কিছুই ভোগ করেন না, তাই কি ঠাকুর এই সব কথা বলিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)।—আচ্ছা, আমার অবস্থা কিছু বদলাচ্ছে দেখছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কার্য্যে ?

মাষ্টার। এখন কাজ বাড়ছে—যত লোক জানতে পারছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখছ ! আগে যা বলতুম এখন ফলছে ?

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলছেন, আচ্ছা পল্টুর ভাল ধ্যান হয় না কেন ?

[গিরীশ কি রসুন গোলা বাটি ? The Lord's message of hope for socalled 'Sinners']

এইবার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাইবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

ঠাকুর কোন ভক্তের কাছে গিরীশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'রসুন গোলা বাটি হাজার ধোও রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায় ?' গিরীশও তাই মনে মনে অভিমান করিয়াছেন ; যাইবার সময় গিরীশ ঠাকুরকে কিছু নিবেদন করিতেছেন।

গিরীশ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) রসুনের গন্ধ কি যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাবে।

গিরীশ। তবে বল্লেন 'যাবে' না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অত আগুণ জ্বললে গন্ধ ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড়ী হয়ে যায়।

"যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। **মুক্ত অভিমানী মুক্তই হয়,** আর বদ্ধ অভিমানী বদ্ধই হয় ! যে জোর করে বলে, আমি মুক্ত হয়েছি সে মুক্তই হয়। যে রাত দিন আমি বদ্ধ, আমি বদ্ধ বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায় !

নিকুঞ্জ-কানন

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

অস্তমিত দিবালোক, সন্ধ্যা আসে ধীরে,
বৃন্দাবনে স্তব্ধ এবে নিকুঞ্জ-কানন,
নাহি যায় দেখা তথা একটি প্রাণীরে।
কেহ নাহি পারে নিশা করিতে যাপন।
ভাবাবেশে চিত্ত মোর শুনিবারে পায়,
নূপুরের রব আর বাঁশরীর সুর।
সখীরা কি কথা কহে অস্ফুট ভাষায়।
নিত্যলীলা হয় তথা মিলন-মধুর।

'কোথা রাধা, কোথা শ্যাম, কোথা বৃন্দাবন।
কোথায় নিকুঞ্জবনে সখীদের মেলা।'
জাগরিত আমি, কিবা হেরি এ স্বপন,
এ কি সত্য—না জানি কি কুহকের খেলা।
সত্য মিথ্যা কিছু হরি জানিতে না চাই,
ক্ষণতরে যেন নাহি তোমারে হারাই।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

—১—

"এই, ওঠ।"—বলিয়া মলয় বিলোপের সম্মুখের খোলা বইখানা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

বিলোপ মেসে থাকে। এবার তাহার এম্-এ পরীক্ষা দিবার বৎসর। তাই সে অধ্যয়নে রত ছিল। মলয় তাহার সহপাঠী; সে বিলোপের সঙ্গে বি-এ পাস করিয়া এখন এটর্ণির কাজ শিখিতেছে—তাহার পিতা একজন বড় এটর্ণি। বিলোপ বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—উঠে কোথায় যেতে হবে?

মলয় হাসিয়া বলিল—যে দিকে দু চক্ষু যায়। বড়-দিনের ছুটিটা তোমার পড়্বার জন্যে হয় নি।

বিলোপ উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত বইখানা তুলিয়া বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল—দু চক্ষু ত লোক-লোকান্তরে যেতে পারে। সাত দিনের মধ্যে ফিরে আস্তে পারা যায় এমন একটা সীমা নির্দ্দেশ কর্লে ভালো হত না?

মলয় বলিল—সীমা নির্দ্দেশ করা যাবে ষ্টেসনে গিয়ে। পাঁচ-শ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে যেখানে হোক্ গেলেই হবে।

মলয় বিলোপকে সঙ্গে করিয়া ছুটিতে বেড়াইতে যাইবার আভাস আগেই দিয়া রাখিয়াছিল। তাই এই আকস্মিক প্রস্তাবে আশ্চর্য্য না হইয়া বিলোপ বিছানা আর জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে লইতে জিজ্ঞাসা করিল—আজ এমন হঠাৎ যাবার খেয়াল হল যে?

মলয় হাসিয়া বলিল—অকস্মাতের আশা আমাকে ঘরে থাক্তে দিলে না। কোন অচেনা প্রেয়সীর বিরহ আমাকে উতলা করে' তুলেছে।

বিলোপ লেপ পাট করিতে করিতে হাসিয়া বলিল—চলো, আমি ঘটকালি করে' এবার তোমার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে আন্ব।

মলয় হাসিয়া বলিল—দেখো, ঘটকালি কর্তে গিয়ে নিজে যেন প্রেমে পড়ে' যেও না।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তাহলে ত ভালোই হবে; একেবারে 'রীতিমত নভেল'! নভেলের সেই চিরন্তন ত্রিভুজের টানাটানি! গল্পটা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বল্লে তিনি হয় ত আমাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে ফেল্তে পার্বেন।

মলয় হাসিয়া বলিল—তাতে মজা মন্দ হবে না। কিন্তু ভাই, তাঁকে বোলো আমার নামটা যেন বদ্লে রাখেন।.....মশারিটা আবার বিছানার মধ্যে ভর্ছ কেন? শীতকালে মশারি কি হবে?

বিলোপ বিছানা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—তোমার ত মতি স্থির নেই যে কোথায় যাবে। যদি ঢাকায় যাও তাহলে এই মশারি ঢাকা না দিলে ঢাকাই মশারা মিলে আমার নামটাকে একেবারে সার্থক করে' তুল্বে।

মলয় হাসিয়া বলিল—না, ঢাকায়-ফাকায় যাওয়া নয়, ফাঁকায় খোলায় কোথাও যেতে হবে, নইলে অচেনা প্রেয়সীর দর্শন মিল্বে কেমন করে'.....ও-সব আবার কি হবে?—ছুঁচ সুতো সেফ্টি-পিন ছুরী কাঁচি বাতি দেশলাই—যত রাজ্যের আগড়ুম-বাগড়ুম জমিয়ে বোঝা বাড়িয়ে তুল্ছ, যেন নতুন-বৌ ঘর-বসত কর্তে চলেছ.....

বিলোপ হাতুড়ি পেরেক আর দড়ি লইয়া বাক্সের মধ্যে ভরিতে ভরিতে বলিল—ঘর-বসত কর্তেই ত যাচ্ছি, বিদেশ বিভুঁইয়ে হঠাৎ একটা জিনিসের দর্কার হলে তখন কোথায় পাবে? আর তোমার নতুন-বৌকে যদি ঘর-বসত কর্তে বাসাড়ের বাসাতেই ধুলো-পায়ে লগ্ন কর্তে হয়.....

মলয় হাসিয়া বলিল—সাধে কি তোমাকে তোমার মেসের বন্ধুরা গিন্নি বলে' ডাকে!

বিলোপ বাক্স বন্ধ করিয়া জামা গায়ে দিতে দিতে বলিল—ভাগ্যিস গিন্নি হয়েছিলাম তাইতে ত বিদেশে বেড়াতে যাবার সময় তোমার আমাকে না হলে চলে না।

মলয় বলিল—তা ভাই ঠিক, কিন্তু তোমার সঙ্গে বিদেশে গিয়ে সুখ আছে, মজা নেই; বিদেশে গিয়েও মনে হয় যেন বাড়ীতেই আছি।

বিলোপ কোনো কথা না বলিয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, সে স্বভাবতঃই অল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। সে নত হইয়া তক্তপোষের তলা হইতে একটা বেতের বাক্স টানিয়া বাহির করিল এবং তাহাতে মিলারের তালা একটা টিপিয়া লাগাইয়া দিল।

মলয় বিস্মিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—ওটাও যাবে না কি?

বিলোপ মুচ্কি হাসিয়া বলিল—হাঁ।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—পেটারীর জঠরে আছেন কি কি বস্তু?

বিলোপ কৌতুক-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল—চা চিনি ঘন-দুধ কাপ্ সসার্ জেলি মাখন আর আধখানা রুটি। আজ যে রকম গতিক দেখ্ছি তাতে ঐ আধখানা রুটি চিবিয়েই আমাদের দুজনের রাত কাটাতে হবে।

মলয় প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিল—আরে কেল্নারের সদাব্রত খোলা থাক্তে 'আমি কি ডরাই বন্ধু বুভুক্ষা রাক্ষসে!'

বিলোপ বলিল—হিঁদুর ছেলে, গরু শুয়োর খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কেল্নার কোম্পানীর পুণ্যনাম যখন কীর্ত্তন কর্লে তখন হাওড়া ষ্টেসনে গিয়ে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দিয়ে কোথাও যাওয়ার মৎলব তোমার মনে চাপা আছে বুঝ্তে পার্ছি। ষ্টেসনে যাবার সময় পুলের কাছে ভীমনাগের দোকান থেকে কিছু সন্দেশ সংগ্রহ করে' নিতে হবে।

মলয় বলিল—আচ্ছা তা হবে। এখন তোমার চাকরকে ডেকে জিনিস-পত্তর নিয়ে বেরোও ত।

বিলোপ উচ্চস্বরে হাঁক দিল—এই পর্গন।

মেসের নীচের তলা হইতে ভৃত্য সাড়া দিল—যাই বাবু।

বিলোপ আবার হাঁকিয়া বলিল—একখানা গাড়ী ডেকে আন ত।

মলয় বাধা দিয়া বলিল—গাড়ী আমার সঙ্গে আছে। তোমার ভৃত্যপ্রবরকে বলো তোমার গন্ধমাদনটি সেই গাড়ীর মাথায় চাপিয়ে দিক।

বিলোপ আবার হাঁকিল—এই পর্গন, তুই একবার উপরে আয়।

ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল আধবুড়ো হিন্দুস্থানী চাকর পরগন, তাহার ডান হাতে সোনার তাগা এবং গলায় কালো রেশমের সূতায় জরি জড়াইয়া গাঁথা একটি ছোট চৌকা সোনার পদক, গলার রেশমী ফাঁসের জরির পুঁঠেটা পিঠের মাঝখান পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই বিলোপ বলিল—এই মোটগুলো গাড়ীর মাথায় তুলে' দে ত।

পরগন একে একে মোট বহিয়া গাড়ীর মাথায় উঠাইয়া দিল। বিলোপকে গাড়ীতে বসাইয়া মলয় গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে কোচম্যান্কে বলিল—ঘর চলো।

বিলোপ আশ্চর্য্য ও খুশী হইয়া বলিল—তবু ভালো! আমি মনে করেছিলাম এই দুপুর বেলা থেকেই হাবড়া ষ্টেসনে গিয়ে ধন্না পাড়্তে হবে। এখন ত লোকাল-গাড়ী ছাড়া আর কোথাও যা বার গাড়ী নেই।

মলয় হাসিয়া বলিল—বাড়ী থেকে খেয়ে নিয়ে রাত্রে পুরী এক্স্প্রেসে পুরী যাওয়া যাবে।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—এতদিন পরে মতি স্থির করে' একটা কর্ম্ম কর্তে পার্ছ দেখ্ছি। এইবার স্থির হয়েছ, এইবার প্রজাপতির শুভদৃষ্টি তোমার উপর পড়্বার অবসর পাবে।

মলয় হাসিতে হাসিতে বলিল—সেই জন্যেই ত শ্রীক্ষেত্রে চলেছি যদি শ্রী ফেরে।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—চলো, শ্রী ফেরাবার ঘটকালির ভার আমার উপর।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—তোমার শ্রী ফির্বে কবে?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—ভগবান্ ভবিতব্যতাই জানেন।

—২—

দুই বন্ধু পুরীতে গিয়াছে। তাহারা ভিক্টোরিয়া ক্লাবে আশ্রয় লইয়াছে। প্রথম দিনটা অতি সাধারণ ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে বিলোপ সমুদ্রতীরে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; মলয় জীবনে কখনো সূর্য্যোদয় দেখে নাই, সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের প্রলোভনও তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারে নাই। রাত্রে শুইবার

সময় বিলোপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ভোরবেলা বেড়াইতে যাইবার জন্য তাহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিবে কি না। তাহাতে মলয় উত্তর করিয়াছিল—সূর্য্যোদয় দেখা অপেক্ষা দুই ঘণ্টা বেশী নিদ্রা সম্ভোগ করা ঢের বেশী সুখকর ও আরামদায়ক। সে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াই সূর্য্যোদয়ের ছবি কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে; ভগবান্ যে কল্পনাশক্তি দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই ত। যদি বিলোপ নেহাৎ পীড়াপীড়ি করে তাহা হইলে সে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিবার দিন সূর্য্যোদয়ের জাগরণের পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। এই জন্য বিলোপকে একাকীই প্রাত-ভ্রমণে বাহির হইতে হইয়াছে।

সমুদ্রের তীরে সেই প্রত্যূষেই বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছে। সকলেরই সঙ্গী আছে; কেবল বিলোপ একাকী। তাহার মনে সৌন্দর্য্য-দর্শনে যে-সব ভাবোন্মেষ হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিয়া আলোচনা করিয়া সৌন্দর্য্যকে সে সম্ভোগ করিতে পারিতেছিল না বলিয়া তাহার মনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কোনো ছবিই বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার অবসর পাইতেছিল না। সে আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে তরুণী-কণ্ঠের সুমিষ্ট কাকলি শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—বাবা, দেখ দেখ, ঠিক যেন একটা সোনার কলসী জলের উপর উপুড় করা রয়েছে।

বিলোপ চকিত দৃষ্টিতে একবার উদীয়মান সূর্য্যচ্ছবির দিকে দেখিয়া লইয়া যেদিক্ হইতে সেই মিষ্ট ধ্বনি আসিয়াছিল সেইদিকে তাকাইল। দেখিল একটি মোটা বেঁটে টেকো সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে একটি শ্যামলা তরুণী সমুদ্রের ঢেউএর একেবারে শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছে। তরুণীর বর্ণ শ্যাম হইলেও তাহার কমনীয় মুখে ও তন্বী দেহলতায় এমন একটি শ্রী আছে যে তাহাকে সুন্দরী বলিতে হয়; তাহার পরণে মভ্ রঙের শাড়ী আর জামা, পায়ে লাল চামড়ায় জরি দেওয়া দিল্লীর সেলিমশাহী নাগরা জুতা। বিলোপ সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই তরুণীর নবারুণোদ্ভাসিত আনন্দিত মুখের দিকে একবার তাকাইয়া আবার সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইল, এবং যেন সে তন্ময় হইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছে এমনই ভাবে সে বৃদ্ধ ও তরুণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল।

বৃদ্ধ কন্যার কথার উত্তরে বলিলেন—ঐ ত ধন্বন্তরির সুধার স্বর্ণকলস! ঐ ত স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের অমৃত-ভাণ্ড।

তরুণী আর কোনো উত্তর দিল না। বৃদ্ধ নীরব।

তাহাদের উভয়কে নীরব থাকিতে দেখিয়া বিলোপ চকিতে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহাদের দুজনকে দেখিয়া লইল; দেখিল পিতা-পুত্রীর মুখ সৌন্দর্য্যের আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া লাবণ্য-ললিত দেখাইতেছে। সে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল—ঠিক কথা! এই জন্যেই ঋগ্বেদে উষা ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকারকে যমজ অরুণবর্ণ অশ্বিনীকুমার বলা হয়েছে!

বৃদ্ধ ও তরুণী প্রসন্ন হাস্যোদ্ভাসিত মুখ ফিরাইয়া বিলোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং বৃদ্ধ নিজের অন্তর-ভাবের প্রতিধ্বনি শোনার আনন্দে উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভ্রমণ কর্‌লে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার চ্যবনের মতন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকেও নবযৌবন দান করেন। আপনার কি বেদ আলোচনা করা আছে?

বিলোপ লজ্জিত স্মিতহাস্যে বলিল—এবার আমি সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

বৃদ্ধ খুশী হইয়া বলিলেন—বেশ বেশ! এটি আমার মেয়ে। এর নাম মৃদুলা। এও এইবার বি-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট্ ক্লাস সংস্কৃত অনার্স্ পেয়ে সংস্কৃততেই এম-এ পড়ছে। বড় ভালো মেয়ে···নিজের মেয়ে বলে' যে বল্‌ছি তা নয়...ওর মতন...

মৃদুলার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল; সে জানিত তাহার পিতা কন্যার গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করা শক্ত; তাই সে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া অতি মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে ডাকিল—বাবা...

মৃদুলার পিতা কন্যার দিকে প্রসন্ন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—তা এতে লজ্জা কি মা? তুমি যে আমার গর্ব্বের আর গৌরবের সামগ্রী.....

মৃদুলা বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া চকিতে একবার বিলোপের

দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া তিরস্কারপূর্ণ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ বাবা!...

বিলোপ পিতা-পুত্রীর স্নেহদ্বন্দ্ব নীরবে উপভোগ করিতেছিল। মৃদুলার পিতা কন্যার তিরস্কারে কন্যার গুণ-গানে ক্ষান্ত হইয়া বিলোপকে বলিলেন—"আপনি এক দিন [illegible] করে' আমাদের বাড়ীতে আসুন না? শাস্ত্র আলোচনা [illegible] যাবে।" তিনি বিলোপের নির্ব্বাক্ মুখে সম্মতির [illegible]তা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমরা এই [illegible] বেলার উপরেই ঐ যে ইস্পাত-রঙের বাড়ীটা ঐটাতে [illegible]—আমার নাম শ্রীত্রিলোকরাম ভট্টাচার্য্য.....

বিলোপ নম্রভাবে বলিল—যে আজ্ঞে। আমি যাব, [illegible] একটি সর্ত্তে.....

বিলোপের মুখে হাসি দেখিয়া বৃদ্ধও হাসিয়া বলিলেন—[illegible]র্ত্ত বলুন, শুনে দেখি পালন কর্‌তে পার্‌ব কি না।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—আমাকে আপনি 'তুমি' বলে' [illegible]ধন কর্‌বেন.....

ত্রিলোক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভ্রাম্যমান বহু নরনারী সেই অট্টহাস্য শুনিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—এই? তা আচ্ছা, [illegible] যাবে। আজকাল কাউকে তুমি বল্‌তে ভয় হয় [illegible]কে বেয়াদব ভেবে বস্‌বে, কার মানহানি হবে···

আবার অট্টহাস্য। যাহারা তাঁহার কাছাকাছি বেড়াইতেছিল তাহারা সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইয়া আবার ত্রিলোকের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। একজন তরুণী তাহার সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—"উঃ! বুড়োর কি গগন-ফাটানো হাসি!" একজন যুবক তাহার সঙ্গীকে বলিল—বুড়োর হাসি যেন হাঁড়িতে ভরে' এক হালি চীনে পটকায় আগুন দিয়েছে!

ত্রিলোকের এই প্রাণখোলা সরল হাস্য দেখিয়া বিলোপ খুশী হইয়া বলিল—আমার মানহানি হবে না। মান্য ব্যক্তি 'আপনি' বলে' সম্বোধন কর্‌লে আমার অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হয়।

ত্রিলোক বলিলেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বল্‌তেন—কুড়ি বছর বয়স হলেই আজকালকার ছেলে-মেয়েদের আপনি বলা উচিত...to be on the safe side.....

আবার অট্টহাস্য। ত্রিলোকের অট্টহাস্যের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবে বিলোপ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছিল। তাহার মুখে খুশীর আভাস দেখিয়া মৃদুলার মুখও স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়া ও বাড়ীতে যাইবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত আদায় করিয়া তাঁহার কন্যার সম্মুখে আর দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত মনে হওয়াতে বিলোপ ত্রিলোকের কথার পরে হাসির ফাঁকে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—রৌদ্র উঠ্‌ল, এখন যাওয়া যাক।

বিলোপ কথাটা বলিতে চাহিয়াছিল ত্রিলোককে; কিন্তু তাহার দৃষ্টি মৃদুলার মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বিদায় চাওয়া হইয়া গেল মৃদুলার কাছে। মৃদুলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ হাসিল। সেই হাসি দেখার পর বিলোপের গমনশক্তি বিলোপ হইয়া গেল, কথা অনুযায়ী কাজ করিবার কোনো চেষ্টাই তাহার দেখা গেল না।

ত্রিলোক বলিলেন—তা বাবাজীর নামটি ত আমাদের জানা হয় নি.....

বিলোপ বলিল—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবিলোপচন্দ্র সরকার।

ত্রিলোক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবাজীর এখানে কোথা থাকা হয়?

—আজ্ঞে, ভিক্টোরিয়া হোটেলে।

—একলাই আসা হয়েছে বুঝি?

—না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি এসেছি।

—তা যেদিন আমাদের বাড়ীতে যাওয়া হবে, সেদিন সেই বন্ধুকেও যেন নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরও নিমন্ত্রণ রইল। তিনি আজ বেড়াতে আসেন নি?

—আজ্ঞে না, তিনি উপকথার রাজপুত্র—সূর্য্যদেব উঠে সোনার কাঠি না ছোঁয়ালে তাঁর ঘুম ভাঙে না...

ত্রিলোকের আবার অট্টহাস্য। তিনি হাসিয়া লইয়া বলিলেন—তা হলে ত তাঁর সঙ্গে সমুদ্র-তীরে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই; এক দিন তা হলে বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে গেলে আমরা সুখী হব।

বিলোপ হাসিয়া বলিল—তাই একদিন যাব।

ত্রিলোক হাসিমুখে বলিলেন—আচ্ছা, এখন তবে বিদায় হই, পুনর্দ্দর্শনায়।

বিলোপ নীরব হাসিমুখে ত্রিলোককে এবং পরে মৃদুলাকে নমস্কার করিল।

মৃদুলা নম্র লজ্জিতভাবে প্রতিনমস্কার করিয়া পিতার পাশে পাশে চলিতে লাগিল।

বিলোপ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতে লাগিল মৃদুলার অপস্রিয়মান মূর্ত্তিকে। মৃদুলা খানিক দূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া একবার পিছন দিকে দেখিল। বিলোপের মনে হইল মৃদুলা তাহাকেই দেখিতে চাহিতেছে। তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই সে তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিয়া উঠিল—প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুর্ ইব বামনঃ গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্, কারণ এ ফল forbidden fruit in the Garden of Eden—ক্বঃ ভট্টাচার্য্যবংশশ্চ ক্বঃ সরকারসুতশ্চাহম্—ক্বঃ দ্বয়ং মহদন্তরম্ সুচয়তঃ। যদি কর্ণের মতন বল্‌তে পার্‌তাম—সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায় স্তু পৌরুষম্!

বিলোপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

মৃদুলা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় আর-একবার পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিলোপ যেদিকে দাঁড়াইয়া ছিল সেইদিকে দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিলোপের আবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, সে মনে মনে বলিয়া উঠিল—'মনু সে যে ভারতমন্যু' সত্যেন দত্ত ঠিক বলে' গেছেন, আজ আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

আশা কুহকিনী তাহার কানে কানে বলিয়া গেল—যে ব্যক্তি তাহার মেয়েকে অত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছে সে হয়ত জাতের বিচার নাও করিতে পারে।

বিলোপ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিল। সে ত্রিলোকের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই গেল, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বিলোপ যখন বাসায় ফিরিয়া গেল তখন মলয় ঘুম থেকে উঠিয়াছে, বসিয়া বসিয়া নিবিষ্টমনে সিগারেট টানিতেছে। বিলোপকে দেখিয়াই মলয় বলিয়া উঠিল—সূর্য্যোদয় দেখা হল?

এই প্রশ্ন হইবা মাত্রই সূর্য্যচ্ছবির পরিবর্ত্তে মৃদুলার মুখ বিলোপের মনের মধ্যে উদিত হইল। সে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল—অরুণদেবকে কেমন দেখ্‌তে?

বিলোপ হাসিয়া বলিল—সুন্দরী প্রেয়সীর হাসিমুখের মতন।

মলয় উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—বাহবা! সংস্কৃত কাব্য পড়া তোমার সার্থক হয়েছে!

বিলোপ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, আজ আমি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বিলোপের এই কথার অর্থ মলয় বুঝিল যে সূর্য্যোদয় দর্শনে কাব্যরসিক বিলোপ আনন্দলাভ করিয়াছে। কিন্তু বিলোপের মনের মধ্যে যে অর্থ গুপ্ত ছিল তাহা হইতেছে এই যে ভাগ্যে সে সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাই সে অনায়াসে মৃদুলার পিতার সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া বাড়ীতে যাইবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত পাইয়া আসিয়াছে।

মলয় বিলোপকে জিজ্ঞাসা করিল—কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল?

বিলোপ বলিল—না। তবে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে চেনা হল।

মলয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে সে? Anybody interesting?

বিলোপ একটু থামিয়া বলিল—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক···

মলয় হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—বুড়ো। তার কথা অশ্রাব্য.....সংস্কৃত কাব্য পড়া তোমার নিরর্থক হয়েছে—ভোর বেলা গিয়ে এক বুড়োর সঙ্গে আলাপ কর' এলে? আর কারো সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌লে?

বিলোপ ক্ষুণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল—না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।

মলয় একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাল ফুলাইয়া বলিল—তবে আর তোমার কথা শুন্‌তে চাই না।

বিলোপ আর কিছু বলিল না। মলয় বলিল—চলো চা খেয়ে আসা যাক। অনেকক্ষণ ব্রেক্‌ফাষ্টের ঘণ্টা পড়ে' গেছে।

বিলোপ বলিল—চলো।

দুই বন্ধুতে চা খাইতে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ব্রেজিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা জাতি হিসাবে এখনও ঠিক গড়ে উঠ্‌তে পারে নি। তবে তারা যে এদিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। যে জাতি ধীরে ধীরে ক'রে গড়ে উঠ্‌ছে তাদের ইতিহাস ও তাদের কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক। যৌবনের চঞ্চলতার ত্রুটি তাদের আছে বটে, তেমনি তার যতরকম সুবিধা—অর্থাৎ যৌবনের উৎসাহ, উত্তেজনা, নব নব পথের সন্ধান জানবার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ এবং প্রাচীন পদ্ধতির নাগপাশ ও সাবেক ধারার মোহ ছিন্ন ক'রে এগিয়ে যাবার একটা অদম্য প্রবৃত্তি তাদের সব দিক দিয়ে সাহায্য ক'র্‌ছে।

দুটি ছেলে।
(এরা ব্রেজিলের আদিম অধিবাসীদের সন্তান। হাতে জলহস্তীর দন্ত-নির্ম্মিত কঙ্কন। পায়ে কড়ির মল। গলায় লম্বা লম্বা লাল কাঁঠির মালা!)

দক্ষিণ আমেরিকায় অধিকাংশ প্রদেশে স্পেনের প্রভাবটাই খুব বেশী প্রবল দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রেজিল সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। কারণ, ব্রেজিল সেকালে পোর্ত্তুগীজদের দখলে এসেছিল; সুতরাং সেখানকার ভাষা আজও পোর্ত্তুগীজ র'য়ে গেছে। যেমন—পেরু, আর্জ্জেন্টিনা, চিলি প্রভৃতি প্রদেশে স্পেনীয় ভাষাই এখনও প্রচলিত রয়েছে! কিন্তু পোর্ত্তুগীজরা যদিও স্পেনীয়দের চেয়ে বরাবরই সকল বিষয়ে বেশী উৎসাহী, তথাপি জাতি হিসাবে তাদের এই উৎসাহ কোনও দিনই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে গিয়ে উঠতে পারে নি। কারণ, তাদের সেই

মিশ্র-বর্ণের দু'টি ছেলেমেয়ে।
(পোর্ত্তুগীজ ও নিগ্রো সম্মিলনে এদের উৎপত্তি।)

অন্তর্নিহিত শক্তিটুকুই ছিল না—যার জোরে উন্নতির পথে জাতির গতি অবাধ অবিচঞ্চল ও ধ্রুব হ'তে পারে। সুতরাং পোর্ত্তুগীজের অধীন থাকলেও ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার স্পেন-অধিকৃত কোন দেশের চেয়েই খুব বেশী এগিয়ে যেতে পারেনি।

ব্রেজিলের অধিবাসীদের কৃষিকার্য্যটাই জীবন ধারণের

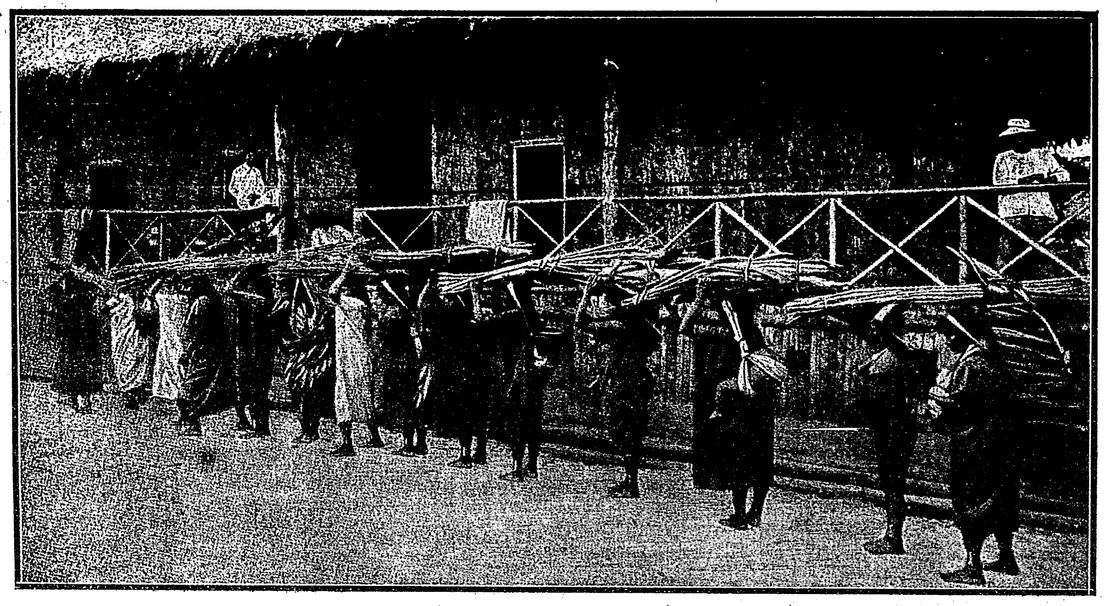

মজুরনীর দল। (এরা কারখানা থেকে কাজ ক'রে ফিরছে।)

নৌ-বহরের পোত-সৈন্যের মিছিল।

প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠেছে। কফি, রবার ও ইক্ষুদণ্ডের চাষই সেখানে প্রধান। এই তিনটি জিনিসের রপ্তানি ব্রেজিল থেকে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কেবল মাত্র এই তিন রকম জিনিসই উৎপন্ন করে ব্রেজিল অদূর ভবিষ্যতে ধনী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। এ ছাড়া ব্রেজিলের ধনাগমের আর একটা প্রধান উৎস হ'চ্ছে সেখানকার গো-মেষাদি পশু ব্যবসায়। রায়ো গ্রাণ্ডে হ'চ্ছে এই পশুব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। টিনের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্ষিত গোমাংসের বিরাট কারবারও সেখানে পত্তন হয়েছে। য়ুরোপকে তার খাদ্যের জন্য এখন অনেকখানি নির্ভর করতে হয় এই দক্ষিণ আমেরিকার চাষাদের উপর।

ব্রেজিলীয়ানরা উত্তর আমেরিকার ব্যবসায়ীদের কাছেই এ পশু পালনের কারবার শিখেছে। এখনও ব্রেজিলের অধিকাংশ পশুব্যবসায়ের মালিক উত্তর আমেরিকাবাসীরা। দক্ষিণ আমেরিকায় পশু-ব্যবসায়ের আর একটি বড় কেন্দ্র হ'চ্ছে 'সাওপৌলো'। এখানকার ব্যবসাটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর হস্তগত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতিপয় উৎসাহী নব-দেশ-আবিষ্কারকের চেষ্টায় এই 'সাওপৌলো' সহর স্থাপিত হয়েছিল। তাদের বংশধরেরা আজও এখানে 'পৌলিস্তা' নামে পরিচিত। 'পৌলস্ত' ঋষীর সঙ্গে এদের পূর্ব্বপুরুষের কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না, সে কথা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ব'লতে পারেন! এই সাও-পৌলো সহর ও তার বিখ্যাত বন্দর "সান্তো" যে আজ এতখানি প্রাধান্য লাভ ক'রেছে, এ কেবল তাদেরই যত্নে ও চেষ্টায়। ব্রেজিলের ব্যবসায়ের উন্নতির মূলে এদের শক্তি ও অধ্যবসায়ই খুব বেশী কাজ করেছে। পৌলিস্তারা এখনও এ অঞ্চলের সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়ে আছে। তাদের স্বাধীন ও উন্নত চরিত্রই অপর জাতির চেয়ে তাদের এই মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

এ দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, প্রথম অবস্থায় পোর্ত্তুগীজেরা এসে রেড্‌ইণ্ডিয়ান-দের বশীভূত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রছে। নিগ্রোরা তখন নিরপেক্ষ থেকে উভয়েরই ইচ্ছানুরূপ সাহায্য ক'রতো। ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় দেখা গেল যে, নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ানরা ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পোর্ত্তুগীজদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ ক'রছে। ফলে শীঘ্রই পরস্পরের সংমিশ্রণে এক নূতন মিশ্র জাতির উদ্ভব সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে থেকে এই নব জাতি একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, একটা প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা, একটা সত্বর শিক্ষা করবার গুণ লাভ ক'রলে। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে তারা তাদের প্রবল ভাবপ্রবণতা ও অসীম ধৈর্য্য পেলে; আর নিগ্রোরা দিলে তাদের সহৃদয়তা, অন্তরঙ্গতা ও পারিবারিক স্নেহবন্ধন।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক জার্ম্মাণ, ইটালিয়ান, পোল প্রভৃতি ব্রেজিলে এসে পড়েছে। জার্ম্মাণরা সেখানে তাদের একটা ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছে বললেও হয়। জার্ম্মাণ চাল-চলন, রীতি-নীতি-পদ্ধতি পূরো মাত্রায় বজায় রেখে তারা সেখানে বাস করছে। পোলরাও তাদের একটা আলাদা পল্লী ক'রে নিয়েছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণদের মতো তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও সচেষ্ট নয়। ইটালিয়ানরা কেউ চিরদিনের জন্য ব্রেজিলে বসবাস ক'রতে চায় না; যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেই তারা দেশে ফিরে আসে। সুতরাং ব্রেজিলের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেনি। তবে সে দেশের আবহাওয়ার প্রভাব যে কতকটা—দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে, তাদের উপর ও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির উপর পড়ে না—এমন কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বে ব্রেজিলের যে নব-সৃজিত মিশ্রজাতির কথা বলেছি, তাদের অস্তিত্ব যে দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না এ কথা ঠিক। কারণ সেটা—ওই ফরাশী-দেশের চেয়ে পনেরগুণ বড় এবং পূর্ব্ব যুগের রুষ সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রায় সমান—এতবড় একটা বিশাল দেশের পক্ষে সম্ভবও নয়। ব্রেজিলের মধ্যে এখনও দূরে দূরে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে বহুলোকে বাস করে, অথচ ব্যবসায় ক্ষেত্র ও কর্ম্ম কেন্দ্র হ'তে সে সব স্থান এত তফাতে যে, রেলপথের অভাবে এবং নদীপথের সুবিধা না থাকায়, তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা অবশ্য সকলেই ইণ্ডিয়ান। এরা নিজেদের মধ্যে সেই সৃষ্টির আদিম ভাষায় কথা বলে। থাকে এমন সামান্য ভাবে—যে কোনও সহরেরই তারা মুখাপেক্ষী নয়। এদের চেয়ে নিকটতর কতকগুলো প্রদেশে কেবল নিগ্রোদের বস্তি।

এই নিগ্রোরা বরং ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক বিষয়ে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে বলা যেতে পারে।

উৎপন্ন হ'তে পারে। 'কদলি-কানন' অর্থাৎ কলা গাছের একেবারে জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায় এই ব্রেজিলে। আনারস

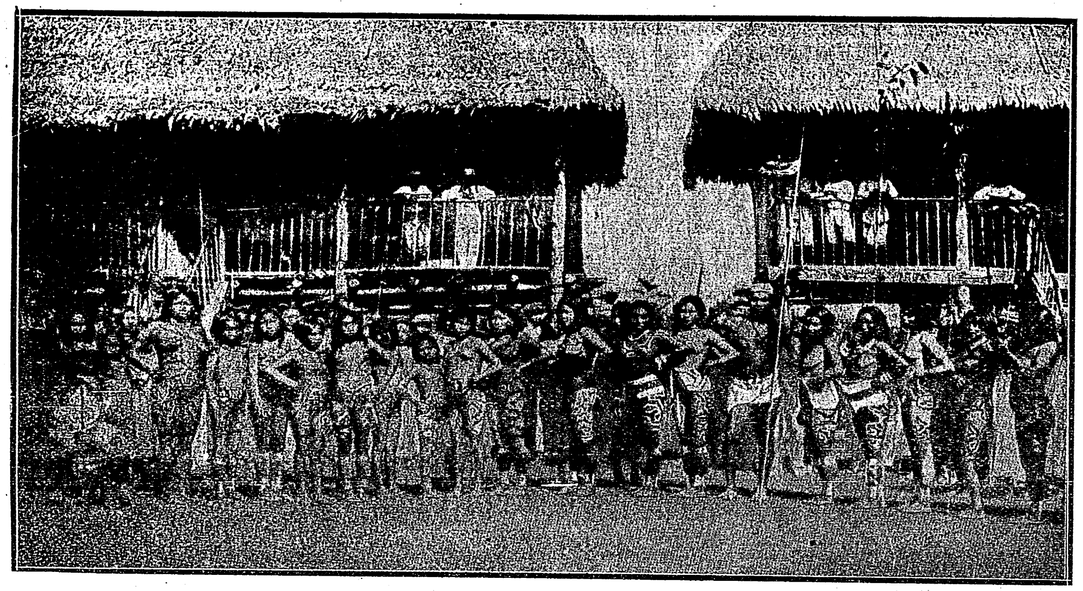

বিবাহ উৎসবের নৃত্যকারিণীগণ।

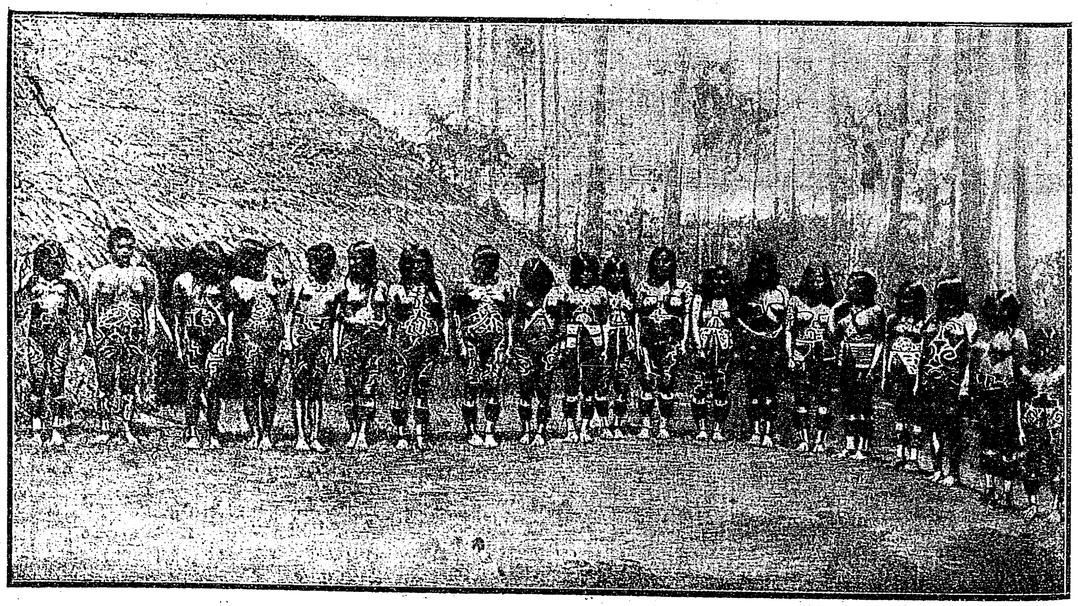

ধর্ম্মোৎসবের নৃত্যকারিণীগণ।

ব্রেজিলের মৃত্তিকা এমন প্রখর উর্ব্বরা যে, জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তা অতি অল্প আয়াসেই সেখানে এত অপর্য্যাপ্ত সেখানে হয় যে, কেবল এই ফলেরই চাষ করে সেখানে অনেকে বড়লোক হয়ে যেতে পারে। তুলা

সেখানে জমী চষে বুনতে হয় না; শুধু নখে আঁচড়ে বীজ ফেলে দিলেই যথেষ্ট। কাজে কাজেই সেখানে নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ানদের জীবন ধারণের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার ক'রতে হয় না। বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। অনায়াসে লব্ধ ফলমূল খেয়ে তারা বেশ সুখে থাকে।

কিছু দিন থেকে বিদেশী বণিকেরা এসে সেখানে চাষ-বাসের খুব বড় রকম ফ্যালাও কারবার ফেঁদে বসায়, তাদের অবস্থার আরও একটু সুবিধা হয়ে গেছে। জীবিকা সম্বন্ধে বলে সেখানে কেউ মজুরী খাটতে চায় না; অথচ যারা গিয়ে সেখানে চাষের কারবার সুরু করেছে—জন মজুরের সাহায্য না পেলে তাদের কারবার চলে না, কাজেই তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে মজুর সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই মজুর সংগ্রহ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা রীতি-মতো প্রতিযোগিতা চলে। আমাদের বাগানে বা আমাদের ক্ষেতে কাজ ক'রলে আমরা প্রতি মজুরকে এত ক'রে মজুরী দেবো, তা ছাড়া—এই এই জিনিস উপহার দেবো—এই রকম প্রলোভন দেখিয়ে একজন হয়ত মজুর সংগ্রহের চেষ্টা ক'রছে;—আর একজন তাদের ব'লে পাঠালে—ওরা যা দেবে ব'লছে আমি তার চেয়ে তোমাদের মজুরীও বেশী দেবো এবং উপহারও বাড়িয়ে দেবো—তোমরা আমার কাছে কাজ ক'রবে এসো!' এইভাবে মজুর নিয়ে সেখানে টানাটানি প'ড়ে যায়। কাজে কাজেই এরাও সেই সুযোগটা ষোল আনা ভোগ করে নেয়। যাদের ওখানে খাটুনী কম, মজুরী বেশী, ব্যবহার ভাল, উপহার পছন্দসই, সেইখানেই তারা কাজ ক'রতে যায়।

পূর্ব্বে এখানে ক্রীতদাস পাওয়া যেতো। তারাই এই মজুরের কাজ করতো। তাদের উপর কিন্তু সে সময় ভীষণ অত্যাচার চলতো। তাদের কেউ পেট ভরে খেতে পরতে দিত না। চাবুক মেরে দিন রাত জানোয়ারের মতো খাটিয়ে নিতো। কেবল একজন প্রভুর হুকুম তামিল করলেই তাদের অবস্থা নিশ্চিন্ত ছিল না; অনেককে তিন চারজন মনিবের হুকুম পালন ক'রতে হ'তো। কাজেই অত্যাচারটাও তাদের ভোগ ক'রতে হতো সেই অনুপাতে। এমন কি শতকরা দশজন ক'রে ক্রীতদাস তখন কেবল অমানুষিক অত্যাচারের চাপেই মারা যেতো।

ব্রেজিলের অধিকাংশ প্রদেশ এখনও গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। কোনও মানুষ এ পর্য্যন্ত সে অরণ্য ভেদ ক'রে তার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেনি। মনুষ্য-বাসের কাছাকাছি যে সব জঙ্গল আছে, তার গভীরতাও বড় কম নয়। আকাশস্পর্শী বিরাট বনস্পতি-সমূহ এখানে যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে প্রতি দিন প্রবল তেজে বেড়ে উঠছে! এই সব বনস্পতিকে বেষ্টন ক'রে আবার ঘন-পল্লব-বিশিষ্ট লতাজাল বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে অসম্ভব সত্বর বিস্তৃত হয়ে পড়ছে! কাজেই জঙ্গলের মধ্যে সেখানে চিরান্ধকার বিরাজমান। বিচিত্র উজ্জ্বল পক্ষরাজি সমন্বিত নানা বর্ণের বিহঙ্গ, রকমারি রঙিণ প্রজাপতির পাল, সেখানে প্রতি দিন দেখতে পাওয়া যায়। বানরের উৎপাত সেখানে উত্তর ভারতের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, এবং বিষাক্ত সর্প ও সরীসৃপের দংশন আশঙ্কাও সেখানে প্রতি পদক্ষেপে আছে। সেখান-কার আবহাওয়াটাও কেমন যেন ভিজে ভিজে ও ভারি ঠেকে! বাতাসের গন্ধটাও যেন স্যাঁৎসেঁতে মনে হয়! রাত্রে বেশ গা ছম্‌ছম্ করে। একটা ভয়-ভয় ভাব, একটা অস্বস্তির অশান্তি যেন সর্ব্বদাই অনুভব ক'রতে হয়।

পূর্ব্বে সেখানে দেশের শাসন-পরিষদই রেল-পথ বিস্তারে অর্থ-সাহায্য ক'রতো; কিন্তু এখন তার প্রয়োজন হয় না। রেল-কোম্পানী করা সেখানে একটা খুব লাভজনক ব্যবসা প্রমাণ হওয়ায় এখন অনেকগুলি যৌথ-কোম্পানী সেখানে রেলের কারবার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

শাসন-পরিষদের মন্ত্রীরা সবাই জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবো ব'লে নির্ব্বাচনের আগে ইস্তাহার জারি করেন বটে, কিন্তু কাজের মধ্যে কতকগুলো ইস্কুল করা ছাড়া তাঁরা আর বিশেষ কিছুই ক'রতে পারেন নি। যারা লেখাপড়া জানে এমন লোক ছাড়া আর কেউ ভোট দিবার অধিকারী নয় বলে একটা বিধিও সেখানে প্রচলিত আছে; তবু লেখাপড়া শেখবার আগ্রহ সেখানে খুব বেশী লোকের দেখতে পাওয়া যায় না। ইস্কুলে প'ড়ে সেখানকার ছেলেরা যা না শিখতে পারে, খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনলে ও গল্প করলে তার চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞান তারা লাভ করে। বক্তৃতা শুনতেও তারা যেমন ভালবাসে, বক্তৃতা ক'রতেও

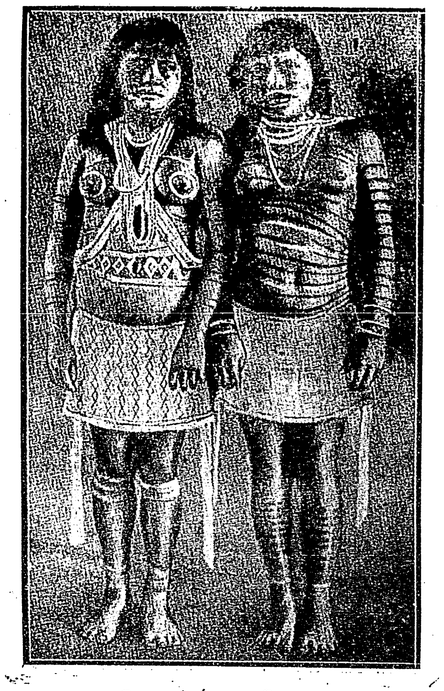

সুসজ্জিতা 'বৈবৈ' তরুণীযুগল।
(নৃত্যোৎসবের জন্য এরা প্রস্তুত হয়েছে। 'বৈ বৈ' মেয়েরা সর্ব্বদা নগ্ন অবস্থায় থাকে না।)

সুসজ্জিত 'বৈবৈ' পুরুষদ্বয়!
(এরা আমাজনের অধিবাসী বীর কিন্তু স্ত্রীলোকদের মতো মাথার চুলে ফুল পরে, গলায় হার দেয়, হাতে পায়ে কঙ্কণ বাজু ও মল পরে।)

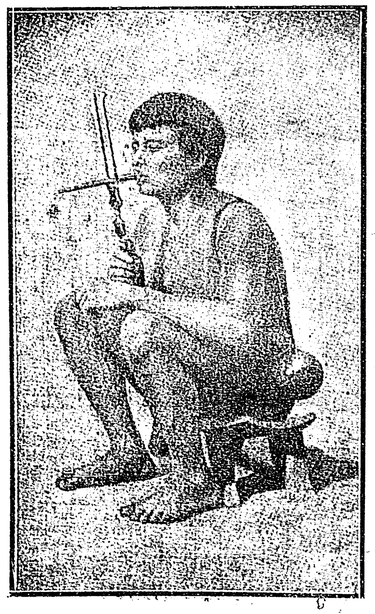

সৌখীন 'তুকানো'। ('তুকানো' শ্রেণীর এই ইণ্ডিয়ান ভদ্র লোকটির পরিধানে বস্ত্র নেই বটে, কিন্তু চুরুটের আধারটি যে কোনও সভ্য দেশের শিল্পকার্য্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রতে পারে।)

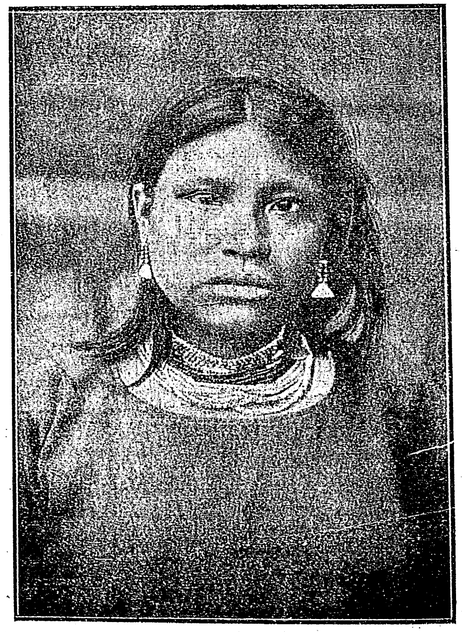

আমাজনের কিশোরী।

তারা সেই রকমই পাগল! নূতন কোনও মতলব ঠাওরাতে ও নূতন কিছু বরণ করে নিতে তারা খুবই তৎপর। এবং সেই নূতন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করতেও তারা একেবারে দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু তাদের এই উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। শীঘ্রই তাদের আগ্রহ শিথিল হয়ে যায় এবং সে নূতন মৎলবটাও অনাদৃত প'ড়ে থাকে।

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা তাদের মধ্যে খুব বেশী শুনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা তারা কারও প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ বা আক্রোশ-বশতঃ ক'রে না। বড্ড বেশী বকা বা কথা কওয়া তাদের স্বভাব ব'লে' তারা বাধ্য হ'য়ে অনেক

কাসাবার ছাতু তৈরি।
(রুটি করবার আগে কাসাবার বিষমুক্ত মূলকে গুঁড়িয়ে ছাতু ক'রে নিচ্ছে এই দুটি শক্তিশালিনী আমাজন যুবতী।)

সময় প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুদের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনাও ক'রে থাকে। তবে তাদের সে আলোচনার মধ্যে এত বেশী হাস্য পরিহাস ও রসিকতার সমাবেশ থাকে যে, সেটা নিন্দা ও কুৎসার কুরূপ ধারণ করবার কিছুমাত্র সুযোগ পায় না। একজন শিক্ষিত ব্রেজিলিয়ান যদি উত্তেজিত হয়ে না পড়ে, তাহলে তার মতো শান্ত ও সুবিবে-চক লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তারা নিরুপদ্রব থাকতেই ভালবাসে, দাঙ্গাহাঙ্গামা মোটেই পছন্দ করে না। কোনও লোককে বা কোনও শ্রেণী বিশেষকে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা বা স্বত্বদান করতে তারা কিছুতেই স্বীকৃত হয় না। সামাজিক ভেদাভেদ বা উচ্চ নীচ অথবা ধনী দরিদ্রের পার্থক্য তারা একেবারেই মানতে চায় না। যে সভ্যতার হিসাবে অর্থই মানুষের কদর ও মূল্য নির্দ্ধারণের একমাত্র মাপকাটি রূপে পরিগণিত, দক্ষিণ আমেরিকায় আজ সেই সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সূচনা দেখে তারা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত।

ব্রেজিলিয়ানদের ব্যবহার বেশ ভদ্র, তাদের জীবন-যাত্রার ব্যাপার বেশ সহজ ও সাদা-সিধে। তবে মফঃস্বলের জমীদার যারা, তারা যখন সহরে বেড়াতে আসে, তখন অনেক পয়সা অপব্যয় করে।

তাদের সৌজন্য, উদারতা ও সহ্যগুণ ছাড়া তাদের অতিথি-বৎসলতাও একটা উল্লেখযোগ্য গুণ। তারা লোকের সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলে মেশে এবং সহজেই তাদের অন্তরঙ্গ করে নেয়। দুই বন্ধু বা নিকটাত্মীয়তে পথে সাক্ষাৎ হ'লে তারা শুধু করমর্দ্দন করেই ক্ষান্ত হয় না, পরস্পরকে অনুরাগ ভরে আলিঙ্গন করে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, এরা জাতি হিসাবে একটু অলস প্রকৃতির। তবে ভবিষ্যদ্বংশধরেরা সে আলস্যটুকু যে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়নি এটা বেশ বোঝা যায়, তাদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম প্রভৃতিতে উৎসাহ দেখে। চেহারাটাও তারা টেনেটুনে ইংরেজ ও আমেরিকানদের মতো চাঁচা-ছোলা ও ফিট্‌ফাট্ ক'রে তুলেছে। কিন্তু এদের দেশের আবহাওয়া যে রকম, তাতে এদের পক্ষে খুব বেশী পরিশ্রমী বা খাটিয়ে লোক হ'য়ে ওঠা অসম্ভব। যারা যৌবন অতিক্রম ক'রে এসেছে, তারা অধিকাংশই মোটা হয়ে পড়েছে; এবং এদের মেয়েদের স্থূলাঙ্গী হওয়াটাই হ'চ্ছে সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান লক্ষণ! এদের মেয়েরা য়ুরোপীয় মেয়েদের মতো তত বেশী বাইরে বেড়িয়ে বেড়ায় না। অধিকাংশ সময়ই তারা বাড়ীতে ব'সে কাটায়। ব্রেজিলিয়ান স্বামীরাও এটা মোটেই পছন্দ করেন না যে তাদের স্ত্রীরা স্বামীর অনুপস্থিতিকালে গৃহের বাহিরে থাকেন। কাজে কাজেই ব্রেজিলিয়ান মেয়েরা বাড়ীতে

রবারের তাল পাকানো

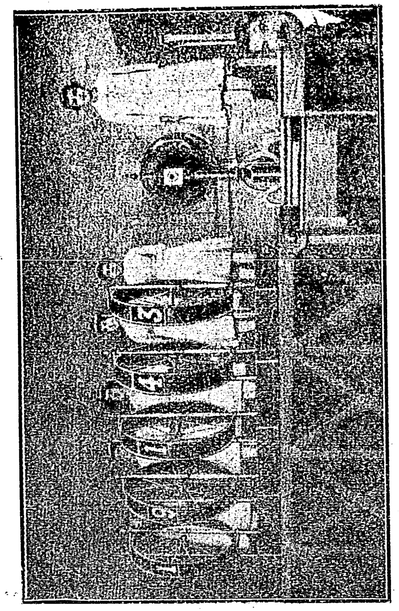

ভাগ্যচক্র !
(ব্রেজিলের একটি যে কোনও জুয়া খেলার ক্লাবে প্রবেশ করলেই এ দৃশ্য দেখা যায়)

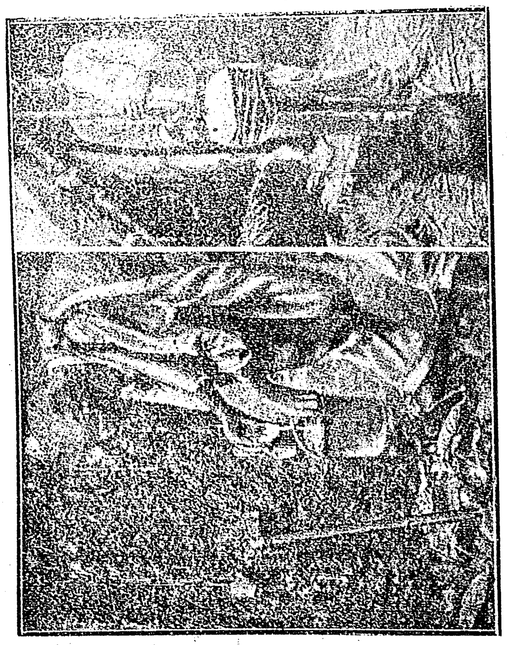

রবার গাছের আটা সংগ্রহ

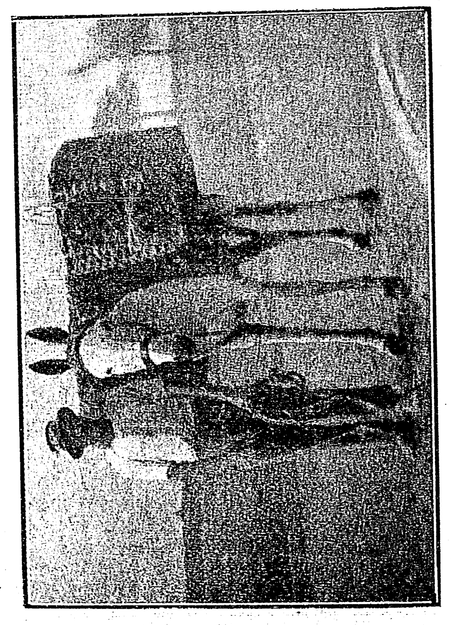

জুয়ার আড্ডাওয়ালা !

এক ঢিলে গাউন প'রে আর একজোড়া চটি জুতো পায়ে দিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা থাকেন। যখন বাইরে কোথাও যাবার দরকার হয়, তখন বটে তাঁরা খুব ঘটা ক'রে সাজগোছ ও অঙ্গ-প্রসাধন করেন। নইলে বাড়ীতে তাঁরা মোটেই ফিট-ফাট হ'য়ে থাকেন না। ব্রেজিলিয়ান পুরুষেরা কিন্তু খুব বাবু। সেখানে পথে বেজায় ধূলো বলে অধিকাংশ লোকই একটা করে 'ধূলোট-জামা' (Dust cloak) হাতে করে পথে নিষ্ক্রান্ত হন। ঠাণ্ডা জলে দুবেলা স্নান করাটা এদের অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মতো এদেশের লোকের দিবানিদ্রার অভ্যাস একেবারেই নেই।

প্রাতরাশটা এদের মধ্যে অতি সামান্য জলযোগমাত্র। একটু কফি, এক টুকরো পাঁউরুটি এবং কিছু ফল এইমাত্র। যারা কাজকর্ম্ম উপলক্ষে সহরের বাইরে থাকে, তাদের বারটা থেকে দশটার মধ্যেই ভোজন সেরে নিতে হয়। কারণ মফঃস্বলের কাজ-কর্ম্ম সকাল সকাল সুরু হয়ে যায়। তদিকে বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে তারা 'ডিনার' খেয়ে নেয়। সহরের লোকেরা কিন্তু লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মতো বাঁধা সময়ে খাওয়া দাওয়া করে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্রেজিলিয়ানদের মধ্যে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চার পাঁচ ভাই বিবাহ ক'রে এক সংসারেই বাস ক'রছে, এরকম দৃষ্টান্ত ব্রেজিলে বিরল নয়। ছেলেপুলেরা অতিরিক্ত আদর পায় বলে প্রায়ই অশিষ্ট হ'য়ে ওঠে।

জুয়া খেলাটা ব্রেজিলে খুব বেশী। একটা কোনও কাজের জন্যে এক সঙ্গে অনেক টাকার দরকার হ'লেই, সেখানে গভর্মেণ্ট পর্য্যন্ত লটারীর টিকিট বেচে টাকা তোলে। এখানকার বা অন্য দেশের গভর্মেণ্টের মতো সুদ দিতে চাইলেই তারা সাধারণের কাছ থেকে ঋণ পায় না। লটারী বা সুর্ত্তি-খেলা ছাড়া আরও অনেক রকম জুয়া খেলা সেখানে প্রচলিত আছে। জুয়া খেলার বিরুদ্ধে সে দেশের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও পর্য্যন্ত কোনও আইন-কানুন গড়ে ফেলেন নি। তাই সেখানকার ছোট বড় প্রত্যেক সহরেই একাধিক জুয়ার আড্ডা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রেজিলের ধর্ম্ম-যাজকেরাও কেউ এই সর্ব্বনাশকর জুয়া খেলা বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করেন না, তার প্রধান কারণ এখানে ধর্ম্ম-যাজকদের কেউ বড় মান্য করে না। গির্জ্জায় উপাসনার দিন মেয়েদেরই ভিড় হয় বেশী। পুরুষদের সংখ্যা নিতান্ত কম। ব্রেজিলিয়ানরা কোনও ধর্ম্মেরই গোঁড়া নয় বলেই বোধ হয় তারা সর্ব্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান। সেখানকার জনসাধারণ গির্জ্জায় যায় না বটে, কিন্তু তারা কেউ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী নয়। প্রায়ই সেখানে যে সব ধর্ম্ম সংক্রান্ত উৎসব উপলক্ষে মিছিল বাহির হয়, ব্রেজিলের জনসাধারণ মহা উৎসাহে তাতে যোগ দেয়। পূর্ব্ব-

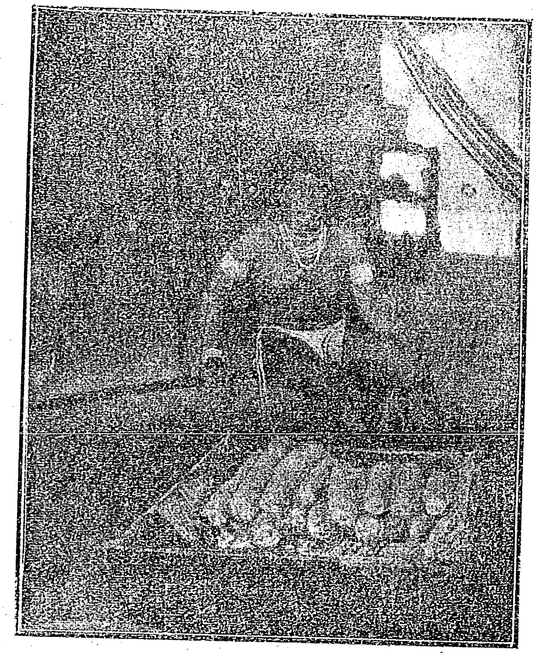

কাসাবার রুটি।
(আমাজন-গৃহিণী কাসাবার মূলে অনেকগুলি সুগোল রুটি তৈরি করেছেন।)

পুরুষের ধর্ম্ম তারা সহজে ত্যাগ করতে চায় না। এমন কি সে ধর্ম্মে তার আস্থা না থাকলেও, সে কুলপ্রথা অনুসারে সেই ধর্ম্মেই দীক্ষিত হ'তে একটুও ইতস্ততঃ করে না।

সঙ্গীতের দিক দিয়ে ব্রেজিলিয়ানদের যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি, এ কথা যারাই তাদের গীতবাদ্য শুনেছে, তারাই স্বীকার করবে! অথচ সঙ্গীতের চর্চ্চা যে তারা কিছু কম করে এমন নয়। প্রায় প্রত্যেক সহরেই

বাঁশীর ওস্তাদ্
(পাশাপাশি পাঁচটা বাঁশী এক সঙ্গে বাজাচ্ছে বিভিন্ন সুরে অথচ harmony রেখে !)

বাসনওয়ালা।
(এরা বিদেশী লোক, বিদেশী বাসনই ফেরী ক'রে বেচ্‌ছে।)

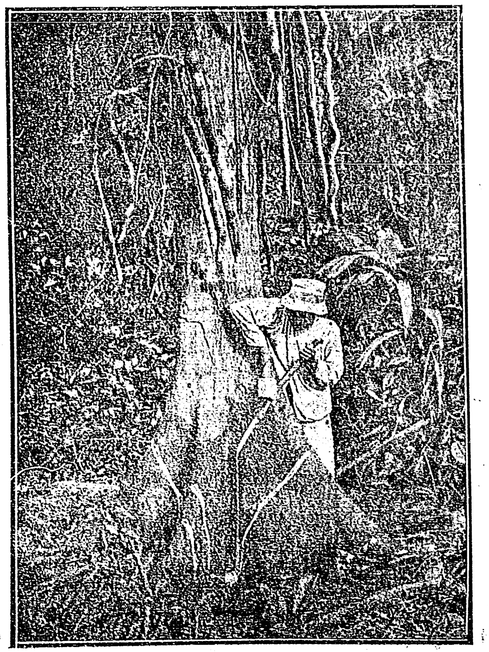

রবার গাছ।

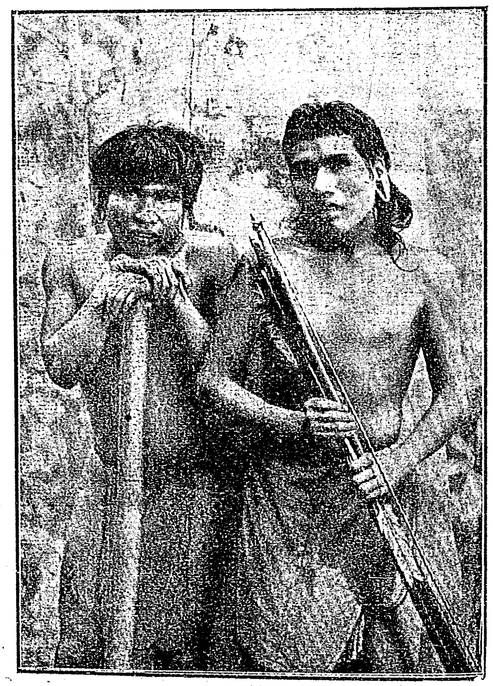

প্রাচীন আরুয়াক্ শিকারীদ্বয়।

"গিউনিসিপ্যাল ব্যাণ্ড" আছে। এরা প্রত্যহ সাধারণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য সহরের 'বাদ্য-বেদীতে' (Band stand) এসে বাজায়। ব্রেজিলের রেডইণ্ডিয়ান্‌রা তাদের বাঁশী ও ঢোল নিয়ে যে রকম মেতে ওঠে—যুদ্ধের সঙ্গীত শুনে সৈনিকেরা তেমন ক্ষেপে ওঠে না! ইণ্ডিয়ানদের রীতি-নীতি ও প্রকৃতি সকল শ্রেণীর সমান নয়। তাদের মধ্যে কোনও দল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কারিগর বা শিল্পী হিসাবে বেশ সুদক্ষ। আবার কোনও দল একেবারে এত নোংরা এবং এমন নির্ব্বোধ

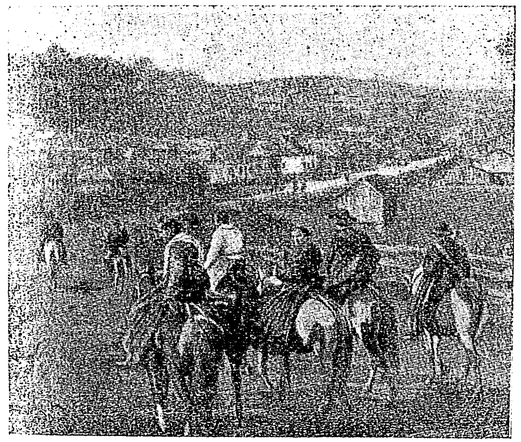

অশ্বারোহী প্রবাসী পোর্ত্তুগীজের দল।

যে, মানুষের সেই আদিম অবস্থার বর্ব্বরতা থেকে তারা এখনও এক পা'ও এগিয়ে আসতে পারে নি! সময় সময় অন্য কিছু খেতে না পেলে তারা গাছের পাতা, শিকড় এবং সাপ-ব্যাঙ্‌ও খেয়ে থাকে।

শ্বেতাঙ্গেরা সে দেশে পদার্পণ করবার আগে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা যে একটা বেশ সরল, সবল, সুস্থ, সুন্দর ও নিষ্পাপ জাত ছিল, সে বিষয়ে আর কোনও ভুল নেই। শ্বেতাঙ্গরা তাদের মধ্যে এসে পড়বার পর তাদের কাছ থেকে তারা কতকগুলো ভীষণ বলক্ষয়কর ও জাতি-বিধ্বংসী সর্ব্বনেশে নেশা করা ছাড়া আর কিছুই বিশেষ শিখ্‌তে পারে নি; বরং উল্টে তাদের জানা অনেক জিনিস তারা ভুলে যাচ্ছে! তাদের নিজেদের অনেক আচার ব্যবহার তারা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের অনেক স্বাভাবিক গুণ তারা হারিয়ে বসেছে, প্রকৃতির অযাচিত দানে তারা স্বভাবের শিশুর মতো যে অটুট স্বাস্থ্য ও অগাধ সন্তোষের অধিকারী ছিল, তার অনেকখানি তারা আজ অবহেলায় নষ্ট ক'রে ফেলেছে। নানা উদ্ভিদ্ ও দ্রব্য গুণে তারা আগে যে কোনও ব্যাধি ও ক্ষত অতি সত্বর আরোগ্য ক'রে ফেলতে পারতো। তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি-বিশিষ্ট পশুর মতো তারা পূর্ব্বে দেশান্তরের অপরিচিত পথ অনায়াসে চিনে চ'লে আস্‌তে পারতো, বিবাহার্থী যুবারা আগে বীর্য্য-শুল্কে কন্যা গ্রহণ ক'রতো! সে সব তারা আজ আর পারে না বটে, অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকেও যে তারা বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'য়েছে সে কথাও বলা চলে না। এখনও অনেক স্থানে ইণ্ডিয়ানরা ঠিক বন্য পশুর মতো দল বেঁধে বাস করে। তাদেয় মধ্যে এক একদল এখনও পাথরের কুঠার, তীর-ধনুক এবং জাল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জনকতককে ধরে একবার সভ্য করবার চেষ্টা করা হয়েছিল,—বেশ ক'রে

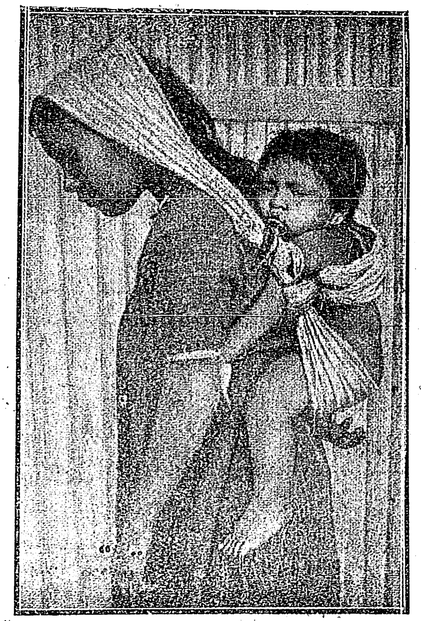

কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে। (শিশু-পুত্রকে পৃষ্ঠদেশে ঝুলিয়ে নিয়ে, তরুণী ইণ্ডিয়ান্ জননীরা কর্ম্মস্থলে যাত্রা করে।)

সাবান মাখিয়ে, নাইয়ে ধুইয়ে, ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়ে, এবং উৎকৃষ্ট খানাটানা খাইয়ে রাখা হ'চ্ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাদের মধ্যে একজন লোক ছাড়া আর কারুরই এ সুখ সহ্য হ'ল না। সবাই মরে গেল! এরা সামনের

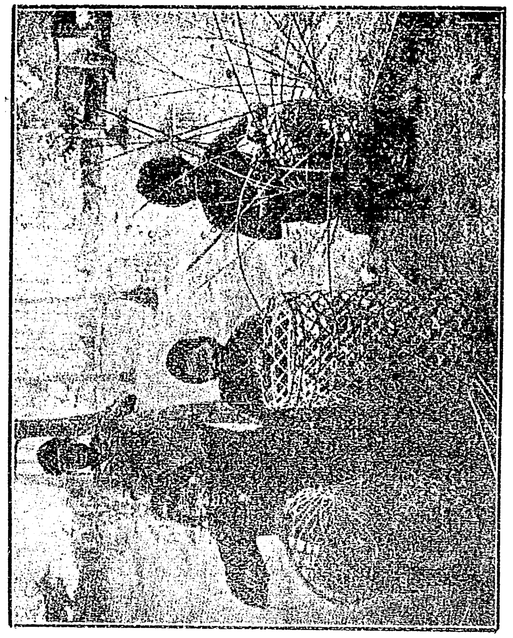

বেতের কাজ (আমাজনরা বেতের ঝুড়ি বুনছে।)

কফির বীজ।

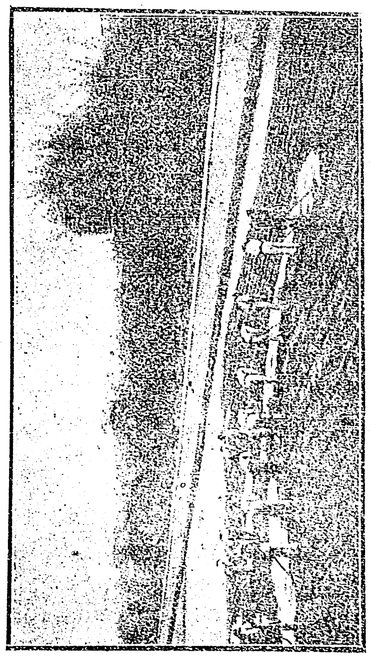

খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া। (বীজগুলি একটু নরম হ'লেই, ঘুসে নিয়ে শুরু স্থানে ফেলে তাকে দু'পা' দিয়ে থেঁৎলাতেই খোসা ছেড়ে যায়।)

হীরক-সন্ধানীরা।

(১৭২১ খৃঃঅব্দে এই খানে প্রথম হীরক পাওয়া যায় ব'লে এ স্থানের নাম হ'য়েছে 'দায়মণ্ডিনা'। এখানকার নদীগর্ভে এখনও হীরক খুঁজে পাওয়া যায়; তাই এক দলের পেশাই হ'চ্ছে হীরকের সন্ধান করা।)

চুল ছেঁটে ফেলে মাথায় পালক গেঁথে পরে। এরা আঁখির পল্লব ও ভ্রূযুগলের কেশ উৎপাটন ক'রে ফেলে এবং অঙ্গ চিত্রবিচিত্র ক'রে নিজেদের যথাসম্ভব কুৎসিত করে তোলে!

আমাজন নদী-কূলের ইণ্ডিয়ান মেয়েরা পায়ের ডিমটাকে ফুলিয়ে বড় করবার জন্যে উপর নীচেয় দড়ি

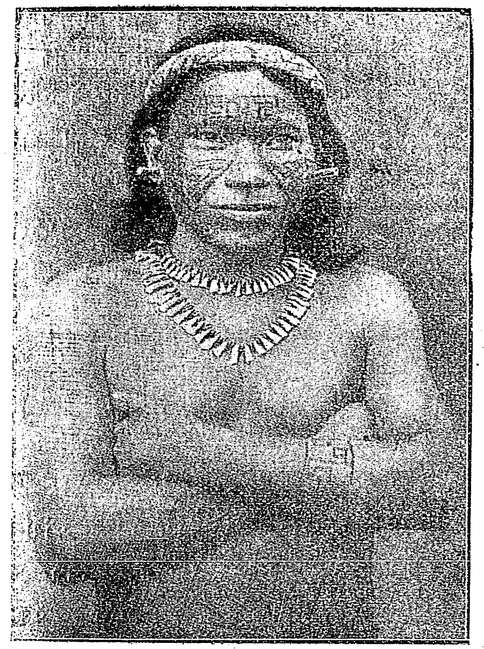

উৎসব-বেশে আমাজন যুবা!

বেঁধে রেখে দেয়। যাদের ওটা আগে করা হয়না, তারা কাদা মাটির তৈরি রং করা একটা নকল পায়ের ডিম নিজেদের পায়ের ডিমের উপর বেঁধে রাখে। কোন কোন দলের পুরুষদের মধ্যেও এই দুর্ব্বলতা আছে। আমাজনের ইণ্ডিয়ানদের রীতি-নীতি, প্রকৃতি ও সামাজিক চাল-চলন সম্বন্ধে এখনও অনেক জিনিস জানবার বাকী আছে। স্পেন গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা জয় করবার বহু কাল পূর্ব্বে এই আমাজন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যে একটা বেশ উঁচুদরের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল এখন তার অনেক সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে! জগতে বীর-নারীর কাহিনী কি এখান থেকেই প্রথম সৃষ্ট হ'য়েছিল? এই শক্তিময়ী আমাজন বালাদের বীরত্ব-গাথায় একদিন আমাজন নদীর উভয় কূল মুখরিত ছিল।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মতো দক্ষিণ আমেরিকার এই আমাজনদের মধ্যেও বালক-বালিকাদের সাবালক হবার পূর্ব্বে বহু কঠিন ও দুঃসাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে তারা বয়ঃপ্রাপ্তদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করে। আমাজনদের মধ্যে নৃত্য-উৎসবটাই হচ্ছে প্রধান। এই নৃত্য উৎসবে নাবালকরা যোগ দিতে পায় না। এদের এই নৃত্য উৎসব কেবলমাত্র একটা আমোদের ব্যাপার নয়, এটা তাদের একটা ধর্ম্মানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। এই নৃত্য-উৎসবের জন্য তাদের অনেক দিন আগে থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়, উপবাস ক'রে নয়, বলকর ও পুষ্টিকর উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রচুর পরিমাণে আহার ক'রে! কারণ, এই নৃত্য উৎসব এত দীর্ঘকাল ধরে চলে যে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমানেরা ছাড়া আর সকলেই উৎসব শেষ হবার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে! বিবাহ উপলক্ষে এদের নাচ সাত দিন অবিশ্রান্ত চলে। কোনও কোনও ধর্ম্ম-উৎসবের নাচ পনেরো দিন পর্য্যন্ত চলে।

আমাজন নদী পৃথিবীর একটি সবচেয়ে বড় নদী। পূর্ব্বেই বলেছি এদেশ অসাধারণ উর্ব্বরা। সে আমাজনেরই

ছাতু ছেঁকে ফেলা। (রুটি তৈরি করবার আগে কাসাবার ছাতু উত্তমরূপে ছেঁকে নিতে হয়।)

জলের গুণে! এখানে ধান, গম, কলা, মূলো, আম, কমলালেবু, তুলো, রবার প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ভৈষজ্য উদ্ভিদ্ এত রকমের এখানে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর বহু ঔষধের উপাদান এরাই সরবরাহ করে। আমাজনের এক আশ্চর্য্য সম্পদ হচ্ছে এখানকার দুধের গাছ! এই গাছের কাণ্ডে শলাকা বিদ্ধ ক'রলেই অতি

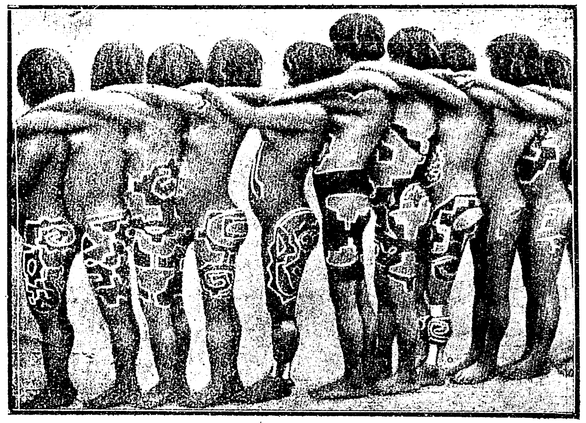

আমাজন রমণীদের সর্পনৃত্য। (এই চিত্রিত-অঙ্গ নগ্ন বালিকারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পরস্পরকে পিছন থেকে আলিঙ্গন করে এমন ভাবে তীর্য্যকগতিতে নৃত্য করে, যেন মনে হয় এক বিরাট সর্প নৃত্য ক'রছে!)

সুমিষ্ট ঘন দুগ্ধ পাওয়া যায়। ব্রেজিলের বিখ্যাত বাদাম ইংরাজদের অতি প্রিয় খাদ্য।

এখানে বন্যজন্তুদের উৎপাত ভয়ানক। বিষাক্ত সর্প, হিংস্র ব্যাঘ্র, খর-নখর গৃধ্র, রক্তশোষক বাদুড় প্রভৃতির অত্যাচার এখানে অত্যন্ত বেশী। আমাজন অরণ্যের সম্পদও যেমনি প্রচুর, বিপদও তেমনি অসংখ্য। এখানকার পিপীলিকা আমাদের দেশের পিপীলিকার চেয়ে দশগুণ বড় এবং বিষাক্ত। এখানকার প্রকাণ্ড মাকড়সা তেড়ে এসে কামড়ায়। কর্কট-কীট অজ্ঞাতসারে চর্ম্ম ভেদ করে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এখানকার ফড়িংগুলো উচ্চিংড়েগুলো পর্য্যন্ত এমন ডাকে যেন ইঞ্জিনের হুইস্‌ল বাজ্‌ছে! আবার রঙীণ অর্কিডের সুন্দর ফুল, নানা বিচিত্র বর্ণের মনোহর প্রজাপতি এবং গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্পিত লতা-গুল্মরাজির শোভা এ দেশের অরণ্যকে নন্দনকাননের সৌন্দর্য্য এনে দিয়েছে!

ব্রেজিলের লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটী হবে, কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের বেশী নয়। এখানকার বাড়ীগুলি সব বেশ সাদাসিধে চৌক ধরণের। তবে প্রত্যেক বাড়ীখানির সঙ্গেই একটু ক'রে বাগান আছে। বাড়ীগুলি মজবুদ্ ক'রবার দিকেই এদের লক্ষ্য বেশী। শোভার দিকে তত দৃষ্টি নেই। সাদা সবুজ এবং লাল এই তিন রকম রঙের বাড়ীই এখানে বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক গীর্জ্জারই দু'টী ক'রে চূড়ো।

এখানকার গ্রামবাসীরা এবং শ্রমিক বা মজুর শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ ভাত কিম্বা কালো-শিম সিদ্ধ করে খেয়েই জীবনধারণ ক'রে থাকে। শুনো

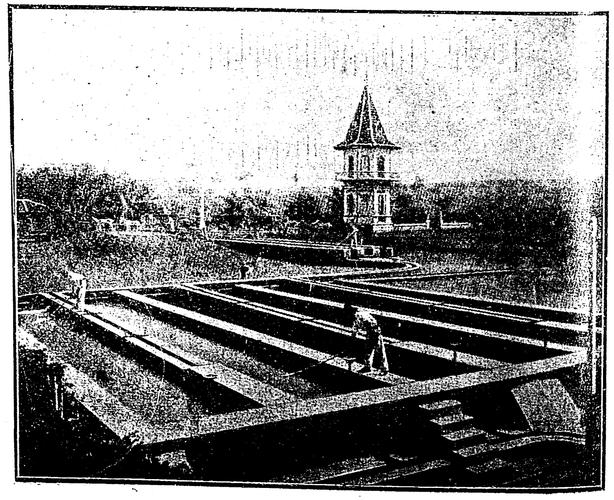

কফি বীজ পচানো। (জলে ভিজিয়ে এই বীজের খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।)

নোনা গোমাংসই এদের একমাত্র আমিষ ভোজন। শূকর-মাংসও এরা মাঝে মাঝে খায়; কিন্তু সে ভাতের সঙ্গে কিম্বা শিমের সঙ্গেই সিদ্ধ ক'রে নেয়; পৃথক রাঁধে না। ভেড়া এখানে প্রচুর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভেড়ার মাংস এরা খেতে পায় না; কারণ ভেড়ার মাংস সমস্তই রপ্তানী হ'য়ে যায়।

ব্রেজিলের খনিজ সম্পদও বড় কম নয়। এখনও সব উদ্ধার হয়নি। হীরক ও স্বর্ণটাই এখানে বহু দিন থেকে খনিত হচ্ছে। কোনও ব্যবসাতেই এখানে কেউ একচেটিয়া অধিকার পায় না। ব্রেজিলের রাজধানী ও প্রধান সহর রায়োডি জেনায়ইরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর যে কোন রাজধানীকে পরাস্ত করতে পারে। মেঘস্পর্শী বিরাট শৈলমালার ক্রোড়ে, তার পাশি কতকগুলি চমৎকার উপসাগরের মনোহর তীরে এই নগরটি স্থাপিত। এই

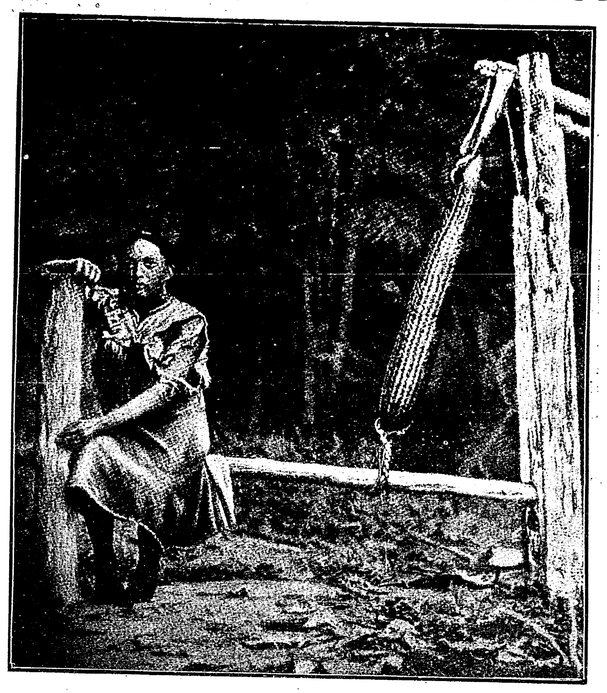

ব্রুশ, ঝাড়ণ ও বেতের চেয়ার-বিক্রেতা!

বিষাক্ত মূল নির্ব্বিষ করা!

(কাসাবার মূল নিংড়ে তার বিষাক্ত রসটা বার করে দিয়ে ব্রেজিলের ইণ্ডিয়ানরা তাইতে রুটী তৈরী ক'রে খায়। বিষাক্ত রসটি নিংড়ে বা'র ক'রে ফেলবার এই কলটি ওদের ভারি চমৎকার। এই তরুণী তার শরীরের ভারে ঢেঁকিতে চাপ দিয়ে ওই বেতের বোনা খোলটি একবার টেনে লম্বা ক'রছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। এই উপায়ে ঝুড়ির অভ্যন্তরস্থ শিকড়গুলি শীঘ্রই বিষাক্ত রস থেকে মুক্ত হ'য়ে খাদ্যোপযোগী হ'য়ে ওঠে!)

নগর-প্রান্তের একটি গিরিশৃঙ্গের (The Sugarloaf) উপর 'তার-বর্ত্ম' সংলগ্ন আছে। এই তারবর্ত্মে বিলম্বিত শকটে আরোহণ করে পর্ব্বতের উপরে যাওয়া যায়। তারবর্ত্মবাহী শকটগুলি মোটর ইঞ্জিনের শক্তিতে চলে! রায়োর আর একটি বিরাট পর্ব্বতের নাম হ'চ্ছে 'কর্কোভেদো'। এই

পর্ব্বতের শিখর হ'তে দুই সহস্র ফীট নিম্নে শায়িত রায়ো নগরীর শোভা অতি চমৎকার দেখায়। এখান থেকে দূরে মেঘের আবছায়ার মধ্যে অর্গাণ পর্ব্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শৃঙ্গটি এমন কৃশ ও দীর্ঘ হয়ে উপরে

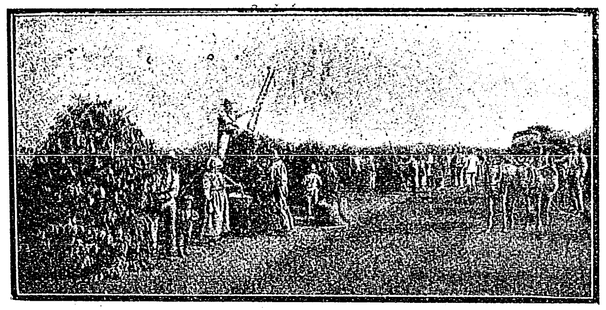

কফির চাষ
(পৃথিবীর বারো আনা কফি ব্রেজিল সরবরাহ করে।)

উঠেছে যে ঠিক যেন আকাশের বুকে অঙ্গুলি সঙ্কেতের মতো দেখায়! তাই ব্রেজিলবাসীরা এটাকে বলে শ্রীভগবানের তর্জ্জনী-হেলন। রায়ো সহর প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহরের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নয়। রায়োর 'ন্যাশানাল লাইব্রেরী' তত্ত্ব-অনুসন্ধানী সুধী মনীষীদের একটা লোভনীয় গ্রন্থাগার! এখানে পাঠকদের জন্য যেরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা আছে, জগতের অন্য কোনও গ্রন্থাগারে সেরূপ নেই! ব্রেজিলিয়ান ছাত্র ও পণ্ডিতেরা তাই লণ্ডন মিউজিয়মের পাঠাগারে ঢুকেও হাঁফিয়ে ওঠে!

ব্রেজিলে সংবাদপত্রের প্রচলনটা খুব বেশী। প্রায় প্রত্যেক সহরেই দু'একখানা ক'রে খবরের কাগজ ছাপা হয়। রায়ো, ও সাওপাউলো প্রভৃতি সহরে একাধিক রঙ্গালয় আছে। সাওপাউলো হ'চ্ছে ব্রেজিলের দ্বিতীয় প্রধান সহর। এর লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। সাওপাউলোতে নানা বিভিন্ন জাতির বসবাস আছে। এই সহর থেকে দু'খানি ফরাসী, একখানি জার্ম্মাণ, একখানি স্পেনীয়, একখানি সিরীয় এবং একাধিক পোর্ত্তুগীজ ও ইতালীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এখানকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি ইংরাজী ও একটি আমেরিকান ইস্কুল আছে। অন্যান্য ইস্কুলের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।

ব্রেজিলের বিখ্যাত বন্দর 'সান্তো'র পরই 'বাহিয়া' বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য!

বাহিয়া বন্দর থেকে ব্রেজিলের অনেক জিনিস রপ্তানী হয়। তার মধ্যে তামাক, চিনি ও কোকোই প্রধান। আর একটা জিনিস এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়, সেটার নাম হ'চ্ছে "মাতে"। মাতে একরকম গাছের পাতা। দক্ষিণ আমেরিকা-বাসীরা ঠিক চা' খাবার মতোই এই মাতে-সিদ্ধ জল পান করে। মাতের গাছগুলি দীর্ঘ। দশ বারো ফুট থেকে বিশ পঁচিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু প্রচুর পত্র-পল্লবে গাছগুলি এমন ঝাঁকড়া হ'য়ে ওঠে যে, সেগুলি এত যে লম্বা, তা মোটেই চোখে পড়ে না! এখানকার আদিম অধিবাসীরা এই মাতে-গাছগুলির পূজা করে। এরা সেখানে আমাদের দেশের বট-অশথের মতো পবিত্র শ্রেণীর বৃক্ষ। মাতের পাতা শুকিয়ে নিয়ে বিক্রয় করা হয়। অনেকে আবার শুষ্ক পাতাগুলি গুঁড়িয়ে চূর্ণ

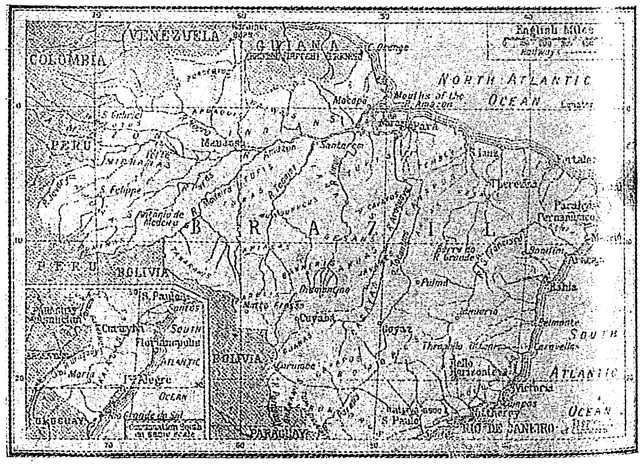

ব্রেজিলের মানচিত্র

করে নিয়ে বিক্রয় করে। মাতের চাষ করবার জন্য বিশেষ কিছু পরিশ্রম করতে হয় না। অল্প চেষ্টাতেই প্রচুর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। একটা পাত্রে মাতের শুষ্ক পাতা কিম্বা মাতে চূর্ণ রেখে তার উপর খানিকটা খুব গরম

জল ঢেলে দিয়ে পরে একটা নল কিম্বা খড় ডুবিয়ে টানে।

মাতে পান করলে শুধু শরীরটাই চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে না, শরীরের পুষ্টিসাধনও হয় এবং রক্ত শোধনও করে। এর একটা অজীর্ণতা আরোগ্য করবারও শক্তি আছে। অতি মাংস ভোজনের কুফলও মাতে পান করলে বিদূরিত হয়। ফরাসী স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সমিতি (The French Societe de Hygiene) মাতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রত্যেক অধিবাসীরই 'মাতে' সেবন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দাম খুব বেশী নয়, বিলেতে এক পাউণ্ড এক শিলিং দামে বিক্রয় হয়। এক পাউণ্ড 'মাতে' কিনে অন্ততঃ একশ' জনকে পান করানো চলে।

একুশ থেকে চুয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমের মধ্যে কিছু দিন সৈনিক ভাবে কার্য্য করবার জন্য এখানকার প্রত্যেক পুরুষ আইন অনুসারে বাধ্য। এদের সামরিক বিভাগে নৌবহরও আছে।

দুর্দ্দশা

চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর দশাপ্রাপ্তি
ভাবের নহে ;—অভাবের—অর্থাৎ.....

মনের পরশ *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১

মানুষ ভাবে এক হয় আর। নইলে কে ভেবেছিল যে পল্লব সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষটায় সঙ্গীত-চর্চ্চায় জীবন নিয়োগ করবে? জীবনে কোন্ পথ বেছে নেবে সে সম্বন্ধে সে বয়সের ও মনের নানান্ অবস্থায় নানারূপ ভেবেছিল বটে—(কার না ভাব্‌তে হয়?)—কিন্তু সঙ্গীতকেই মূলতঃ জীবনের ব্রত স্বরূপ করবে, এ কথা যে তার মনে স্বপ্নেও স্থান পায় নি, সেটা বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যেতে পারে।

শৈশবে তার ঠাকুরদাদা তাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, সে বড় হ'লে কি হ'তে চায়। সে অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিল, 'রহিম খাঁ কোচমান।' সে সময়ে রহিম খাঁর পাশে কোচবাক্সে বসে সে প্রায়ই তার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার আলোচনা করত। এর কিছু দিন পরে পল্লবের উচ্চাশা তার পিতার মোটর-চালকের সম্মানজনক পদবীকেই একান্ত ভাবে আশ্রয় ক'রেছিল। তার পরে আরও বড় হ'লে সে ভাব্‌ল ঠাকুরদাদার মতন ডাক্তার হবে। তার পর ভাব্‌ল পিতার মতন জজ হবে। তার পর মনের নানান খেয়ালে সে যথাক্রমে ঠিক্ করল সিভিলিয়ান, কমিশনর, ব্যারিষ্টার, আরও কত কি হবে। শেষটায় সাব্যস্ত হ'ল এঞ্জিনিয়ার হবে। সেজন্য সে গণিতে মন দিল। ডিগ্রী পরীক্ষায় যখন ফল ভালই হ'ল, তখন তার পিতা অনুপম পুত্রকে তার ইচ্ছামত এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত পাঠালেন। তিনি নিজে দাসত্বের রজ্জু গলায় দিয়ে অবধি ভেবেছিলেন, পুত্রকে আর যাতেই নিযুক্ত করুন না কেন, চাকুরিতে নিযুক্ত করবেন না। তাই পল্লবের বিলাতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবার ইচ্ছায় তিনি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। পল্লবও তরুণসুলভ রঙীন স্বপ্ন দেখ্‌ল যে, এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে রাতারাতি সে লক্ষপতি হয়েছে; অর্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে লালায়িতা রাজকন্যা তাকে বরণ করেছে; সে দেশের ও দশের একজন হয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পিতার জ্বলন্ত আদর্শবাদে চাকুরি কিরূপ পদে পদে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হ'য়েছিল তা দেখে, ও আশৈশব তাঁর কাছ থেকে চাকুরির লাঞ্ছনার কথা শুনে তার দাসত্বের স্বর্ণশৃঙ্খলে দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল। এঞ্জিনিয়ারিং—স্বাধীন পেশা। আর টাকাও আছে;—যেহেতু "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এ কথা শাস্ত্রেই আছে। তাছাড়া, পল্লবের বিলেতে আসার সময়ে ধারণা ছিল যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন শুধু পুরুষত্বের নয়, মনুষ্যত্বেরও একটা প্রধান লক্ষণ। কারণ, পল্লব তার সাধ্যমত নানারকম দিক্ দিয়ে ভেবে চিন্তে ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে স্থির ক'রেছিল যে, টাকা নইলে দেশের কোনও বড় কাজই হয় না। আর 'বাঙালী শুধুই কেরাণী হয়'! সে দেখাবে যে, বাঙালী চাকুরির সুযোগ স্বেচ্ছায় পায়ে ঠেলে, স্বাধীন পেশা বেছে নিতে পারে। পল্লব কখনই অপর পাঁচজনের একজন হবে না। অসামান্যতা অর্জ্জন করার স্বপ্ন দেখ্‌তে কোন উচ্চাশী বালক না ভালবাসে? পল্লবের তরুণ মনও ডিগ্রী নিয়েই আকাশকুসুম রচনা করতে সুরু ক'রে দিল। সে খ্যাতনামা হয়ে দেশের ও দশের একজন রূপে গণ্য হয়েছে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মুখোজ্জ্বল ক'রেছে, পিতার বুক তার

* আর্ট বা চরিত্রচিত্রণ আমার এ উপন্যাসটির উদ্দেশ্য নয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের মধ্যে কারুর কারুর মন কি ভাবে সাড়া দেয় সেটাই. খানিকটা বাস্তব ও খানিকটা কল্পনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে, সাধ্যমত ফুটিয়ে তোলা আমার লক্ষ্যস্থল। তরাং নিছক উপন্যাসের মাপকাটি বা তুলাদণ্ডে এ উপন্যাসটির মূল্য-নির্দ্ধারণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।—যেহেতু এর লক্ষ্য ও আদর্শ ভিন্ন।

সাফল্যে দশ হাত হয়ে উঠেছে, সকলেই ধন্য ধন্য করছে—আরও কত কি! পুত্র যে একটা মানুষের মতন মানুষ হবে, এ বিশ্বাস অন্য সব পিতার মতন অনুপমেরও ছিল। তাঁর নিজের জীবনের অনেক রঙীন আশাই বাস্তবের কঠোর পরিহাসে ধূলিসাৎ হয়েছিল। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, পুত্র যাতে তাঁর অকৃতকার্য্যতার অভিজ্ঞতা হ'তে দেখে শেখে—(যাতে তাকে আবার তাঁর মতন ঠেকে শিখ্‌তে না হয়)—সে দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌বেন। তাঁর নিজের চাকরি করতে হয়েছিল অনেকটা বাধ্য হ'য়ে, কারণ তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, উপার্জ্জনক্ষম না হ'লে পুত্রের বিবাহ দেবেন না। তিনি ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক। সুতরাং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের শত অনুরোধ ও সাবধান-বাণী উপেক্ষা ক'রে অনুপম পুত্রকে ২১ বৎসর বয়সেই অবিবাহিত অবস্থায় বিলেত পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। তিনি মনে প্রাণে উদারপন্থী লোক ছিলেন, যদিও তাঁকে আজীবন চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনির জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হ'তে হয়েছিল বলে তিনি সমাজে অনেক ছোট বড় সংস্কার-কার্য্যেই যোগদান করবার সময় পেয়ে ওঠেন নি। তাই অনেকটা এ অক্ষমতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর উদারপন্থা মাতৃ-হারা পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে দিতে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। ফলে পুত্রের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, পুত্রকে তিনি রূঢ় কথাও প্রাণ ধ'রে বল্‌তে পারতেন না। তাঁর শাসন-শৈথিল্যের জন্য তাঁর নিকটবন্ধু বা আত্মীয়েরা তাঁকে মাঝে মাঝে ভৎর্সনা করলে তিনি বল্‌তেন যে, পিতামাতা সন্তানকে অধিকাংশ স্থলেই শাস্তি দিয়ে থাকেন নিজেদের রাগ বা বিরক্তিকে সংবরণ করতে পারেন না ব'লেই—তাকে সৎপথে চালিত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়। কাজেকাজেই এরূপ শাসনে সুফলের চেয়ে কুফলই হ'য়ে থাকে বেশি। তার ওপর পুত্র শৈশবেই মাতৃহারা হ'য়েছিল ব'লে, তিনি তাকে শাসন করবার প্রেরণা বড় একটা মনের মধ্যে খুঁজে পেতেন না। পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি সাধ্যমত বাধা দিতেন না। তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক্‌তেন—তার দায়িত্বজ্ঞানকে সব চেয়ে শীঘ্র জাগিয়ে তুল্‌তে। তিনি অল্প কথার মানুষ ছিলেন। পল্লব যেদিন বিলাত যাত্রা করে, সেদিন তিনি তাকে কোনও উপদেশ দেন নি বা বিলেতে কি ভাবে জীবন যাপন করতে হবে সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি;—শুদ্ধ এই কয়টি কথা বলেছিলেন "তোমার যা ইচ্ছে হয় হোয়ো, যা ইচ্ছে হয় পোড়ো; কেবল যা করবে সেটি মন দিয়ে কোরো; এইটুকু মাত্র আমার কামনা। তোমার কোনও আন্তরিক বাসনায় আমি বাধা দেব না, বা তোমার ইচ্ছায় শুধু আমার অনিচ্ছার ওজরে অমত করব না—এ কথা নিশ্চয় জেনো।" অন্তরীক্ষ থেকে কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁর এ কথা শুনে হেসেছিলেন কি না জানা নেই। তবে পল্লব যখন বিলেত থেকে চিঠি লিখ্‌ল যে, সে ইঞ্জিনিয়ারও হবে না, ডাক্তারও হবে না, হবে—গায়ক, তখন যে সে তার পিতা অনুপমকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, এ কথা জানা গেছে।

যাহোক্, পল্লব লিখ্‌ল যে, সে সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে ও সেটা আবার বিলাতী সঙ্গীতশাস্ত্র। বাড়ীতে চিটিক্কার প'ড়ে গেল। সঙ্গীতে কি আবার পড়ার কিছু আছে না কি? গান গাওয়ার জন্য যে পড়াশুনোর কিছু দরকার থাক্‌তে পারে, তা যদিই বা পল্লবের উদার প্রতিবেশী এক আধজন বুঝলেন, কিন্তু তার জন্য যে রাশ রাশ টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে বিলেত যাবার দরকার থাক্‌তে পারে, এ কথা কারুরই বোধগম্য হ'ল না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে অনুপম ছিলেন—কম কথার মানুষ। এরূপ লোক সচরাচর যখন একবার মন স্থির করে, তখন সহজে তার কথার নড় চড় হয় না। অনুপমও পুত্রের এরূপ ইচ্ছায় প্রথমটা হৃদয়ে গভীর আঘাত পেলেও তাঁর প্রতিজ্ঞা হ'তে যে বিচলিত হবেন না, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁর বেশি দেরি হয় নি। কেবল এ সংবাদ পেয়ে তাঁর সবল মনেরও আক্ষেপ হ'তে লাগল যে যদি এ সম্ভাবনার কথা তাঁর আগে মনে উদয় হ'ত! কারণ পুত্রের সঙ্গীতানুরাগে তাঁর বরাবর সহানুভূতি থাক্‌লেও তাঁর অশেষ আশার পুত্তলী যে শেষটা এরূপ একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কাণ্ড ক'রে বস্‌তে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁর কখনও মনে হয় নি। যাই হোক্, তিনি অনেক চিন্তার পর পুত্রকে লিখ্‌লেন—"তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ আমি করিব না বলিয়া কথা দিয়াছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি নাই। তবে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তোমাকে এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার জোরে দুই একটি মাত্র কথা বলা আমি কর্ত্তব্য

মনে করিতেছি। সেটি এই যে আমাদের দেশে সঙ্গীতকে জীবনে পেশারূপে অবলম্বন করিলে যে পরিণাম শুভ হইবার সম্ভাবনা বড় অধিক নহে, এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা কঠিন। তাই আমার বক্তব্য—বা অনুরোধ, আদেশ নহে—যে তুমি সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ ব্যারিষ্টারিটিও পাশ করিয়া আসিও। স্বদেশে ফিরিয়া তোমার যদি সঙ্গীত-চর্চ্চার সুবিধা না হয়, তবে যাহাতে নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়া না পড়, সেই জন্যই আমি তোমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ অনুরোধ না জানাইয়া পারিলাম না। এ ছাড়া আর আমার কিছুই বলিবার নাই; কারণ উপদেশ আমি তোমাকে কখনই দিই নাই বা দিবও না। কেবল আমার ঐকান্তিক কামনা এই যে, তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতা যেন অটুট রাখিয়া ফিরিতে পার।"

পল্লব এ পত্রের প্রতি ছত্রের মধ্যে স্বল্পভাষী স্নেহশীল পিতার চিরপরিচিত গভীর উদারতা ও নিহিত ব্যথার পরশ অনুভব কর্‌ল। সে উত্তরে লিখল—"আপনি যে আপনার নিজের সম্পূর্ণ অমত সত্ত্বেও আমার ইচ্ছায় বাধা দেন নাই, এজন্য আপনাকে আপনার অযোগ্য পুত্র যে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে তাহা জানে না। এ কৃতজ্ঞতার অপরিশোধ্য ঋণ আংশিকভাবে শোধ করিবার জন্যই আমি ব্যারিষ্টারি পড়িব, যদিও ব্যারিষ্টারি কখনও করিব না।"

অনুপম এ পত্র প'ড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। তাঁর মাতৃহারা পুত্রকে তিনি কখনও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করান নি—এমন কি পড়াশুনোও নয়। সৌভাগ্যক্রমে পল্লবের বাল্যকাল থেকেই বই পড়তে ভাল লাগ্‌ত। সে তার পিতার প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে বসে নাটক, নভেল, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নির্ব্বিচারে পড়ত। অনুপম কোনও বই পড়তেই তাকে বারণ করতেন না। শুধু তাই নয়, পল্লব যতদিন না নিজে থেকে ইস্কুলে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, ততদিন তিনি তাকে ইস্কুলেও পাঠান নি—বাড়ীতে শত কাজ সত্ত্বেও তাকে নিজেই পড়াতেন। পল্লবকে তিনি ইস্কুলে পাঠাবার নামও করতেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধব এতে অনেক সময়ে আপত্তি করলে, তিনি মৃদু হেসে শুদ্ধ বল্‌তেন, "এক দিন ও নিজেই ইস্কুলে যেতে চাইবে।"

হ'লও তাই—পল্লব বার তের বৎসর বয়সে সমবয়সী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই ইস্কুলে যেতে দেখে নিজেই ইস্কুলে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করল। তখন অনুপম পুত্রকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। কলেজেও তিনি তাকে স্বেচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচন করে পড়তে বলেছিলেন। কেবল পল্লব তাঁর মত জান্‌তে চাইলে, তিনি নিজের যা ভাল মনে হয় তা বল্‌তেন। তিনি সর্ব্বদাই বল্‌তেন যে, বালকের মধ্যেও একটা দায়িত্বজ্ঞান সহজে বিকাশ পেতে পারে, যদি তাকে ছেলেবেলা থেকে একটু স্বাধীনভাবে ভাবতে দেওয়া হয়; পিতামাতার কর্ত্তব্য নিজেদের যতটা সম্ভব পিছনে রেখে সন্তানের সহজ দায়িত্বজ্ঞান ও উচিত বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা।

সেই জন্যই অনুপম পুত্রকে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে অনুরোধ জানাতেও সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। কারণ তিনি জান্‌তেন যে তিনি পুত্রকে কখনও আদেশ করেন নি ব'লে তাঁর সামান্য অনুরোধও তার কাছে আদেশের ছদ্মবেশেই নিজের আবেদন জ্ঞাপন করবে। সুতরাং যখন পল্লব পিতার অনুরোধকে সানন্দে সকৃতজ্ঞভাবে পালন কর্ত্তে সম্মত হয়ে চিঠি লিখল, তখন অনুপমের উদার মনটি তাঁর বাধ্য হয়ে আদেশ করার সঙ্কোচের গুরুভার হ'তে মুক্তিলাভ না ক'রেই পারে নি।

(২)

পল্লব অনেকখানি সত্যকার আদর্শ-বাদের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়েই এঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য ঠিক্ নিছক আদর্শবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়েই যে সে এ পথ বেছে নিয়েছিল এ কথা বল্‌লে সত্যের একটু অপলাপ করা হয়। মানুষ জীবনে কোনও গুরুতর পদক্ষেপই বোধ হয় একটিমাত্র মোটা যুক্তির চাপে করে না,—অনেকগুলি জটিল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতেই ক'রে থাকে। পল্লবেরও জীবনের মোড় হঠাৎ ফিরে যায় নি; ফিরে গিয়েছিল—অনেকগুলি কারণে। সে সব কথা ব'লতে হ'লে গোড়া থেকে সুরু করা দরকার।

কৈশোর হ'তে ধীরে ধীরে রঙীন যৌবনের কোঠায় পদার্পণ করার সময়েও পড়া মুখস্থ করাটা বিষময় মনে হয় না এমন মানুষকে বোধ হয় অতিমানুষ পর্য্যায়ভুক্ত করাই বেশি সঙ্গত। পল্লব ছিল—সাধারণ মানুষ। সুতরাং তার ক্ষেত্রেও পরীক্ষা পাশের লোভনীয়তা ও

চতুর্ব্বর্গ-ফল-দায়িত্বের মোহ হ'তে তার মনটি ক্রমশঃ মুক্তি-মুক্তি লাভ করছিল। যদিও সে ছেলেবেলা থেকে সুধী-সমাজে শুনে এসেছিল যে যারা লেখা পড়া করে, এক তাদের ছাড়া অপর কারুর অদৃষ্টে গাড়ী ঘোড়া চড়ার অপার সুখ লেখা বিধাতার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; কিন্তু পরিণত বয়সে সে স্পষ্ট দেখল যে এ কিংবদন্তী শুধু যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনের অভিজ্ঞতা উল্‌টো সাক্ষ্যই দিয়ে থাকে। তার ওপর এমন সময়ে কেম্ব্রিজে তার দুটি উচ্চহৃদয় বন্ধুর দৃষ্টান্ত তার মনকে এত গভীরভাবে নাড়া দিয়ে দিয়েছিল যে তার কাছে পরীক্ষা পাশের কাম্যতা পাণ্ডুর হয়ে না উঠেই পারে নি। এ বন্ধু-যুগলের একজন—মোহনলাল—সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে এসে দেশের সেবার্থে কৃষি শিখ্‌তে লেগে গেল। অপরটি কুঙ্কুম—ব্যারিষ্টারী পড়তে এসে সেটা ছেড়ে হঠাৎ দর্শনশাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করে দিল। মোহনলাল বল্‌ল, নিজে গণ্যমান্য হওয়াই জীবনের লক্ষ্যস্থল নয়, আসল কথা দেশের সেবা। কুঙ্কুমও বল্‌ল, দেশকে বড় করতে হ'লে পরিণাম চিন্তা ত্যাগ ক'রে আদর্শবাদকেই বড় করে দেখ্‌তে শেখা দরকার।

বন্ধু-বৎসল পল্লবের মনটি দুজন প্রিয় বন্ধুর জীবনে আদর্শের এরূপ জাজ্বল্যমান প্রভাব দেখে যে একটু বেশি রকমই বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়।

তবু ছেলেবেলার স্বপ্ন গাড়ী ঘোড়া চড়া, দেশের ও দশের একজন হওয়া, সুবোধ বালক রূপে বিকাশ লাভ করা। ছেলেবেলার ধারণা মন থেকে গিয়েও যায় না। তা ছাড়া দেশ থেকে বাল্য-বন্ধুরা প্রায়ই সোৎসাহে চিঠিপত্র লিখ্‌ত যে তারা কত আশা ক'রে বসে আছে যে পল্লব বিলেত থেকেই একটা মস্ত চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে তাদের সকলের মুখোজ্জ্বল করবে। আত্মীয় স্বজনও ঐ একই ঢঙে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ জাহির করত যে—পল্লব বিলেত থেকে ফিরে এসে রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করবে। পল্লবও যখন বিলেত এসেছিল, তখন এই মান্যগণ্য হওয়া, বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করে মহা দান-ধ্যান করে খ্যাত হওয়া—এই সব তার স্বগণ্ডীর আদর্শেই অন্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কারা কি বাল্যে কি যৌবনে মানুষের আদর্শ খুব বেশির ভাগ মানুষের কাছে প্রচলিত সামাজিক আদর্শের প্রভাব হ'তে একেবারে মুক্তি-লাভ করতে পারে না। তাই দেশে থাক্‌তে পল্লবের মধ্যে এ আদর্শ-সমস্যা নিয়ে বড় একটা দ্বিধা বা প্রশ্নই ওঠে নি।

এমন সময়ে বিলেতে এসে তার পারিপার্শ্বিকের আমূল ওলট-পালট হ'য়ে গেল, যার ফলে তার মনটি বাল্যের আদর্শের গরীয়ানত্ব সম্বন্ধে সংশয়ী হ'য়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বিশেষতঃ, অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনকে উচ্চতর আদর্শের পরশ-পাথরে স্বর্ণবর্ণ হয়ে যেতে দেখার ফলে সে নানান্ ছোট-খাট কথাবার্ত্তা, ইঙ্গিত, ঘটনাকেও এক নতুন চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করল। একই ঘটনার আবেদন মানুষের মনের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পল্লব এক দিন তার এক জাপানী সহাধ্যায়ীকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্‌ল, তার পরীক্ষার পড়া কেমন তৈরি হয়েছে। তাতে সে উত্তর দিল—"পরীক্ষা আবার কি? আমি শিক্ষার জন্য এসেছি—পরীক্ষা দিতে নয়। শিখে দেশে ফিরে যাব। পরীক্ষা দিতে গেলে সময়ের বড় বেশি অপব্যয় হয়।"

পরীক্ষা দেওয়াটা সময়ের অপব্যয়! কথাটা পল্লবের তখনকার সংশয়াকুল, অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে যেন একটা গভীর সমাধানের পূর্ব্বরেশ এনে দিয়েছিল। তার এই কথাটাই তখন কেবল মনে হ'ত। কিন্তু সাহস ক'রে কথাটা মনে এলেও সে মুখে আন্‌তে সঙ্কুচিত না হ'য়েই পার্‌ত না। বাল্যের সংস্কার বড় কঠিন বস্তু ও আশ্চর্য্য রকম ঘাতসহ। আজকাল তার মনটা শুধু পরীক্ষার পড়া নয়, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সব কিছুরই প্রতি যেমন পরীক্ষা-ঘরের খাতা টুল সতর্ক পাহারা প্রভৃতি—বিমুখ হ'য়ে আস্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক সময়ে বিদ্রোহ-উদ্যত মনকে এই ব'লে বোঝাতে চেষ্টা পেত যে পরিণামে যা শুভ তা আপাতঃ-মধুর হয় না। কিন্তু সেই জাপানী যুবকের কথা শুনে অবধি তার সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল যে তাই বলে হয়ত প্রমাণ হয় না যে যা-ই আপাতঃ-মধুর নয় তা-ই পরিণামে শুভ।

এই সব নানান্ চিন্তা তার মনকে একটা মহত্তর আদর্শের অনুসরণ করায় উৎসাহ দিতে লাগ্‌ল। অবশ্য সে প্রণোদনাটা নিছক্ আদর্শবাদের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা মস্ত লোভ ছিল কুঙ্কুম ও মোহনলালের বাহবা পাবার। তাদের আদর্শবাদের পাশে তার

নিজের জীবনের আশা ও আদর্শ এখন তার বড় বেশি নিষ্প্রভ মনে হ'তে লাগ্‌ল। তার মন তাকে ক্রমাগতই বল্‌তে লাগ্‌ল যে এরূপ বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখ্‌তে হলে শুধু তাদের আদর্শবাদকে তারিফ করলে চল্‌বে না, নিজের জীবনকে আংশিক ভাবেও সে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্‌তে হবে।

কিন্তু কি উপায়ে? শুধু আদর্শবাদ ভাল বুঝলেই ত হয় না। সকলের জীবনকে আদর্শবাদ একই প্রণালীতে পরিচালিতও করে না। এ কথা পল্লব অনেকটা অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি কর্‌ত। তাই সে তার নিজের জীবনকে কি উপায়ে উচ্চতর আদর্শে রঞ্জিত করে তুল্‌তে পারে সেটা অনেকটা হাত্‌ড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল।

মানুষের জীবনের খুব গভীর পরিণতি অনেক সময়ে দৃশ্যতঃ সামান্য ঘটনার আঘাতে হয়ে থাকে দেখা যায়। পল্লবের জীবনে এই সময়ে এইরূপ একটি দৃশ্যতঃ ছোট ঘটনা তার জীবনের মোড় বড় অপূর্ব্ব উপায়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

পল্লব আশৈশব সঙ্গীতকে বড় ভালবাস্‌ত। অতি শৈশব হ'তেই সে তার পিতার কাছে গান শিখ্‌ত। তা-ছাড়া তার পিতা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একজন উচ্চদরের বোদ্ধা ছিলেন ও বড় বড় ওস্তাদকে বাড়ীতে ডেকে পয়সা খরচ ক'রে তাদের গান বাজনা শুন্‌তেন। কাজেই ছেলেবেলা থেকেই পল্লব উচ্চাঙ্গের স্বরসঙ্গীতের আস্বাদ পাবার সুযোগ পেয়েছিল—যে সুযোগ খুব কম বাঙালী গৃহস্থ সন্তানেরই ভাগ্যে ঘটে। এর ফলে পল্লবের শুধু যে ভাল গান শেখ্‌বার একটা মস্ত সুযোগ হয়েছিল তাই নয়, তার তরুণ মনের সবুজ অনুরাগ তার সমস্ত আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের রসে সিঞ্চিত হ'য়ে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। কেম্ব্রিজে এসে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অভাবে তার প্রাণটা সময়ে সময়ে বড়ই পিপাসিত হ'য়ে উঠ্‌ত। মনের এই ব্যাকুল অবস্থাতে তার অজ্ঞাতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রতি তার মনটা ঝুঁকে পড়ছিল। বিলেতে ভাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শুন্‌তে পেলে হয়ত তার মনটা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে ওঠ্‌বার সুযোগ পেত না। কারণ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বহু পর্দ্দা এক সঙ্গে বাজানোটা তার কাণে মোটেই সুশ্রাব্য মনে হ'ত না ব'লে সে বিলেতে অভ্যস্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরশ হ'তে বঞ্চিত না হ'লে হয়ত তার মনের দুয়ার অনভ্যস্ত সঙ্গীতের আবেদনের সামনে রুদ্ধই থেকে যেত। কিন্তু বিলেতে চিরাভ্যস্ত সঙ্গীতের রস ও আনন্দ থেকে বাধ্য হ'য়ে বঞ্চিত হ'য়ে অবধি তার মনটা মাঝে মাঝেই রাস্তায়-ঘাটে-শোনা পিয়ানো বা বেহালার নূতন ধরণের ধ্বনি-স্রোতে ধীরে ধীরে বেশি ক'রে সাড়া দিচ্ছিল। কখনও হয়ত থিয়েটার বা কোনও কন্‌সার্টে কোনও একটি গৎ বা স্বরবিন্যাস তার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত কর্‌ত। তবে অধিকাংশ স্থলেই তার মেলডিতে অভ্যস্ত কাণ হার্মনির প্রবল নিনাদে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠার দরুণ তার কখনও-কদাচিৎ হৃদয়তন্ত্রীর অনুরণন সে প্রবল ধ্বনিসমষ্টিতে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে যেত।

তবু শুন্‌তে শুন্‌তে তার কাণ য়ুরোপীয় ঐক্যতান গীতবাদ্যে অল্প অল্প ক'রে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পারছিল যে আগে যে সব সুরসমষ্টি বা ধ্বনিবিন্যাস তার কাছে নিছক আর্ত্তনাদ ব'লে মনে হ'ত তার মধ্যে কোথায় একটা মিলের গরিমা আছে। এমন সময়ে একটি ছোট্ট মেয়ে উপলক্ষ হ'য়ে তার জীবনের গতিকে এমন এক প্রণালীতে চালিত কর্‌ল যেটা পল্লব কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নি বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

পল্লব কেম্ব্রিজে একটি lodgingএ থাক্‌ত—দুটি ঘর নিয়ে। তার পাশের বাড়ীতে সে প্রায়ই পিয়ানো বাজানো শুনতে পেত। সুরগুলি ছোট ছোট, শক্ত নয়—কিন্তু তার ভারি মিষ্ট লাগ্‌ত। সে বাইসিকিলে চড়ে কলেজে যাবার সময় মাঝে মাঝে তার ক্লাসের সহপাঠী একটী আঠার উনিশ বছরের ছেলেকে একটি ছয়-সাত বছরের টুকটুকে ফুলের মতন মেয়ের সঙ্গে পাশের বাড়ীর খোলা বাগানে খেলা করতে দেখ্‌ত। সে দুচার দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল যে ছেলেটি ছোট মেয়েটির কোনও নিকটাত্মীয়—সম্ভবতঃ ভাই। কারণ তাদের মুখের গঠনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল।

এই ছোট্ট মেয়েটি যখন তার দাদার সঙ্গে সাম্‌নের বাগানে ফুল তোলা, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌ত, তখন কখনও বা অস্তগামী সূর্য্যের রঙীন আলোয়

তার মিষ্ট মুখখানি রঞ্জিত হয়ে এক অপূর্ব্ব শোভায় রক্তিম হয়ে উঠ্‌ত, কখনও বা বায়ুভরে তার সোণালি রঙের চূর্ণালক তার মুখের ওপর এসে পড়ে তার চঞ্চল কোমল মুখখানিকে আরও কমনীয় ও কোমল ক'রে তুল্‌ত।

পল্লব দেশে শিশুসঙ্গ বড় ভালবাস্‌ত—বিশেষতঃ সুন্দর শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা ও গল্প কর্‌তে। বিদেশে সে ছোট ছোট ভাই বোনদের অভাব প্রায়ই বোধ কর্‌ত। তার মনের এম্‌নি অবস্থায় পাশের বাড়ীর প্রায়ই-খেলারতা ছোট্ট মেয়েটি তাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে তুল্‌ল। তার ওপর এক দিন সে তার জান্‌লা দিয়ে দেখতে পেল যে সে ঘরে বসে প্রায়ই যে মিষ্ট পিয়ানো শুন্‌তে পেত—সে সব এই ছোট্ট মেয়েটিরই কীর্ত্তি। সে ঠিক্ কর্‌ল যে সে পাশের বাড়ীর ছেলেটির সঙ্গে ক্লাসে আলাপ করে নেবে ও তার সাহায্যে ঐ ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে ভাব করবে।

সে মাঝে মাঝে ক্লাসে ইচ্ছে করে একটু দেরি করে গিয়ে তার প্রতিবেশী সহপাঠীর পাশেই বস্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ফলে, দুচার দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে পল্লবের আলাপ হ'য়ে গেল। পল্লব তার কাছ থেকে শুন্‌ল যে তার নাম জন নর্টন। তার পিতা বিগত মহাযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার বিধবা মা তার শিক্ষার জন্যই কেম্ব্রিজে আছেন। ছোট মেয়েটি তার একমাত্র বোন; নাম রিণা।

দু চারদিন পরে জন পল্লবকে তাদের বাড়ীতে বিকেলে চা খেতে নিমন্ত্রণ কর্‌ল। পল্লব সাগ্রহে সম্মত হ'ল।

রিণার সঙ্গে পল্লবের ভাব হ'তে বিশেষ দেরী হ'ল না। কারণ রিণা ছিল ভারি মিশুক ও সপ্রতিভ। তার ওপর পল্লব তার ছোট হাতের পিয়ানো বাজানোর এমন তারিফ করল যে রিণার তুষ্ট মনটি পল্লবের প্রতি সহজেই ঝুঁকে পড়্‌ল।

বাস্তবিক এই ছোট্ট মেয়েটি তার ছোট্ট মোমের মতন হাতদুটি দিয়ে যে কি সুন্দর পিয়ানো বাজাত, তা পল্লব না দেখ্‌লে বোধ হয় বিশ্বাসই করত না। জন তাকে সগর্ব্বে বল্‌ল যে সকলেই বলে যে রিণা একটা 'প্রডিজি'। পল্লব দেশে একটি পাঁচ বৎসরের মেয়েকে ধ্রুপদ ধামার গাইতে শুনে অবাক্ হয়েছিল, কিন্তু তেমন মুগ্ধ হয় নি। রিণার পিয়ানো বাজানো কিন্তু তার সত্যিই ভাল লাগ্‌ত। তা ছাড়া তার ছোট্ট কচি আঙুলগুলির আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে পরিচালনা করাটা পল্লবের দেখ্‌তেও ভারি আশ্চর্য্য মনে হ'ত।

এক দিন রিণা তার ভক্তকে হঠাৎ বলে বস্‌ল "মিষ্টার বাক্‌চি, আপনি যদি পিয়ানো এত ভালবাসেন তবে পিয়ানো শেখেন না কেন বলুন ত?"

আশ্চর্য্য, এ কথাটা পল্লবের কখনও মনে হয় নি! হয়ত মনে হয় নি বলা ভুল। কারণ, হয়ত তার মন আস্তে আস্তে তৈরী হ'য়ে আস্‌ছিল; হয়ত তার মনের মগ্নচৈতন্যে পিয়ানো শেখার ইচ্ছা ধীরে ধীরে স্ফুট হ'য়ে আস্‌ছিল; হয়ত একদিন না একদিন সে ইচ্ছা স্ফুটতর আকারে তার চেতন মনের কোণেও রূপগ্রহণ না ক'রেই পারত না। কিন্তু সে যাই হোক্, আজ রিণার সামান্য একটি কথাই যে উপলক্ষ হ'য়ে তার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে কথা সে পরে মাঝে মাঝেই ভেবে বিস্ময় বোধ কর্‌ত।

পল্লব রিণারই শিক্ষকের কাছে পিয়ানো শিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। যখন তার বাজানো অভ্যাস কর্ত্তে কুড়েমি আস্‌ত তখন সে রিণার মতন ছোট মেয়েরও এ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করার কথা মনে করে উৎসাহ পেত।

সে পিয়ানোয় উন্নতি লাভ কর্ত্তে লাগ্‌ল বটে কিন্তু পরীক্ষা আসন্ন ভেবে মাঝে মাঝে তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে এতে পড়াশুনোর ক্ষতি বিলক্ষণ হচ্ছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সে জাপানী ছাত্রটির কথা মনে করে মনকে বোঝাবার চেষ্টা পেত যে পরীক্ষা আবার কি? জীবনে শিক্ষালাভই আসল। কুঙ্কুমের ও মোহনলালের দৃষ্টান্তও সঙ্গে সঙ্গে তার মনশ্চক্ষের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হ'ত। কিন্তু আবার মনে হ'ত যে তাতে কি? তারা ত একটা ব্রত নিয়েছে, আমি পিয়ানো শিখ্‌ছি ত ব্রত হিসেবে নয়," অথচ এজন্য পড়াশুনোর ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর। তবে? এ "তবে"র উত্তর তার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠ্‌ছিল বটে, কিন্তু মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বার তখনও দেরি ছিল।

এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝখানে প'ড়ে তার প্রাণটা যখন বড় বেশী অস্থির হয়ে উঠ্‌ত, তখন সে পাশের বাড়ীতে গিয়ে রিণার সঙ্গে হাসি গল্প ক'রে তাকে পিয়ানো শুনিয়ে তার পিয়ানো শুনে বেশ একটা তৃপ্তি পেত।

মাঝে মাঝে সে, জন ও রিণা কেম্ব্রিজে পিয়ানো অর্গান বেহালা প্রভৃতির recital শুন্‌তে যেত ও জনের সঙ্গে য়ুরোপীয় সঙ্গীত তার কিরকম লাগ্‌ল সেই নিয়ে আলোচনা কর্‌ত। মাঝে মাঝে সে দু একটা symphony কন্‌সার্ট

শুন্‌তে যেত। এই সব শুন্‌তে শুন্‌তে তার ধীরে ধীরে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে harmony যে একটা কত বড় কীর্ত্তি, সে সম্বন্ধে চোখ ফুট্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। দেশে থাক্‌তে পথে ঘাটে পিয়ানোর অশিক্ষিত-পটুত্বের যে নমুনা সে শুন্‌ত, তাতে তার মন য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হবার বড় একটা সুযোগ পায় নি। এখন সে আস্তে আস্তে উপলব্ধি কর্ত্তে আরম্ভ কর্‌ল যে বিদেশীর কোনও মহিমময়ী কীর্ত্তিকেও মনপ্রাণ খুলে গালি পাড়া কত সহজ!

এমন সময়ে এক দিন কেম্ব্রিজে একজন মস্ত বড় অষ্ট্রিয়ান্ পিয়ানো বাজালেন। সেদিন ছাত্রবৃন্দের কি ভিড়! দু তিন দিন আগে থেকে সমস্ত রিজার্ভ আসন বিক্রয় হয়ে গেল। পল্লব, জন, রিণা ও মিসেস নর্টন অনেক কষ্টে শেষ পংক্তিতে চারটি বাজে আসন সংগ্রহ করতে পারলেন।

বাজনা শেষ হ'য়ে গেল। শ্রোতৃবৃন্দের কি সে করতালি! বিখ্যাত বাদক মহোদয় একবার নেপথ্য হ'তে বাহিরে আসেন আর কর্ণ বধিরকর করতালির রোল ও "আবার-আবার" ধ্বনি। তিনি আর একটা গত্ বাজালেন। পুনরায় সেই অশ্রান্ত করতালি। শেষটায় হলঘরটির দীপ নির্ব্বাপিত কর্‌তে হ'ল।

পল্লবের মনটা সেদিন হঠাৎ যেন একটু বেশিরকম বিচলিত হয়ে পড়্‌ল। সে মিসেস নর্টন, জন ও অন্যান্য অনেকের কাছেই শুনেছিল যে য়ুরোপে একজন বড় গাইয়ে বা বাজিয়ের ভাগ্য কেমন রাজেন্দ্রেরও কাম্য। আজ যেন সে হঠাৎ এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌ল।

কনসার্ট শেষ হ'লে রিণা সরল ভাবে হেসে বল্‌ল "মিষ্টার বাক্‌চি, এক দিন আপনিও এই রকম সম্মান পাবেন ও আমিও পিয়ানো বাজিয়ে এই রকম ফুলের মালা পাব; নয়?"

পল্লবের কথাটা শুনে মনে মনে হাসি পেল। সে রিণাকে বল্‌ল "নিশ্চয় রিণা। তুমি আর আমি তখন duet বাজাব, কেমন?"

রিণার চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একপাশে পল্লবের ও অপর পাশে দাদার আঙুল ধরে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে বল্‌ল "বেশ বেশ। কাল থেকে আমরা আরও ভাল করে duet বাজাব তাহলে, আচ্ছা?"

পল্লবের কাণে এ কথাটা গেল না। তার মনে হচ্ছিল বিলাত ও ভারতের মধ্যে ব্যবধান কতখানি! এখানে একজন বড় শিল্পীর কি আদর, কি প্রতিপত্তি! আর তার স্বদেশ! তার মনটা ভারি হয়ে উঠল।

(৩)

সেই দিন থেকে তার মনের কোণে একটা ইচ্ছা ক্রমাগত আনাগোনা করতে আরম্ভ কর্‌ল। তার মনটা সঙ্গীতের দিকে ক্রমশঃই ঝুঁকে পড়ছিল বটে, কিন্তু সঙ্গীতকে যে জীবনের অবলম্বন করেও বড় হওয়া যায়, এ কথা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও গম্ভীরভাবে মনে স্থান দেয় নি। কিন্তু সে দিনের বাদকের ভাগ্যে কৃতজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের অজস্র করতালি, উজ্জ্বল প্রশংসমান দৃষ্টি ও ফুলের তোড়া লাভের দৃশ্য তার মনকে তার শত আপত্তি সত্ত্বেও সঙ্গীতকারের গৌরবময় জীবনের দিকে সচেতন করে দিয়েছিল। কিন্তু সে এ চিন্তা হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত। এ দেশ আর আমাদের দেশ! নাঃ, চিত্তস্থৈর্য্য হারানো কিছু নয়! আমাদের দেশে গায়ক হলে চল্‌বেই বা কেমন ক'রে, লোকে বল্‌বেই বা কি? দিন গুজরাণোর সমস্যা নিয়ে যদি বা সে অচঞ্চল ভাবে মাথা ঘামাতে পারত, লোকে কি বল্‌বে ভেবে কিন্তু তার অভিমানী মনটা একেবারে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ত। দেশের ও দশের একজন যে তার হ'তেই হবে!

এ চিন্তার সময়ে তার মনে হ'ত কুঙ্কুম ও মোহনলালের কথা। তাদের সাম্‌নেও কি জীবন-সমস্যা একই ভাবে প্রতিভাত হয় নি! তারাও কি আত্মীয়-স্বজনের আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করে কৃষি ও দর্শন শাস্ত্রের মতন অনুজ্জ্বল বস্তুর চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয় নি? পল্লব না এত দিন ভাবছিল কিরূপে তার জীবন আদর্শবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্‌বে! এই ত পন্থা! বিধাতা ত আজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছেন যে এই পথে গেলেই তার অভিমানকে বর্জ্জন করা যাবে ও সে সত্যই মহৎ জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে! সে না এত দিন ভাবছিল যে কি উপায়ে সে কুঙ্কুম ও মোহনলালের প্রশংসা পাবে?—এই-ই ত পথ, ও তার যোগ্যতা প্রমাণের প্রকৃষ্ট উপায়!

কিন্তু কুঙ্কুম ও মোহনলাল যদি প্রশংসা না করে! যদি তারা সঙ্গীতকারের জীবনকে হেয় জ্ঞান করে! না তা করবে কেন?—করতেও ত পারে? তারা হয়ত

তার মতন সঙ্গীতকারের জীবনের মহনীয়ত্বের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি?

তবে তার আদর্শবাদ এ চিন্তায় বিদ্রোহ করে বল্‌ত—কুঙ্কুম ও মোহনলালের সমর্থনই কি আদর্শবাদের চরম কষ্টিপাথর না কি? কিন্তু হায় মানুষের হৃদয়! সে লোকমতও অনেক সময় উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু প্রিয় বন্ধুর উপেক্ষা সইতে অক্ষম না হয়েই পারে না, বিশেষতঃ তরুণ বয়সে যখন বন্ধুত্বের দান তার জীবনের বায়নানা স্থান অধিকার ক'রে থাকে।

পল্লব স্থির করল এক দিন কুঙ্কুম ও মোহনলালকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

(৪)

"কি বল মোহনলাল?"

পল্লবের এই চিন্তাকুল প্রশ্ন সেদিন সন্ধ্যার ম্লানিমায় আরও বিষণ্ণ শোনাল। মোহনলাল হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পার্‌ল না। সে কুঙ্কুমের দিকে একবার তাকাল। কুঙ্কুম পল্লবের সমস্ত কথা চুপ করে মন দিয়ে শুনে একটি শোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে একদৃষ্টে ঘরের fireplaceএর দিকে তাকিয়ে ছিল।

মোহনলাল ও কুঙ্কুম পল্লবের চেয়ে দুই তিন বৎসরের বড় ছিল। মোহনলাল ছিল ধনীর সন্তান। কিন্তু পাঠানুরাগ তার বাল্যাবধি প্রবল ছিল। সে ও কুঙ্কুম এক ইস্কুলে ও পরিশেষে এক কলেজ থেকে পাশ করে। সহাধ্যায়ী কুঙ্কুমকে সে বহুদিনের আলাপে পরম বন্ধু রূপেই পেয়েছিল। পল্লবের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছিল পড়ার সূত্রে নয়—পল্লবের বাড়ীতে তাদের পিতামাতার যাতায়াত ছিল ব'লে। ফলে পল্লব, মোহনলাল ও কুঙ্কুম তিনজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তার পর এই দূর বিদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রে পড়ার দরুণ তাদের সে বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়ে উঠেছিল।

ত্রয়ীর মধ্যে মোহনলালই সর্ব্বপ্রথম বিলাতে আসে—তখন সবে যুদ্ধাবসান হয়েছে। তার বৎসর খানেক পরে পল্লব এসেছিল ও তার মাস তিনেক পরে কুঙ্কুম এসে যোগ দেয়।

মোহনলাল বাল্যকাল হ'তেই একটু প্র্যাক্টিকাল গোছের ছেলে ছিল ব'লেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, সঙ্গীতানুরাগ ব'লে কোনও বস্তু তার মনের মধ্যে বড় একটা গভীর ছাপ আঁকে নি। তাই সে পল্লবের প্রস্তাবে চমৎকৃত হ'লেও সাড়া দিতে পার্‌ল না। সে পল্লবের কথা শেষ হ'লে একটু চঞ্চলভাবে উঠে জানালার কাছে গিয়ে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় বাইয়ের অবিশ্রান্ত তুষারপাত দেখ্‌তে লাগ্‌ল। খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌ল।

শেষে সে বল্‌ল "ভাই পল্লব, এরূপ প্রস্তাবটা আমার কাছে যে খুবই অভাবনীয় ঠেক্‌ছে তা আমি বল্‌তে বাধ্য। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে কি বল্‌ব আমি ঠিক্ ঠাহর পাচ্ছি না। তবে তুমি এইমাত্র বিলেতের শিল্পীজীবনের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়েছিলে ব'লে সে সম্বন্ধে আমি এইটুকু মাত্র বল্‌তে পারি যে, বিলেত হচ্ছে বিলেত ও আমাদের দেশ হচ্ছে আমাদের দেশ। নয় কি? অর্থাৎ বিলেতে শিল্পীর প্রতিপত্তি প্রচুর হ'লেও আমাদের দেশের অবস্থাটা ঠিক্ সে রকম নয়। সুতরাং সেটা ভাল ক'রে উপলব্ধি না ক'রে এ লাইনে যাওয়া ঠিক্ সঙ্গত বলে আমার মনে হচ্ছে না।"

পল্লব বল্‌ল—"অর্থাৎ?"

মোহনলাল বল্‌ল "অর্থাৎ, তোমার একটা কথা একটু ভাল করে বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। সেটা এই যে, যখন তুমি ফিরে যাবে তখন লোকে তোমায় যে অবজ্ঞার চোখে দেখ্‌বে তার গুরুতরত্ব নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হবে না।"

পল্লব বল্‌ল "ভাই, সে কথা কি আমি একটুও ভেবে দেখি নি মনে কর? কিন্তু আর্টের জন্য—"

মোহনলাল বাধা দিয়ে বল্‌ল "ভাই পল্লব, কিছু মনে কোরো না; তুমি যতই দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা কর না কেন যে সঙ্গীত একটা মস্ত বড় আর্ট, য়ুরোপে তার এত আদর, এত প্রতিপত্তি, একাগ্র সাধনা নইলে তার চর্চ্চা রাখা অসম্ভব ইত্যাদি—তুমি যদি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সঙ্গীতকেই ব্রত ক'রে দেশে ফের তা'হলে তারা কি এ সব হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বল্‌বে না যে ছেলেটা কেবল লম্বা লম্বা বোলচাল ছাড়া আর কিছুই শেখ্‌বার সময় পায় নি? তা ছাড়া আমার মনে হয় যে আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার যে, দেশে ফিরে তুমি মিশ্‌বে কার সঙ্গে।

এখানে গাইয়ে-বাজিয়েরা শিক্ষিত সমাজের সম্মানভাজন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা যে ঠিক্ উল্‌টো এ কথা ভুল্‌লে ত চল্‌বে না ভাই!"

কুঙ্কুম এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি—পল্লবের প্রস্তাব তাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। সে বরাবর একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে পল্লবের সঙ্গীতানুরাগের কথাই ভাব্‌ছিল। হঠাৎ মোহনলালের শেষ কথায় পল্লবের উত্তর দেওয়ার আগেই সে ব'লে উঠ্‌ল "তা বটে মোহনলাল! আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার কর্‌তে গেলে কি বলা যায় না যে, নতুন কিছু করার এ রকম শত শত অন্তরায় চিরকালই থাক্‌বে; তাই কোনও নতুন পথ বেছে নেওয়ার সময়ে বোধহয় শুধু বাধাবিপত্তি ভেবে চলাটাই সবচেয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। কেন না এ সব অসুবিধের জন্য যদি সর্ব্বদাই পেছোতে হয়, তবে ত এক কেরাণী, উকীল ও ডেপুটি ছাড়া আর কিছুই হওয়া চলে না। দেখ না—"

মোহনলাল বাধা দিয়ে বল্‌ল "ভাই কুঙ্কুম, তুমি যা বল্‌ছ তা মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে একটা কথা সব চেয়ে বড় কথা মনে হয়। সেটা এই যে প্রত্যেকের জীবনটা তার কাছে একবারই আসে। তাই এ জীবন নিয়ে সে নতুন experiment কর্ত্তে চায় সে করুক, কিন্তু যে চায় না, তার কাছে এ সব বড় বড় যুক্তি শুধু বাক্যসারই হয়ে দাঁড়াবে না কি? খুব অসামান্য দুচারজনের কথা ছেড়ে দিলে বোধহয় এ কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ প্রথমে চায় সুখশান্তি। তাই মুখে আমরা যত বড় বড় কথাই বলি না কেন, কাজে সমাজের অবজ্ঞাকে বরণ ক'রে উচ্চতর সুখশান্তি সৃষ্টি করে নেওয়ার চেয়ে কঠিন কাজ যে সংসারে অল্পই আছে এ কথা বোধহয় তুমি সহজে অস্বীকার কর্ত্তে পারবে না। তুমি নিজে অবশ্য ব্যারিষ্টারী ছেড়ে নিছক জ্ঞানচর্চ্চার আদর্শে দর্শনশাস্ত্র পড়ছ। কিন্তু তোমার সাম্‌নে বল্‌ছি ব'লে সঙ্কুচিত হ'য়ো না—এতটা আদর্শবাদ কোনও দেশেই বোধহয় খুব বেশি দেখা যায় না। তা ছাড়া আর একটা কথাও এ সম্পর্কে ভোলা চলে না; সেটা এই যে পল্লবের মন ও তোমার মন এক প্রকৃতির নয়। তুমি নিজে দারিদ্র্যের মুখ দেখেছ। পল্লব বরাবর সুখের কোলেই মানুষ। তাই সে তোমার মতন নিজের মনটির স্বরূপ জান্‌বার অবকাশ বা সুযোগ পায় নি। কারণ এটা ত মানো যে নিজের মনটিকে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে যে ভাবে চিন্‌তে পারা যায়, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সে রকম যায় না? তা ছাড়া পল্লব আশৈশব একটু রঙীন-প্রকৃতি। সুতরাং বয়সের তুলনায় সে যে নানা বিষয়ে একটু ছেলেমানুষ আছে, তার মতামত বিচার করার সময় সে সত্যটির দিকে সচেতন থাকা দরকার।"

ব'লেই মোহনলাল পল্লবের দিকে চেয়ে বল্‌ল "পল্লব ভাই রাগ কোরো না।" কারণ সে জান্‌ত যে পল্লবকে কেউ ছেলেমানুষ বল্‌লে সে মনে মনে খুসি হ'ত না।

পল্লব মোহনলালের এ কথায় মনে মনে খুব সন্তুষ্ট না হ'লেও সহজ সুরে বল্‌ল "না না মোহনলাল, মনে করব কেন? তবে কি জান?—"

মোহনলাল কথাটা ব'লেই বুঝেছিল যে পল্লব আঘাতকে অস্বীকার কর্‌লেও একটু আহত হয়েছে। সে তার একটি হাত তার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তার উপর সস্নেহ চাপ দিয়ে বল্‌ল "তুমি কি বল্‌বে ভাই শুনছি। আগে আমার কথাটা শেষ কর্‌তে দাও। দেখ জীবনটাকে তোমার চেয়ে আমি খুব কম ক'রেও বছর তিনেক বেশি দেখেছি। অন্ততঃ তোমার আসার বছর খানেক আগে বিলেতে আসার দরুণ আমার অভিজ্ঞতাটা যে খানিকটা বেড়ে গেছে সে কথা বোধহয় মোটামুটি বলা যেতে পারে। তোমার বয়সে আমারও একটা খুব বড় রকম আদর্শবাদ ছিল।"

কুঙ্কুম হেসে বল্‌ল "মোহনলাল, তোমার নামে লোকে আর যে অপবাদই দিক্ না কেন, অবিনয়ের অপবাদ যে দিতে ইতস্ততঃ কর্‌বে এ কথা বোধহয় অনেকটা জোর ক'রে বলা যেতে পারে। নইলে যে লোক ধনীর সন্তান হ'য়েও কৃষি শেখে—তা আবার সিভিল সার্ভিসের প্রলোভনকে পায়ে ঠেলে—তার আদর্শবাদকেও কি "আছের" কোঠায় না ফেলে "ছিল"র কোঠায় ফেল্‌তে হবে না কি?

মোহনলাল নিজের প্রশংসা শুনে একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌ল "আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। এখন যা বল্‌ছিলাম। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই মাত্র যে যৌবনে পা দেবার সময়ে মানুষের মন তিনচার বৎসরে বড় কম

রূপান্তরিত হয় না। তাই আমার এ তিনচার বৎসরে যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে, পল্লব হয়ত তা থেকে লাভ কর্ত্তে পারে ভেবে আমি—"

পল্লব একটু আহত হ'য়ে তার হাতটা মোহনলালের হাতের মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে ব'লে বস্‌ল "তাই ব'লে ভাই, জীবন সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়াই যে একমাত্র পন্থা তা আমার মনে হয় না। অর্থাৎ তুমি এই তিন চার বৎসরে যে ভাবে বদ্‌লেছ, অপরের ধারণাও যে ঠিক্ সেই ভাবেই বদ্‌লাবে, এ কথা মনে করাটা বোধহয়—খুব দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়।"

কথাটা ব'লেই পল্লব বুঝল যে এর মধ্যে যে খোঁচাটা সে প্রচ্ছন্নভাবে দিতে গিয়েছিল সেটা একটু বেশি তীব্র হ'য়ে তার নিজের অভিমানকেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। কুঙ্কুমও তার এ শীলতার অভাব লক্ষ্য ক'রে না ব'লে থাক্‌তে পার্‌ল না—

"ভাই পল্লব! মোহনলাল পিঠ চাপ্‌ড়ে কথা বলার লোক নয়, এ কথা তোমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। কাজেই তার ওপর তোমার এ অন্যায় আরোপ করাটা উচিত হয় নি।"

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বল্‌ল "না না পল্লব, আমি কিছু মনে করি নি। তুমি সত্যি কথাই বলেছ। প্রত্যেক মানুষেই জীবনকে ও জগৎকে এমন একটা চোখে দেখে ঠিক্ যে ভাবে আর কেউ দেখে নি ও এইটেই জীবনের ধর্ম্ম। তাই পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা যে বাঞ্ছনীয় নয় সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। তবে আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে চাই নি। আমি শুধু এই কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম যে, প্রথম যৌবনে আদর্শবাদ বড় বেশি জ্বলন্ত থাকে ব'লে সে সময়ে আমরা প্রায়ই নিজের মনের শক্তি নির্ণয়ে উদাসীন হয়ে বসি; যেন শুধু আদর্শবাদই যথেষ্ট। আমার জীবনে শেষ কয়েক বৎসরে এ উপলব্ধিটি বার বার নানা রূপ ধ'রে আমাকে আঘাত করেছে ব'লেই আমি তোমাকে নিতান্ত বন্ধুভাবে আমার এ অভিজ্ঞতাটি জানাতে চেয়েছিলাম। তবে আমার বলার ধরণটা হয়ত ঠিক্ যথাযথ হয় নি ব'লেই তোমার পক্ষে আমাকে ভুল বোঝা সম্ভব হয়েছে।"

পল্লবের নিজের ভুল বুঝতে দেরি হয় নি। কেবল সে একটু বেশি অভিমানী ছিল ব'লে সহজে নিজের দোষ স্বীকার কর্ত্তে পার্‌ত না। এ দুর্ব্বলতার জন্য তার আত্মগ্লানি বড় কম হ'ত না, এবং কখনও এ দোষ স্বীকার কর্‌তে মনকে রাজি করাতে পার্‌লে তার মনটা বড় কম হাল্‌কা হ'য়ে যেত না। তবু মানুষের হৃদয়টি এম্‌নি অসঙ্গতিতে ভরা যে সে জেনে শুনে বার বার একই ভুল করে ও ততবারই সে ভুলকে সমর্থন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সে সময়ে সে ভাবে না যে কোনও ভুলের সমর্থন করাটাই তার অপরাধ ক্ষালনের শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়, যেমন মজ্জমান রক্ষার্থীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে তার চলৎশক্তি রহিত করবার সময় ভাবে না যে সে পদ্ধতি কারুর প্রাণ রক্ষারই শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। সে কিন্তু আজ হয়ত মোহনলালের কাছে মাপ চাইত। তবে মোহনলাল উদারভাবে তার খোঁচাটাকে ইচ্ছে ক'রেই গায়ে না মাখায়, সে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দোষটা মোহনলালের প্রসারিত স্কন্ধের উপরই চাপিয়ে দিয়ে বল্‌ল "তা হ'তে পারে।" কেবল তার অবাধ্য মনটি অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে তার কাণে কাণে বল্‌তে লাগ্‌ল "কিন্তু পল্লব এ ক্ষেত্রে তা হয় নি।"

সেদিন এ আলোচনা বহুক্ষণ চল্‌ল। কুঙ্কুম প্রথমে একটু দ্বিধা-সন্দিগ্ধ ছিল, কিন্তু পল্লবের সোৎসাহ কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তার মনটি পল্লবের প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মোহনলাল কেবলই বল্‌তে লাগ্‌ল যে হঠাৎ কোনও কিছু করা ঠিক্ নয়; নিজের মনকে আগে বোঝা দরকার। পল্লব উত্তেজনার মাথায় বল্‌ল যে সে এজন্য দেশে গ্লানি ও নিন্দা সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত আছে, কারণ সৎসাহস নইলে সংসারে কোনও নতুন পথেরই সৃষ্টি হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। মোহনলাল শেষে পল্লবের কাঁধে একটা হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চেয়ে বল্‌ল "ভাই পল্লব, আমার যা বল্‌বার তা আমি সব বলেছি। তোমাকে ছেলেমানুষ আখ্যা দিয়ে যে আমি তোমার ওপর উপদেশ বর্ষণ করতে চাই না এ কথাও তুমি জানো। তাই আশা করি আমি একটা কথা তোমাকে বিশেষ ক'রে বল্‌তে চাইলে তুমি আমাকে ভুল বুঝ্‌বে না। আমার নিজের জীবনে বারবার ঠেকে শিখে আমার একটা কথা বড় বেশি মনে হ'য়েছে যে আমাদের নিজেদের স্বরূপটি সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত ধারণা

নিয়ে একরোকা ভাবে চল্‌তে যাওয়ায় চেয়ে মারাত্মক ভুল সংসারে অল্পই আছে। ভাই, রাগ কোরো না, তোমাকে একথা একটু বেশি জোর দিয়ে বলার দরকার আছে মনে করেই আমি আজ তোমাকে এত ক'রে সংযত হ'তে বল্‌ছি। কারণ জীবনে জলঝড় তুমি বড় বেশি সওনি বা পোড়ও বড় বেশি খাও নি। অথচ এ জলঝড়-সওয়া ও পোড়-খাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমরা প্রত্যেকে আমাদের আসল রূপটি সম্বন্ধে অনেকটা সত্য জ্ঞান লাভ করি। তাই আমার প্রধান বক্তব্য এই যে সঙ্গীতকে ব্রত করলে আমাদের দেশে ও সমাজে যে অবজ্ঞা সইতে ও ঘা খেতে হবে—(অর্থোপার্জ্জনের কথা ত ছেড়েই দাও)—তার গুরুত্ব সম্বন্ধে খুব ভাল ক'রে সচেতন না হওয়া পর্য্যন্ত এ পথ নিও না। অর্থাৎ এক কথায় হঠাৎ কিছু কোরো না; ভাব, ও নিজেকে নানান্ উপায়ে পরীক্ষা কর। এইটুকু মাত্র তোমার বন্ধুর অনুরোধ, উপদেশ নয়।"

কুঙ্কুম বল্‌ল "মোহনলাল! তুমি যা বল্‌ছ সেটা যে খাঁটি কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও কি সাধারণ নীতি হিসেবে বলা যায় না যে ভেবে চিন্তে হিসেব কিতেব ক'রে কোনও বড় কাজও হয় না। সংসারে সব বড় ও মহৎ কাজই সাধিত হয়েছে—মানুষের অন্তরের সহজ প্রেরণায় ও দুর্নিবার কর্ম্ম-প্রণোদনায়।"

মোহনলাল একটু চিন্তাকুল ভাবে বল্‌ল "সেটাও সত্যি কথা। তবে কি জান ভাই! আমি সঙ্গীতকে কখনও ভালবাস্‌বার সুযোগ বা শিক্ষা পাই নি। কাজেই হয়ত পল্লবের এ সৎসঙ্কল্পকে ঠিক্ যে ভাবে দেখা উচিত সেভাবে দেখ্‌তে পারছি না।"

তার পর পল্লবের দিকে চেয়ে মোহনলাল বল্‌ল "অবশ্য এরূপ স্থলে অন্তরঙ্গ বন্ধুও ঠিক্ পথ দেখাবার স্পর্দ্ধা করতে পারে না। শেষ পদক্ষেপের দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজেরই নেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পথ তুমি খুঁজে পাবেই পাবে যদি সরল ভাবে খুঁজতে পার। আমার কেবল মনে হয় খুব বেশি ঝোঁকের বশে কাজ করার সপক্ষে যত কথা বলা যায় বিপক্ষে তার চেয়ে বেশি কথা বল্‌বার থাকে। কেন না নিজেকে চেনার চেয়ে কঠিন কাজ সংসারে অল্পই আছে।"

(৫)

পল্লবের মনে মোহনলালের শেষ কথাগুলি একটা গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল। সে স্থির কর্‌ল যে সে হঠাৎ একটা কিছু ক'রে বস্‌বে না, সময় নেবে। তাই সে পূর্ব্বের মতই ক্লাসে যেতে লাগল ও সাধ্যমত পড়াশুনো করার চেষ্টা কর্‌তে লাগল। কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার মনে পরীক্ষার জন্য পড়া আর ভাল লাগছিল না। যদি এ পরীক্ষা পাশের ওপর তার জীবন মরণ নির্ভর কর্‌ত, তাহলে হয়ত তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ কর্‌তে হ'ত। কিন্তু সে জান্‌ত যে তার আন্তরিক কোনও ইচ্ছায় তার পিতা যে বাধা দেবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার নড়চড় হবে না। তাই তার নীরস পাঠ্যপুস্তক তার কাছে ক্রমশঃই বিষবৎ প্রতীয়মান হ'তে লাগল। কিন্তু পরীক্ষা এ সব বোঝে না। সে আসে। কারণ আসাই তার ধর্ম্ম। পল্লব ভাবত যে এ পরীক্ষা দেওয়া বোধ হয় আর শেষ হবে না। তার প্রায়ই মনে হ'ত যে সেই জাপানী ছেলেটিই সুখী। কারণ সে ইচ্ছামত শিখ্‌তে পাচ্ছে, পরীক্ষার জন্য তাকে অহরহ ভাব্‌তে হচ্ছে না। শেখা—এই ত চাই। পরীক্ষা পাশ, তক্‌মা অর্জ্জন এ সব আবার কি? সঙ্গীত ও এঞ্জিনিয়ারিং, অনুরাগ ও কর্ত্তব্য, এই দোটানার মধ্যে পড়ে তার প্রাণটা প্রায়ই হাঁপিয়ে উঠত।

এরূপ মনের অবস্থা যে পরীক্ষা-পাশের অনুকূল নয় তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। পল্লব পরীক্ষায় পাশ হ'ল বটে, কিন্তু ভাল ফল লাভ করতে পার্‌ল না।

জীবনে এই তার প্রথম পরীক্ষায় মন্দ ফল লাভ। কাজেই সে এ আঘাতে ম্রিয়মান হ'য়ে পড়্‌ল। কুঙ্কুম ও মোহনলাল তাদের পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হ'ল। এ বৈষম্যে পল্লব আরও ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়্‌ল। মোহনলাল ও কুঙ্কুম তাকে যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা পেল যে পরীক্ষায় ভাল ফললাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। কিন্তু পল্লব বুঝল যে সে নিজের কর্ত্তব্য করে নি। তার পিতা তাকে বলেছিলেন, যে কাজই করে যেন সে মন দিয়ে করে। পল্লব সঙ্গীত ও এঞ্জিনিয়ারিং এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে কোনওটাই মন দিয়ে করে নি। এক একবার ক্ষোভের মাথায় সে স্থির ক'রে বস্‌ত যে, সে আর ইতস্ততঃ

কর্‌বে না, সব ছেড়ে কেম্ব্রিজে সঙ্গীতই অধ্যয়ন কর্‌বে। কিন্তু তখনি তার মনে মোহনলালের সাবধানবাক্য উদয় হ'য়ে তার যুক্তি ও বিচক্ষণতার দাবী-দাওয়াকে অন্তরায় ক'রে দাঁড় করাত। অর্থোপার্জ্জন সমস্যার কি হবে! উত্তরে পল্লব মনকে বোঝাত যে তার জন্য তার পিতা যে সংস্থান রেখে যাবেন, তাতে তার মোটা ভাত মোটা কাপড় চ'লে যাবে। কিন্তু আখেরে? একা থাক্‌লে না হয় দিন কোনও মতে কেটে যেতে পারে; কিন্তু মানুষ কিছু সমস্ত জীবন একা থাকে না। তাছাড়া সঙ্গীতকে পেশা কর্‌লে লোকে বল্‌বে কি? এর উত্তরে তার আদর্শবাদ তার কাণে কাণে বল্‌ত যে লোকের বলাবলি নিয়ে অত মাথা ঘামালে সংসারে কোনও সৎকর্ম্মই করা চলে না। কিন্তু মানুষের সবল মুহূর্ত্তে সে লোকমতকে ছোট ক'রে দেখলেও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বোঝে যে তার মনের উপর বাইরের পাঁচজনের মতামতের প্রভাব কতখানি। সে এ কথার মর্ম্মার্থ অবিরাম মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন প্রত্যহই বেশি ক'রে উপলব্ধি কর্‌তে লাগল। তার মনে হ'তে লাগল যে যারা তার বিলাত থেকে বড় খেতাব ও চাকরি-ভূষিত হয়ে দেশে ফেরার সম্বন্ধে নিঃসংশয়, তারা কি ভাববে! সে তার অন্যান্য সফলকাম বন্ধুদের পানে কেমন করে সমান সমান ভাবে তাকাবে! সব চেয়ে শক্ত কথা—যখন তার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অসংখ্য শুভার্থী ও শুভার্থিনীগণ এসে তার প্রিয়জনের নিরাশার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করবে তখন সে বেদনায় সে-ই বা কোন্ মুখে তাঁদের সান্ত্বনা ও ভরসা দেবে! তাঁরা ত তার আদর্শবাদ প্রভৃতি বড় বড় কথা বুঝবেন না? তাঁরা যদি অবুঝ হ'য়ে তার মহৎ প্রণোদনার গরিমা সম্বন্ধে সচেতন না হ'তে পেরে পূর্ব্বোক্ত দরদীদের আক্ষেপ সান্ত্বনা শুনে মাথা হেঁট করেন, তবে সে তাঁদের হেঁট মাথা কেমন ক'রে সোজা ক'রে তুলে ধ'র্‌বে?

মনের এরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সে এক দিন বিকেলে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণে মিসেস নর্টনের বাড়ীতে গেল। সেদিন জন ছিল না।

দরজার ঘণ্টা বাজাতেই রিণা ছুটে এসে দুয়ার খুলে তার গলা ধ'রে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে তাকে অনুযোগ জানাল যে সে অনেকদিন তাদের বাড়ী আসে নি।

পল্লবও অনুযোগের সুরে বল্‌ল, "তুমিই বা আস নি কেন রিণা? আমি ত ঠিক্ তোমার পাশের ঘরেই থাকি ও পিয়ানো বাজাই। তুমি নিশ্চয়ই তা শুনে বুঝতে পারতে যে আমি বাড়ীতেই আছি। তবু কেন আজকাল আর আগের মতন আমার কাছে আস্‌তে না বা চকলেট্ নিয়ে যেতে না?"

রিণা তার লাল টুকটুকে ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে বল্‌ল, "আমি যেতাম না বৈকি! মা-ই ত আমাকে যেতে দিত না, বল্‌ত 'মিষ্টার বাক্‌চির পরীক্ষা কাছে তাঁকে এখন বিরক্ত কোরো না রিণি'!"

পল্লব সহানুভূতির সুরে বল্‌ল "বটে?"

রিণা পল্লবের হাত ধ'রে তাকে বস্‌বার ঘরে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে তার কোলের ওপর বসে বল্‌ল "শুধু তাই! মা কত কি বল্‌ত। মা বল্‌ত 'মিষ্টার বাক্‌চি তোমার মতন দুষ্টু নন যে পড়াশুনো করেন না!' মিষ্টার বাক্‌চি, বলুন ত, এরকম বলা মার অন্যায় নয়? আমি কি দুষ্ট মেয়ে?"

পল্লব আদর ক'রে রিণার গালদুটি টিপে দিয়ে কৃত্রিম কোপে বল্‌ল, "কে বলে? এমন কথা যে বলে তাকে আমি দেখা হ'লে খুব একচোট শাসন ক'রে দেব 'অখন। আমি ত তোমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে ত্রিভুবনে দেখ্‌তে পাই না।"

রিণার মা চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে পল্লবের আলাপ প্রথমে রিণার সূত্রে হ'লেও ক্রমে পল্লব মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ করবার জন্যই আস্‌ত। জনের কাছে মিসেস নর্টনের শতমুখে সুখ্যাতি শুনে পল্লবের মনে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে আলাপে সে বীজ সহজেই বিকশিত ও মঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল।

পল্লবের মিসেস নর্টনকে প্রথম দিনই ভাল লেগেছিল। কারণ তিনি যে শুধু সুন্দরী ছিলেন তাই নয়, তাঁর মুখের মধ্যে এমন একটা শুভ্র পবিত্রতার ও অন্যমনস্ক বৈরাগ্যের ছায়া বিরাজমান ছিল যেটা পল্লবের মনে কেমন যেন এক গভীর তৃপ্তির অবলেপ এনে দিত। দেশে তার দুই একজন বিধবা আত্মীয়ার মুখের পবিত্রতা ও প্রশান্তির আভাষ তার মনে বরাবরই একটা গভীর পরিতৃপ্তির আস্বাদ এনে দিত। মিসেস নর্টনের আননে সে অনেকটা সেই রকম জ্যোতিঃ

দেখ্‌তে পেত ব'লেই তার তাঁকে প্রথম দিন থেকেই এতটা ভাল লেগে গিয়েছিল। মিসেস নর্টনের সঙ্গে তার যতই পরিচয় হ'তে লাগ্‌ল তার এ শ্রদ্ধাও ততই গভীর হয়ে উঠ্‌ছিল। পল্লবের কাছে জননীর অসংখ্য গুণাবলী ও মহত্ত্বের কথা বল্‌তে বল্‌তে জনের চোখ দুটি প্রায়ই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত। পল্লব তার কাছে মিসেস নর্টনের সম্বন্ধে যে সব কথা শুন্‌ত তাতে তার প্রায়ই মনে হ'ত যে সে এ যাবৎ ইংরাজ মেয়েদের ওপর গভীর অবিচার করে এসেছে। মিসেস নর্টন শুধু উচ্চবংশীয়া নন তার উপর ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু যথেষ্ট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আভিজাত্যের মধ্যে বিবাহ করেন নি। তাঁর পিতামাতার ইচ্ছা সত্ত্বেও ও অনেকগুলি ধনী-সন্তানের তাঁর পাণিপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মিষ্টার নর্টনকে বিবাহ করেন শুদ্ধ প্রেমের জন্য—কারণ মিষ্টার নর্টন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র ছিলেন। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখময়ই হয়েছিল। তিনি স্বামীকে এত প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলেন যে, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর পরে পিতামাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করতে রাজি হন নি ও দু'বৎসরের মধ্যেই দু'তিন জন করপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বরাবর ম্লান হেসে বল্‌তেন যে, বিবাহ মানুষের একবারই হ'তে পারে।

কিন্তু বিলাতী সমাজে ধনী সুন্দরী মধ্যবয়স্কা বিধবার "না" বলাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাই মিসেস নর্টন সামাজিক নিমন্ত্রণে প্রভৃতিতে গেলে তাঁর হতে-পারে এরূপ অনেক স্বামীই তাঁকে মনোযোগ, সানুরোধ দৃষ্টি, সাড়ম্বর ভদ্রতা প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর উদ্ব্যস্ত করে তুল্‌ত। যতই দিন যেতে লাগ্‌ল তাঁর প্রতি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের সানুরাগ দৃষ্টি ততই স্নেহ-সজল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শেষটা এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে মিসেস নর্টনকে বাধ্য হ'য়ে লণ্ডনের সামাজিক ও ফ্যাশনেবল্ জীবনের সব মায়ামমতা ছেড়ে পুত্র কন্যাকে নিয়ে কেম্ব্রিজে বাস কর্ত্তে আস্‌তে হ'ল। বাধ্য হ'য়ে সামাজিক জীবনের সঙ্গে শেষ বন্ধনটিও ছিন্ন ক'রে চ'লে আসার পর থেকে এই সন্তান দুটিই বিয়োগবিধুরা, পতিব্রতা বিধবার যেন একমাত্র সম্বল হ'য়ে দাঁড়াল। তখন থেকে তাদের শিক্ষা দেওয়া, পড়াশুনা, গৃহকর্ম্ম ও ধর্ম্মচিন্তার মধ্যেই মিসেস নর্টন আপনাকে একান্ত ভাবে মগ্ন ক'রে রেখেছিলেন।

মিসেস নর্টন স্বভাবতঃই উদারপন্থী ছিলেন। তাই তিনি পল্লবকে ভারতীয় ব'লে দূরে রাখবার চেষ্টা করতেন না। বরং তার সঙ্গে বেশি সাদর ব্যবহার করতেন—নইলে পাছে সে ইংরাজ-রমণীর স্বভাবতঃ দূর ব্যবহারকে জাত্যভিমান ভেবে আহত হয়। তাছাড়া তিনি চাইতেন যে তাঁর সন্তানদ্বয় বাল্যকাল থেকেই নানাজাতীয় লোকের সঙ্গে মেশে। কারণ তিনি প্রায়ই বল্‌তেন যে মানুষের জাতীয় অভিমান, সভ্যতার গর্ব্ব প্রভৃতির মূল হচ্ছে বাল্যের কুশিক্ষা। তাই (তিনি বল্‌তেন) এ অভিমানের মূলে কুঠারাঘাত কর্ত্তে পারলেই ভাল, এবং শৈশবে নানা-জাতীয় লোকের সংস্পর্শে এলে এ উদ্দেশ্য যেমন সহজে সিদ্ধ হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। তাঁর সদা-সংযত ব্যবহার, গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল আনন, ভদ্র অথচ আন্তরিক আতিথেয়তা, কথাবার্ত্তায় চিন্তাশীলতা ও সর্ব্বোপরি মৃত স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠার কাহিনী—পল্লবের মনে একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছিল। দেশে বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখে, দুচারটে বাজে উপন্যাস প'ড়ে ও তার বিলাত-প্রত্যাগত দু' চারজন বিজ্ঞমন্য আত্মীয়ের অসার মতবাদ শুনে শুনে পল্লবের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, মেমসাহেবরা সবই বিলাসিনী, হাব-ভাবপরায়ণা ও উচ্ছৃঙ্খল। তার মনটি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের নীতিবাগীশ-দের উদ্দীপ্ত নিন্দায় সায় দিয়ে গম্ভীর ভাবে শিরঃসঞ্চালন করে বল্‌ত যে যারা যার-তার সঙ্গে গল্প করে, মেশে, হাসে, নাচে, গায় তাদের মধ্যে আবার সতীত্ব?—অসম্ভব। কিন্তু মাত্র মিসেস নর্টনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অবধি তার কেবলই মনে হ'ত যে তার সে সব ধারণা কি অসার ছিল! তরুণ বয়সে মানুষ অল্প অভিজ্ঞতায় ও অনেক সময়ে দু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে নির্ভয়ে ভাল মন্দ দুই বিষয়েই সাধারণ মতামত প্রচার কর্ত্তে ভালবাসে। দেশে তার এক প্রবীণ পিতৃবন্ধু বলেছিলেন যে মেমেরা সব—। মিসেস নর্টনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করার পর সে অকথ্য কথা মনে আন্‌তেও পল্লবের কুণ্ঠার সীমা থাকত না। এবং এ অন্যায় কুৎসার প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে আজকাল প্রায়ই বিলাতী মেয়েদের সদ্‌গুণাবলীকে একটু

বেশি বড় ক'রে দেখত। আর তার বিলাতী সমাজের সঙ্গে পরিচয় সামান্য ও নিতান্ত অগভীর হ'লেও এ অল্প অভিজ্ঞতায়ই তার মনে একটা কথা বড় বেশী ক'রে আঘাত দিত। সেটা এই যে য়ুরোপ সম্বন্ধে যারা কিছুই জানে না, শিষ্ট য়ুরোপীয়দের সঙ্গে যারা জীবনে কখনও মেশবার সুযোগ পায় নি, এমন কি য়ুরোপের সভ্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে যাদের ধারণার মূল—মাত্র তাদের কূপমণ্ডুকতা;—তারাই কি না য়ুরোপের শুধু চালচলন নয়, নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েও অবলীলাক্রমে মতামত প্রকাশ কর্‌তে তৎপর হ'য়ে ওঠে!—আর তা এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে যেন তাদের বাণী বেদের চেয়েও অপৌরুষেয়! কার্য্য কারণ সম্বন্ধের চেয়েও অবশ্যম্ভাবী!! গণিতের স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের চেয়েও অকাট্য!!!

মিসেস নর্টনের মতন সুযোগ, সুবিধা—এমন কি শত প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও যে নারী পুনর্ব্বিবাহ না ক'রে স্বামীর স্মৃতি-ধ্যান ক'রে জীবন কাটাতে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে-ই বড় সতী, না জোর ক'রে যাদের আমরা ঘরে বন্ধ ক'রে অনাহারে শুকিয়ে দেবী ক'রে রাখি তারাই বড় সাধ্বী, এ প্রশ্ন পল্লবের মনে ক্রমেই বেশি ক'রে উদয় হ'ত। এ সম্বন্ধে মোহনলালের একটি কথা তার প্রায়ই মনে হ'ত। বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে কুঙ্কুমের দু একটি প্রবল মতামতের উত্তরে এক দিন মোহনলাল বলেছিল যে, যে দেশে লোকমত বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে, সে দেশে বিধবার পক্ষে পুনর্ব্বিবাহে ঘৃণা খুব গভীর ত হ'তে পারেই না, বরং সে সুযোগ উপস্থিত হ'লে তার বিবাহ না করাটাই অভাবনীয় হ'য়ে ওঠে। পল্লবের মনে হ'ত 'ঠিক্ কথা'। সঙ্গে সঙ্গে তার আরও মনে হ'ত যে এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ না করাটা ঠিক্ অভাবনীয় ব'লেই মহিমময়। কারণ সাধারণ মানুষ সমসাময়িক আচার ও নীতির মাপকাটি দিয়েই পনর আনা কাজের ও প্রবৃত্তির উচিতানুচিত বিচার করে। কাজেই যেখানে বিধবা-বিবাহ প্রশস্য সেখানে পূর্ব্ব স্বামীর স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখা অনেক বেশি কঠিন না হ'য়েই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস নর্টনের পবিত্র মুখকান্তি, গভীর পাতিব্রত্য, সহৃদয় ব্যবহার প্রভৃতি মনে করে তার কোমল আদর্শপন্থী মনটি প্রায়ই ভ'রে উঠত।

"রিণা যে একাই বেশ আসর সরগরম ক'রে রেখেছে দেখছি মিষ্টার বাক্‌চি। আপনিও বোধহয় বেশ থাকেন ছেলেপিলেদের সঙ্গে, না?"

পল্লব বল্‌ল, "সব ছেলেপিলেদের সঙ্গে বেশ থাকি এমন কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে মিসেস নর্টন।"

"কিন্তু আমার ত মনে হয়, আপনি ছোট ছেলেপিলে-দের খুব ভালবাসেন।"

"বাসি বটে—কিন্তু সকলকে নয়। শিশু মাত্রকেই নির্ব্বিশেষে ভালবাসতে পেরেছিলেন বোধ হয় জগতে একজন মাত্র। তিনি যীশুখৃষ্ট। আমি ভালবাসি—সুন্দর ও মিশুক ছেলেপিলেদের। কারণ আমার মনে হয় যে, সব শিশুর স্বভাব মিষ্ট হয় না, বা সকলের সঙ্গে ইচ্ছে কর্‌লেই ভাব করাও যায় না। তাছাড়া—তাছাড়া"—

ব'লে একটু থেমে পল্লব হঠাৎ একটি ছোট্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে বস্‌ল "তাছাড়া সকলের পিতামাতা সেটা পছন্দও করে না।" ব'লেই সে একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল; কারণ একটা নিরুদ্ধ ব্যথাই তার শেষ কথা কয়টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছিল। পরীক্ষায় ভাল করে পাশ না করার দরুণ আজকাল তার মনটা প্রায়ই একটু বেশি রকম সমবেদনার জন্য লালায়িত হয়ে থাক্‌ত। নইলে হয়ত সে আজ হঠাৎ এমন অতর্কিত ভাবে তার এক নিহিত ব্যথার প্রসঙ্গ ওঠাতে পার্‌ত না। মিসেস নর্টন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন, "সে কি মিষ্টার বাক্‌চি! সন্তানকে আদর করলে কি কখনও কোন পিতামাতা অসন্তুষ্ট হ'তে পারে?"

পল্লব বল্‌ল, "আমিও এক সময়ে তাই ভাবতাম মিসেস নর্টন। ভিক্টর হিউগোর একটা বিখ্যাত বইয়ে একবার প'ড়েছিলাম যে, বাপমা যতই কেন না কঠিন হোক্, কেউ তাদের সন্তানকে সুন্দর বল্‌লে তার প্রতি তাদের হৃদয় আর্দ্র না হ'য়েই পারে না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ।"

রিণা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, "মা ঐ আইরিণ ডাক্‌ছে। আমি একবার বাইরে যাই?"

মিসেস নর্টন বললেন "আচ্ছা যাও, কিন্তু যদি এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে, তাহ'লে খেলা ছেড়ে তক্ষনি বাগান থেকে চলে আস্‌তে হবে মনে রেখো।"

রিণা "আচ্ছা" বলে বেরিয়ে গেল।

রিণা বাইরে চলে গেলে মিসেস নর্টন পল্লবকে চা দিয়ে বললেন "আপনার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কি রকম বলুন না মিষ্টার রাক্‌চি—অবশ্য যদি বলতে বাধা না থাকে।" ব'লেই তাঁর মনে হ'ল হয়ত এ কথাটা জিজ্ঞাসা না করলেই ছিল ভাল। কারণ তিনি প্রশ্নটি ক'রেই তাঁর নারীসুলভ সহজ-অনুভূতির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে হয়ত পল্লবের এক ব্যথার তারে ঘা পড়বে। তাই তিনি আবার তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, "কিন্তু যদি বাধা থাকে তাহ'লে আমি আপনাকে বল্‌তে বলছি না—"

পল্লব বাধা দিয়ে বল্‌ল, "না মিসেস নর্টন, বাধা আর কি? বিশেষতঃ আপনাকে বল্‌বার আবার বাধা কি থাক্‌তে পারে?"

এই "আপনাকে" কথাটির ওপর সে সহসা একটু বেশি জোর দিয়ে ফেল্‌ল। মিসেস নর্টন যে অতর্কিতে তার ব্যথার স্মৃতি জান্‌তে চাইবার দরুণই এ সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছিলেন সে কথা পল্লব টের পেয়েছিল। অপরের ব্যথার প্রতি মিসেস নর্টনের এরূপ সদা-সচেতন দরদ পল্লবের বরাবরই বড় ভাল লাগ্‌ত।

অবশ্য সে অনেক সময়েই এরকম ছোট খাট ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর কোমল নারীহৃদয়ের মনোজ্ঞ সৌকুমার্য্যের পরিচয় পেত। কিন্তু আজ তাঁর এ সহজ সমবেদনাকে সে হঠাৎ একটু বেশি বড় ক'রে না দেখেই পার্‌ল না। তার একটু বিশেষ কারণও ছিল। পরীক্ষার ফল মন্দ হওয়া অবধি তার মনটা প্রায়ই বিষণ্ণ থাক্‌ত। এরূপ সময়ে নারীহৃদয়ের সামান্য সহানুভূতিও মানুষের মনের উপর কম সান্ত্বনার স্নিগ্ধতা এনে দেয় না। তাই আজ মিসেস নর্টনের এ সামান্য সুকুমার গুণের দৃষ্টান্তটিও তার কাছে বড় হ'য়ে না উঠেই পারে নি। ফলে সে "আপনাকে বল্‌বার বাধা কি থাক্‌তে পারে" প্রশ্নটি কর্‌বার সময়ে "আপনাকে" কথাটির ওপর অজ্ঞাতে একটু বেশি জোর দিয়ে বস্‌ল।

মিসেস নর্টন নিজেকে পল্লবের এ আবেগের লক্ষ্য বুঝে সহসা একটু আরক্তিম হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ জোর ক'রে সহজ সুরেই বল্‌লেন "তবে বলুন না মিষ্টার রাক্‌চি। কিন্তু তার আগে আপনি আর চা বা কেক চান কি না বলুন।"

পল্লব বল্‌ল "ধন্যবাদ। যদি আর একটু চা দেন ত বেশ হয়।" তার আর চা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তবে কথাবার্ত্তাকে একটু সহজ করে তোলার জন্যই সে এ কয়টি সাদা কথা ব'লে একটু স্বস্তির আস্বাদ পেতে চাইল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পল্লব বল্‌তে লাগ্‌ল—তখন সে জাহাজে করে দেশ ছেড়ে বিলেতে আস্‌ছে। তার দুর্ভাগ্যক্রমে সে জাহাজে একজনও ভারতীয় আরোহী ছিল না। জাহাজের ইঙ্গ-ভারতীয় আরোহিগণ তাকে শতহস্ত দূরে রাখ্‌ত। এমন কি জাহাজের টেবিলেও তার আশে পাশের সাহেব মেমরা তার সঙ্গে কথা কইত না। একজন মাত্র মোটা ও বেঁটে বড় সাহেব ছিলেন। তাঁর যেন জীবনের ব্রত ছিল—পল্লবকে সর্ব্বদা বিলাতী আদবকায়দা ও ভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে অশ্রান্ত ভাবে উপদেশ দেওয়া। পল্লব এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাসখানেক ভারি কষ্ট পেয়েছিল। তার আত্মীয়-স্বজন-বিচ্ছেদ-বিধুর মনটি তখন অভূতপূর্ব্ব রকমে একটি মিষ্ট কথার ও একটু মিষ্ট ব্যবহারের কাঙাল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে সে সান্ত্বনাটুকুও দেবার কোনও লোক ছিল না। জাহাজে বিজলী-বাতির কাজে একটি দরিদ্র বাঙালী ছেলে নিযুক্ত ছিল। পল্লবের সামুদ্রিক পীড়ায় মুহ্যমান অবস্থায় কেবল সেই ছেলেটি এক আধবার তার খোঁজ নিত। হঠাৎ আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়পরিজনের স্নেহক্রোড় হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তার কাতর মনটি যখন এ নিঃসঙ্গতার মাঝখানে একান্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, তখন যেন বিধাতা কৃপাপরবশ হয়েই দুটি ছোট্ট ইংরাজ শিশুকে তার বেদনা দূর করতে পাঠিয়ে দিলেন। পল্লবের ব্যথাতুর মনটির কাছে এ শিশু দুটির সঙ্গ যেন অমৃতময় বোধ হ'তে লাগ্‌ল। এ দুটি ভাইবোন প্রায়ই তার কোলে চড়ে অনর্গল তার সঙ্গে গল্প ক'রে যেত। দেশে তাদের কটা চাকর আছে, কত খেলনা আছে, কয়টি কুকুর আছে—ইত্যাদি গুরুতর তথ্য পল্লবকে জ্ঞাপন করা ছিল তাদের নিত্যকর্ম্ম। পল্লবের স্নেহ-তৃষ্ণার্ত্ত মনটির ওপর এই শিশুদ্বয়ের বিশ্রম্ভালাপ যেন সুধাবর্ষণ কর্‌ত। পল্লবও তাদের খুব গল্প বল্‌ত। ফলে তাদের সঙ্গে তার খুব শীঘ্রই ভাব হয়ে গেল। পল্লব প্রায় রোজ রাত্রে দেশের স্বপ্ন দেখ্‌ত, এবং রোজ সকালে নিদ্রাভঙ্গ হবামাত্র তার আক্ষেপ হ'ত যে স্বপ্ন সত্য হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তার

শৈশবের দোলার দুরন্তের কথা মনে ক'রে তার মনটি ব্যথাভারে অবনত হয়ে পড়্‌ত। কিন্তু তার এই শিশু বন্ধুযুগল লাভ করার পর থেকে সত্যই তার এই নবলব্ধ বন্ধুত্বের তৃপ্তির মধ্য দিয়ে তার সে প্রাত্যহিক সকালবেলার ব্যথার অনেকটা উপশম মিল্‌ত।

বস্তুতঃ সমস্ত দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা তাদের সঙ্গে খেলাগল্প করাই ছিল পল্লবের সমুদ্র-জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। এমন সময়ে এক দিন সকালে পল্লব তাদের ডাক্‌তেই তারা ব'লে উঠ্‌ল যে, তারা আর তার কাছে যাবে না। ব্যথিত হ'য়ে 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে ছোট মেয়েটি বল্‌ল যে তাদের মা কাল রাত্রে তাদের বলেছে যে নেটিভের কাছে তাদের যাওয়া চল্‌বে না। এ কথা বল্‌তে বল্‌তে ব্যথায় পল্লবের অন্যমনস্ক চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল কর্‌তে লাগ্‌ল।

মিসেস নর্টনের চোখ দুটিও এ কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে জলে ভরে উঠেছিল। এতক্ষণ পল্লব সেটা লক্ষ্য করে নি; কারণ সে মাটির দিকে চোখ নীচু করে যেন আপন মনেই এ কাহিনী নিজের কাছে আবৃত্তি করে যাচ্ছিল। তার বলা শেষ হ'লে হঠাৎ তার ও মিসেস নর্টনের চক্ষু মিলিত হ'ল। মিসেস নর্টন লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অশ্রুভার গোপনে তাঁর রেশমী রুমালে মুছে অস্ফুট স্বরে বল্‌লেন "তারা মানুষ নয় বোধ হয়।"

পল্লব বিদেশীর কাছে আজ অবধি কখনও এত মন খুলে কথা কয় নি। তাই সে হঠাৎ এতটা নিঃসঙ্কোচে মিসেস নর্টনের কাছে নিজের গোপন ব্যথার কথা বলে ফেলার জন্য একটু কুণ্ঠিত বোধ না ক'রেই পার্‌ল না, যদিও সঙ্গে সঙ্গে যে সে একটা পরম তৃপ্তির আস্বাদও পায় নি তা নয়। যাই হোক্ সে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করার জন্য বল্‌ল—"দেখুন ত কোথা থেকে আমরা কি কথা এনে ফেলি! আশ্চর্য্য! যাক্ একথা। আমি আজ আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি।"

মিসেস নর্টনও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসু নেত্রে পল্লবের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "বলুন।" ব'লেই একটু হেসে বল্‌লেন—"যদিও আমি যে কি বিষয়ে আপনার পরামর্শদাত্রী হ'তে পারি তা ভেবেই পাচ্ছি না।"

পল্লব তার সঙ্গীতানুরাগ, বিলাতে সঙ্গীত শেখার ইচ্ছা, বন্ধুবান্ধবদের এ সম্বন্ধে উপদেশ এ সবই খুলে বল্‌ল।

মিসেস নর্টন ধীরভাবে সব কথাগুলি শুনে বল্‌লেন "আমি আপনার দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ হয় অনেকটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মতন অনভিজ্ঞা নারীর পক্ষে আপনাকে পরামর্শ দিতে যাওয়া কি ঠিক?—বিশেষতঃ যখন আমি আপনাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানি না বল্‌লেও চলে। তা আপনি এক কাজ করুন না কেন? আমার একটি আত্মীয় সাউথেণ্ডে থাকেন। সমুদ্রের ধারে তিনি একটি চমৎকার বাড়ী কিনে আছেন। তিনি লণ্ডনের একটা ব্যাঙ্কে কাজ করেন ও খুব উচ্চশিক্ষিত লোক। তাঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন না কেন? তিনি জগতের অনেক দেখেছেন শুনেছেন ও শুধু তাই নয়, তিনি একজন সত্যই অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। এমন উদার অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিদ্বান্ অথচ নিরহঙ্কার, খাঁটি ইংরাজ অথচ অভিমানবর্জ্জিত লোক আমি কমই দেখেছি। তিনি সম্ভবতঃ আপনাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারবেন। আপনি যদি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাক্‌তে রাজি থাকেন তা'হলে আমি চিঠি লিখে তাঁর নিমন্ত্রণ আপনাকে আনিয়ে দিতে পারি।"

পল্লব ভাব্‌ল, মন্দ কি? তাছাড়া মোহনলাল তাকে একবার বলেছিল যে, ভারতবর্ষে যাই হোক্ না কেন, ইংলণ্ডে নিজের বাড়ীতে ইংরাজের মতন ভদ্রলোক জগতে দুর্লভ। পল্লব ভাব্‌ল একবার পরখ করে দেখাই যাক্ না কেন।

পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। পল্লব কেম্ব্রিজ থেকে সাউথেণ্ডে যাত্রা কর্‌ল। রিণা ও মিসেস নর্টন পল্লবের সঙ্গে ষ্টেশনে গেল। তাকে গাড়ীতে তুলে দেবার সময়ে রিণা বল্‌ল "মিষ্টার রাক্‌চি! সাউথেণ্ড থেকে ফেরবার সময়ে কিন্তু আমার জন্য একটা লাল ডল আনা চাই। নইলে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি হবে।"

পল্লব চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌ল "বাপ্ রে! তাহ'লে কি ডল না এনে পারি?"

মিসেস নর্টন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "না না মিষ্টার রাক্‌চি, ডল টল কিছু আন্‌তে হবে না। রিণাকে কোনও

মতে কথা শোনাতে পারছি না, কি করি বলুন ত? বল্‌লে শোনে না। সকলকে বিরক্ত ক'রে মারে। ডল ওর ঢের আছে।"

রিণা কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর দিল "ডল ত আছে। কিন্তু লাল ডল কি আছে? আইরিণের দাদা তাকে কেমন লাল টুকটুকে ডল কিনে এনে দিয়েছে। আর আমি লাল ডল চাইলেই যত দোষ! বা রে!"

পল্লব তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল "ঠিক কথা রিণা। লাল ডল না হ'লে কখনও সংসারে চলে! তোমার কোনও দোষ নেই। সব দোষ তোমার মার। আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে লাল ডল আন্‌ব।"

এমন সময়ে গার্ড চেঁচিয়ে বলল "সব আরোহী প্রস্তুত হোন্।"

মিসেস নর্টন বললেন "মিষ্টার বাক্‌চি। আদর রেখে উঠুন এখন। রিণার ডলের সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য ত গাড়ী অপেক্ষা করবে না।"

পল্লব গাড়ীতে উঠে মিসেস নর্টনের সঙ্গে হস্তমর্দ্দন করে রিণার গালে একটি চুমা দিয়ে বল্‌ল "গুড বাই রিণা।"

উত্তরে রিণা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে তাকে দুটি চুমা দিয়ে বল্‌ল "গুডবাই মিষ্টার বাক্‌চি। না—না আইরিণ বলেছিল অ-রিভোয়ার বল্‌তে হয়। না মা?"

মিসেস নর্টন হেসে বল্‌লেন, "হাঁ।"

গাড়ী ছাড়্‌ল। পল্লব গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগ্‌ল। মিসেস নর্টনও রুমাল নাড়তে লাগ্‌লেন। রিণা মহা ব্যস্ত হ'য়ে তার ছোট্ট পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজে না পেয়ে মহা উদ্বিগ্ন হ'য়ে মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,

"মা, আমার রুমাল?"

মিসেস নর্টন বল্‌লেন, "রুমাল এখন থাক্। তুমি শীগ্‌গির হাত নাড় রিণি। ঐ দেখ মিষ্টার বাক্‌চি তোমার দিকে চেয়ে কি বল্‌ছেন।"

পল্লব সস্মিতমুখে বল্‌ছিল, "লাল ডল—কেমন?"—

রিণা রুমালের শোক এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সজোরে হাত নাড়তে নাড়তে বল্‌ল, "হাঁ—লাল ডল—খুব বড়……"

ধীরে ধীরে রিণার উদ্ভাসিত মুখ ও মিসেস নর্টনের স্নেহকোমল আনন সন্ধ্যার ম্লানিমায় অস্পষ্ট হয়ে এল। ক্রমে দূরে কেবল মিসেস নর্টনের সাদা রুমালখানি দেখা যাচ্ছিল। ক্রমে তাও অদৃশ্য হ'ল। দূর বিদেশে এই দুই শুভাকাঙ্ক্ষিণীর সস্নেহ বিদায় সম্ভাষণে পল্লব তার মনের মধ্যে কেমন যেন এক স্নিগ্ধ মলয়-পরশের পুলক-শিহরণ অনুভব কর্‌ল। কারণ বিদেশীর মধ্যে বন্ধু লাভ তার এই প্রথম। তাই এ অভিনব অভিজ্ঞতার সুষমা তার কাছে এক অপূর্ব্ব রহস্যরসে সিঞ্চিত হ'য়ে ধরা না দিয়েই পারে নি।

ষ্টেশনে নানান্ লোকে ট্রেণের নানান্ আরোহী আত্মীয় বন্ধুর উদ্দেশে রুমাল হাত বা টুপি নাড়ছিল। পল্লব ইতিপূর্ব্বে বিলাতে ট্রেণে ভ্রমণ করবার সময়ে অনেক সময় এরূপ বিদায়-সম্ভাষণের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ কর্‌ত। আজ তার সর্ব্বপ্রথম সে কামনা পূর্ণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা সগর্ব্ব আনন্দের উদয় হ'ল যে এ দূরদেশে বিদেশীর মধ্যেও তাকে এমন আত্মীয়ের মতন বিদায়-সম্ভাষণ দেবার লোক আছে। তা ছাড়া আজ তার কেমন যেন বার বার এই কথা মনে ক'রে একটা অনির্দ্দেশ্য তৃপ্তির রসে সমগ্র মনটা কাণায় কাণায় ভ'রে উঠ্‌ল যে যাদের প্রীতির ডালি আজ তার হৃদয়ের দুয়ারে এতটা সত্যকার অমৃত পরশ বহন করে এনে দিয়েছে, দুদিন আগে তাদের অস্তিত্বও যে তার অগোচর ছিল! এ একটা কি সুদূর মধুর অনুভূতি!…পরকে আপন করার মধ্যে যে সার্থকতা-রস আছে, তার পরশ সব নবলব্ধ বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যেই বিরাজ করে বটে,—কিন্তু এ লাভের ক্ষেত্রে বিদেশী, ভিন্নধর্ম্মীও যে এত সহজে নিকটে আস্‌তে পারে, এ অনুভূতির নূতনত্ব আজ পল্লবের কাছে সর্ব্বপ্রথম এক অপূর্ব্ব রসসম্পদে মহিমোজ্জ্বল হ'য়ে ধরা দিল…সঙ্গে সঙ্গে তার এ নবলব্ধ বান্ধবীদ্বয়ের অকৃত্রিম ও অহেতুক স্নেহশুভেচ্ছার কথা ভেবে তার হৃদয়টি কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

উড়ো-চিঠি

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকুমার বিদ্বান এবং প্রিয়দর্শন যুবক হইলেও তাহার "স্ত্রী-ভাগ্য" যে তেমন সুবিধার ছিল না, এ কথাটা লইয়া অনেক সময়ে বন্ধু-মহলে প্রথম প্রথম বেশ একটু সমালোচনা চলিত। তাহার বন্ধুরা যখন তামাসা করিয়া বলিত—"কিন্তু যা বল সুকুমার, তোমার স্ত্রীর রংটা ভাই একটুও ফরসা নয়, ওকে 'অমলা' বলা চলেই না।" সুকুমার হাসিয়া কহিত, "ওহে, মানুষের চামড়ার বর্ণটা যেমনই হোক্ না, তার কোন মূল্য নেই…রূপ দেখতে হবে অন্তরের, সেইখানেই ঢালা আছে পাকা খাঁটি রং…মানুষের আসল রূপ!" জবাব শুনিয়া বন্ধুরা হাসিত।

কিন্তু, অতীত কথা পুরাতন হইলেও, দুঃখের বিষয়, সুকুমারের স্ত্রী অমলার গায়ের বর্ণটা, এত সাবান, Hazelene ইত্যাদি মাখা সত্ত্বেও যখন কিছুতেই ফিরিল না, অমলা তখন মনের দুঃখ বুকে চাপিয়া রূপ-প্রসাধন সম্বন্ধে একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল! সুকুমার এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু বলিলে অমলা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিত "যার জন্য রূপের দরকার, তা ত হয়েই গেছে…রূপ দিয়ে আর কি ক'রব!" কিন্তু দিনের পর দিন একটা অমূলক ধারণা তার অন্তরকে পীড়ন করিতে লাগিল। অমলা ভাবিল, সে রূপহীনা বলিয়া স্বামী তাহাকে ভালবাসে না! তার একটা হেতুও সে মন হইতে খুঁজিয়া বাহির করিল। পাশের বাড়ীটায় এক ঘর ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তাঁদের ১৮।১৯ বছরের ফুট-ফুটে চেহারার সাজ-গোজ করা মেয়েটি বেথুন কলেজের গাড়ী আসিলে যখন তার একরাশ কালো চুলের গোছা পিঠে ফেলিয়া বই হাতে নতমুখে গাড়ীতে উঠিত, তখন তার সুন্দর, মাধুর্য্যভরা মুখখানি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একদিন যখন অমলা দেখিল, সেই মেয়েটির দিকে সুকুমার চাহিয়া আছে, তাহার ব্যাধিগ্রস্ত মন তখন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কর্ম্মক্লান্ত সুকুমার Court হইতে ফিরিয়া, সন্ধ্যাকালে যখন তাহার ঘরের দক্ষিণের জানালা খুলিয়া দিয়া অলস ভাবে ঈজি-চেয়ারখানায় শুইয়া পড়িত তখন সেই পাশের বাড়ী হইতে, অর্গ্যানের সুরে মিলিত, মধুর সঙ্গীতধ্বনি বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিত, আর সুকুমার চক্ষু বুজিয়া তন্ময় ভাবে গান শুনিত! সহসা অমলা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া স-শব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, মুখ-চোখ লাল করিয়া গর্জ্জন করিয়া কহিত, "ওই বেহ্মা মেয়েটাকে না দেখতে পেলেই বুঝি মন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, আর অমনি জানলাটা খুলে দেওয়া হয়?" সুকুমার হাসিয়া কহিত, "তুমি কি ক্ষেপলে না কি?…আচ্ছা, এতই যদি সন্দেহ তোমার, না হয় জানলা বন্ধ ক'রে দাও।—কিন্তু গানটা মন্দ লাগ্‌ছিল না…তুমিও না হয় শোন একটু!" এমনিধারা খুটি-নাটির ভিতর দিয়া ক্রমে অমলার মনে বেশ একটা সন্দেহের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

সেদিন Court বন্ধ ছিল। সমস্তটা দিন বৃষ্টি হওয়ার পর এই কিছুক্ষণ হইল একটু থামিয়াছে। আকাশে তখনও মেঘ ভরপুর। সুকুমার চা পান শেষ করিয়া সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর কি ভাবিয়া ঈজি-চেয়ারখানা একটু সরাইয়া নিকটস্থ টেবিলের উপর হইতে একখানা কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে অর্গান বাজিয়া উঠিল, বর্ষার ভিজে বাতাসে ভাসিয়া আসিল সেই সুরের সঙ্গে সুর মেশানো কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত একটা সঙ্গীত স্তবক "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে"…সুকুমার পুস্তক পাঠ ভুলিয়া গেল; সে তন্ময়চিত্তে গান শুনিতে লাগিল। অমলা নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল…আজ তাহার মুখখানিও বাহির প্রকৃতির মতই ঘনঘটাচ্ছন্ন। সহসা চুড়ীর শব্দে সুকুমার মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অমলা! সুকুমার হাসিয়া কহিল "কেমন লাগ্‌ছে?" অমলা ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "সুধাবৃষ্টি কচ্ছেন আর কি! কাণ জুড়িয়ে গেল!"

অমলার হাতে একখানি পত্র দেখিয়া সুকুমার বলিল "ওখানি কার চিঠি?"

অমলা মুখভঙ্গি করিয়া কহিল, "কিছুই জানেন না যেন! মহাশয়ের প্রেম-পত্র!!"

সুকুমার আশ্চর্য্য ভাবে কহিল "প্রেম-পত্র?"

—"আজ্ঞে—ভাগ্যিস্ ডাকে ফেলা হয় নি, তাই দেখতে পাওয়া গেল! পড়ব?...শুনবে?"...কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অমলা মুখভঙ্গি করিয়া পড়িতে লাগিল " 'প্রাণের আমিনা'!

সুকুমার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "ওঃ এই!...থাক্ আর পড়তে হবে না...আমি বুঝেছি।"

ব্যঙ্গস্বরে অমলা কহিল "লিখতে পেরেছ, আর এখন শুন্‌তে বুঝি ভারি লজ্জা হচ্ছে...নয়?"

সুকুমার উদাস কণ্ঠে বলিল, "ও শুনে আর কি ক'রব? যাক্...তবুও রক্ষে। আমি ত ভেবেই আকুল...Criminal Procedure Codeএর কোন section আবার মাথায় চাপালে শেষটায়!...এই ত তোমার "charge", না আরও কিছু আছে?" সুকুমার খুব খানিকটা হাসিল।

"থামো...থামো, তোমার ও সব ওকালতী চাল্ আর খাট্‌ছে না...আবার হাসছ কোন মুখে?...লজ্জা হচ্ছে না?"

হো-হো শব্দে সুকুমার হাসিয়া কহিল, "একটুও না। বরং ভারি আমোদ হচ্ছে এই কথাটা ভেবে যে তুমি আমায় কতখানি ভালবাস!"

অমলা অবাক্ হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল, এই গোপনীয় চিঠিখানা দেখাইলে তাহার স্বামীর অবস্থা না জানি কিই-বা ঘটিবে! কিন্তু এ কি হইল? এমন জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তাহার স্বামী কিছু মাত্রও লজ্জিত না হইয়া বরং হাসিতেছে দেখিয়া তাহার মনে একটা খট্‌কা লাগিল।...তবে কি সে ভুল করিল... না, তাই বা কেমন করিয়া হয়...এই ত তাহার স্বামীর নিজের হাতের লেখা চিঠি! সে সহসা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "হেসে উড়িয়ে দেবে মনে করেছ,...তা আর হচ্ছে না। তুমি কি বলতে চাও, এ লেখা তোমার নয়?"

"হ্যাঁ আমারই লেখা। শুধু ওই একখানা কেন, ওমনি ধারা আরও অনেক চিঠি আছে, দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সব শোন, নইলে ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবে না।" ব্যাপারটা ক্রমেই যেন অমলার কাছে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। সে সুকুমারের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "কই দেখি সে সব চিঠি!...তারপর যা হয় শুনবো।" মৃদু হাসিয়া সুকুমার পাশের দেরাজ খুলিয়া রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া খুলিতে খুলিতে কহিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন?... এই দেখ কত চিঠি, "আমিনার" নামে লেখা রয়েছে, আর তার তলায় নাম সই করছে 'মনসুর'।...আর এ সমস্তগুলিই আমারি হাতের লেখা। যে চিঠিখানা তুমি পেয়েছ, ওটা অর্দ্ধেক লেখা হয়েছিল মাত্র—বাকীটা শেষ হয় নি' ব'লে তলায় নাম লেখা নাই!" অমলা বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কে মনসুর? আর তুমিই বা এ সব লিখতে গেলে কেন...কে আমিনা?"

সুকুমার পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া ঈজি চেয়ারের পাশে বসাইয়া কহিল, "শোন, সে বড় এক অদ্ভুত প্রেমের কাহিনী। বাদলার সন্ধ্যাটা বরং কাট্‌বে ভাল। প্রায় আট দশ বছর আগেকার কথা, আমি তখন এলাহাবাদে আমার মামার বাসায় থেকে কলেজে পড়তাম। বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ মামা বদলি হয়ে চলে গেলেন; কাজেই আমাকে একটা বাসা দেখতে হ'ল। সহরের এক কোণে মুসলমান পল্লীতে একটা একতলা বাড়ী কম ভাড়ায় পাওয়া গেল। আমি ও আমার বন্ধু হরেন দুজনে মিলে সেখানে থাকতাম। চাকর বাকর ছিল না, নিজেরাই যা হয় কোন প্রকারে চালিয়ে নিতাম। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা স্ত্রীলোক থাকতো, তার বয়স হবে বছর ২৫।৩০ আন্দাজ। রংটা তার যেমন কালো, দেহটা আবার তেমনি মোটা। সে তার ছোট ছোট চোখ দুটোতে সুরমা দিয়ে, পায়ে হাতে মেহেদি পাতার রং লাগিয়ে, পাণ খেয়ে পুরু ঠোঁট দুখানা লাল ক'রে, একখানা ফিরোজা রংয়ে ছোপান কাপড় পরে যখন তার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতো—লোকে তার দিকে চেয়ে না হেসে থাকতে পারত না!

এক দিন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি,—সে আমার বাড়ীর সাম্‌নে কুয়ার কাছে জল নিতে এসে, আমার দিকে—চেয়ে একটু মুচকী হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্‌লে "ভাল আছ বাবুজী?"...তার এই বেয়াদবীতে আমার ভয়ানক রাগ হ'ল, আমি মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতর চলে এলাম। হরেন তখন বাসায় ছিল না; সে এলে তাকে বল্লাম, এ পাড়া ছেড়ে একটা ভদ্র পাড়ায় বাড়ী দেখ্। সে আমায় বোঝালে এত সস্তায় এমন বাড়ী আর মিলবে না! কাজেই সে বাসা ছাড়া হ'ল না।

এক দিন সকালে ঘরে বসে আমি পড়ছি, স্ত্রীলোকটা একেবারে আমার ঘরের ভিতরে এসে হাজির! আমি ত অবাক্!...কী সাহস তার। হাতের বইখানা ফেলে রেখে তার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লাম 'কেয়া মাঙ্গতা হিঁয়া?' স্ত্রীলোকটা একটুও লজ্জা না করে কাতরভাবে আমার দিকে চেয়ে ভাঙ্গা হিন্দি আরবী মেশানো ভাষায় বল্লে, 'বাবুজি, ম্যায়নো আপকো থোড়া কুছ তক্‌লিফ্ দেনে খাতির'—"

কি জানি কেন তার মুখের করুণ ভাব, চোখের কাতর দৃষ্টি দেখে আমার মনটা নরম হ'য়ে পড়লো!—জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি তোমার কথা?'

স্ত্রীলোকটা খুব মিনতি করে করুণ কণ্ঠে বল্লে, "আপনি যদি দয়া ক'রে একখানা চিঠি আমায় লিখে দেন্"...

কথাটা শোনা মাত্রই আমার বেজায় রাগ হ'ল।... কি আপদ্...চিঠি লেখাতে আর লোক পেলে না!—যাই হোক্, এখন তাকে যত শিগ্‌গির হয় বিদেয় করতে পারলে বাঁচি, এই ভেবে কাগজ কলম নিয়ে বল্লাম 'বল কাকে কি লিখ্‌তে হবে।'

সে বল্লে 'সেখ্ মনসুর খাঁকে...দিলদার নগরে!'

'কি লিখতে হবে বলে যাও।'

স্ত্রীলোকটা বল্‌তে লাগলো—"হো মেরা দিলকা রৌশন্, মেরা জান্—কলিজা—আমি তোমায় কত ভালবাসি! খোদা তোমায় সুস্থ রাখুন। কেমন ক'রে তুমি এতদিন তোমার ছোট্ট আমিনাকে ভুলে আছ... একটিবার এসে দেখা দাও—? ক্ষুদ্র বালিকা যে"—

আমার তখন বেজায় হাসি পেয়েছিল! ক্ষুদ্র বালিকাই বটে! দেহখানি অন্ততঃ ৬ ফুটের কম নয়, ওজনেও বোধ হয় সাড়ে তিন মণের বেশী হবে!—যাক্ কোন প্রকারে ত আমি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা মনসুর কে?...তার বয়স কত?'

'কাঁচ্চা বয়েস বাবুজী...আমার তরুণ বন্ধু সে।' স্ত্রীলোকটা অন্যদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেই আর কোন কথা ও-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় মনে করে আমি বল্লাম—'যাক্, এখন আর কি লিখ্‌তে হবে বল।' সে এমনি ধারা কত দুঃখ, আবেগ, অনুরোধের মধ্যে দিয়ে তার চিঠি শেষ করলে,—আমিও পরিত্রাণ পেলাম!

প্রায় ২।৩ সপ্তাহ পরে একদিন বিকেল বেলায়—হঠাৎ ঘরের দরজাটা খোলার শব্দে মুখ ফেরাতেই দেখি, সেই স্ত্রীলোকটা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না ক'রে একেবারে ঘরের মধ্যে! সে এসেই বল্লে— 'বাবুজী, আপনার বোধ হয় এখন কোন কাজ নেই?'

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লাম 'না—কেন?'

সে তেম্‌নি ভাঙ্গা গলায় মিনতির সুরে বল্লে 'যদি মেহেরবাণি ক'রে আর একখানা চিঠি লিখে দিতেন'...

—কি ব'লব তোমায় অমলা, আশ্চর্য্য এই কথা কয়টি বলবার ভঙ্গী! এই যে আমার এত রাগ, এত বিরক্তি, সব যেন তার আবেগভরা মিনতির কাছে হার মান্‌লো!... অস্বীকার করতে পারলাম না! বল্লাম 'কাকে...তোমার সেই বন্ধুটির কাছে ত?' সে ঘাড় দোলাইয়া হাসিয়া বলিল 'না বাবুজী!...এবারে সে—আমার বন্ধু মনসুর লিখছে!' শুনে ত আমি অবাক...এ বলে কি?... হেঁয়ালিপূর্ণ ব্যাপারটা ভাল বুঝতে না পেরে বল্লাম 'তার মানে?'

স্ত্রীলোকটা দুঃখিতভাবে বল্লে 'আমায় মাফ্ করুন্ বাবুজী, বড় বোকা আমি...সব কথা আপনাকে গুছিয়ে বল্‌তে পারছি না যে!...আচ্ছা মনে করুন এটা আমার বন্ধুর চিঠি!...আমারই মত তারও একজন "আমিনা" আছে—সে যেন তাকেই লিখ্‌ছে!'—অদ্ভুত ব্যাপার! সন্দেহে, বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইতেই দেখি, তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে!—কি জানি মনের ভিতর কেমন একটা কি হ'ল—আমি চেঁচিয়ে বল্লাম "তোমার 'আমিনা' বা 'মনসুর' ব'লে কোন লোক নিশ্চয়ই নাই...সব মিছে কথা....এই চিঠি লেখাবার ছুতো ক'রে তুমি ঘনিষ্টতা করতে এসেছ আমার সঙ্গে!...বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে এখুনি..."

স্ত্রীলোকটা হঠাৎ কেঁদে ফেল্লে!...আমার ত চক্ষু স্থির...এ আবার কি বিপদে পড়লাম!

কিছুক্ষণ পরে সে আমার খাটের কাছে সরে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে যোড়হাত ক'রে বল্লে, "আমায় মাফ্ কর বাবুজি, সত্যই 'মনসুর' ব'লে আমার কেউ নেই, কিন্তু 'আমিনা' আছে...আমিই 'আমি'!...নাই-বা থাক্‌লো 'মনসুর';...

তোমার একখানা চিঠি লিখে দিতে আর কতটুকুই বা সময় যাবে বাবুজী !...এই চিঠিখানা পেয়ে যদি আমার"... সে আর বল্‌তে পারল না, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো !··· আমি ত আড়ষ্ট !—বলবার কথা কিছুই খুঁজে পেলাম না !

স্ত্রীলোকটা তার চোখ মুছে বল্লে এতই যদি তোমার অবিশ্বাস, এই ফিরিয়ে নাও বাবুজী তোমার আগেকার লেখা চিঠি !—আমি অন্য কারুকে দিয়ে না হয় লেখাব... তোমার কাছে আসব না আর !'

সত্যই ত ! আমার লিখে দেওয়া সেই চিঠিখানাই ত বটে ! আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি কোন লোকই নেই, তবে এ চিঠি পাঠাবার কি উদ্দেশ্য তোমার ?' সে ঘাড় নীচু করে বল্‌তে লাগলো 'যদিও 'মনসুর' বলে কেউ নেই, কিন্তু থাক্‌তে ত পারতো ! আমি ভেবে নিয়েছি— সকলের মত আমার স্বামীও কোন দূর বিদেশে আছে... আমি তাকে চিঠি লিখি, সে তার উত্তর দেয় ! যে চিঠি তুমি "মনসুরের"—পক্ষ হয়ে 'আমিনা'র কাছে লিখে দেবে বাবুজী, সেই চিঠিখানা আমি ডাকে ফেলে দেব !...পিয়ন যখন এসে আমার দরজার কড়া নেড়ে ডেকে বলবে 'আমিনা বিবি...চিট্‌ঠি হ্যায়', আমার যে প্রাণে তখন কি আনন্দ হবে বাবুজী, তা যে তুমি ভাবতেও পার না ! এমনি ধারা লেখা চিঠিতে সোহাগ, আদর, অভিমানের কথাগুলো যখন লোকে আমায় পড়ে শোনায়, আমি যে তখন আমার কথাও ভুলে যাই ! শুন্‌তে শুন্‌তে আমার চোখ দুটো বুঁজে আসে, কলিজার ভিতরটা একটা ভয়ানক সুখের আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে ! বাবুজী, জগতে যার কেউ নেই, কেমন করে সে বেঁচে থাকে বল ত ? তাই আমি, আমার মনের সঙ্গেই খেলা করি, ভাব করি···আসনাই করি ! একটা মন-গড়া রূপ কল্পনা ক'রে নিয়ে, হৃদয়খানাকে সুখের অনুভূতিতে পূর্ণ ক'রে তোলে···তেমনি ! "মনসুর" না থাকুক···আমার মনটা ত আছে !!" স্ত্রীলোকটা তার আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো !

আমি ভয়ানক লজ্জিত হ'লাম ! একটা গভীর দুঃখে আমার মন ভ'রে গেল ! পাশের টেবিল থেকে কাগজ কলম নিয়ে বল্লাম 'আচ্ছা বল,...কি লিখতে চাও তুমি··· আমি লিখে দিচ্ছি !' * * * * তার চিঠি লেখা শেষ করলাম। সে অতি যত্নে চিঠিখানা তার বুকের কাছটায় লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল ! এর পর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাকে তার এমনিধারা উড়ো-চিঠি লিখে দিতে হ'ত !

মাস ছয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যাকালে সে এসে বল্লে, "বাবুজী, আর তোমায় বিরক্ত করতে আসব না আমি !... আমার এই শেষ চিঠিখানা লিখে দাও !"

কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে হেসে বল্লে, 'মুল্লুক চলে যাব !'...তার পর আমায় দিয়ে তার চিঠি লেখাতে লাগ্‌লো !...উঃ সে কি করুণ ! বল্লে, ওগো দয়িত আমার, একবার এস। মৃত্যু আমার দ্বারে এসে কতবার ফিরে গেছে, আমায় নিয়ে যেতে কতবার সেধেছে, কিন্তু তোমায় না দেখে যে এত দিন যেতে পারিনি। দেখবার আশা বুকে পুষে, কত দিন, কত মাস, কত বছর কেটে গেল, তুমি ত এলে না...দেখা দিলে না ! আর যে তাকে ফেরাতে পারি না !...সে আমায় কোন্ এক চির-উজ্জ্বল রূপালি দেশে নিয়ে যেতে চায় ! সেখানে না কি দুঃখ নাই, অভিমান নাই, বিরহ নাই, অশ্রু নাই···সুধুই মিলনের মহা-মেলা ! তুমি ত জান রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় ! এত বড় প্রলোভন ত্যাগ করবার শক্তি আমি যে হারিয়ে ফেলেছি···পার যদি, তুমি আমায় রক্ষা কর"—তার পর, সে তার পুরানো চিঠিগুলো আমার কাছে ফেলে দিয়ে বল্লে, 'এই নাও বাবুজী, তোমায় দিয়ে লেখানো সব চিঠি··· ওতে আর আমার কাজ নেই। তোমাকে কত বিরক্ত ক'রেছি...আমায় ক্ষমা করো !...খোদা তোমায় সুখে রাখুন···সেলাম বাবুজী ..চল্লাম !'

পরের দিন ভোর-বেলায়, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উঠে দেখি, রাস্তায় খুব গোলমাল হচ্ছে···সামনের বস্তির একটা খোলার বাড়ীতে কতকগুলো পুলিশ আর লোকের ভীড়।...কি ব্যাপার ?...জনতা ঠেলে দোর-বন্ধ-করা একখানা ঘরের সম্মুখে গিয়ে পাশের খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই প্রাণটা শিউরে উঠলো... দেখি, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে—"আমিনা" !!

···অমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল "হ্যাঁগা...সত্যি" ?

"গর্কীর" একটা গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

চিত্রশালা

কলিকাতা দৃশ্যাবলী

উদ্যানমালা

মেঃ টি. পি. সেন গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

শ্যামবাজার পার্ক একদিকের দৃশ্য

শ্যামবাজার পার্ক দ্বিতীয় দিকের দৃশ্য

শ্যামবাজার পার্ক তৃতীয় দিকের দৃশ্য

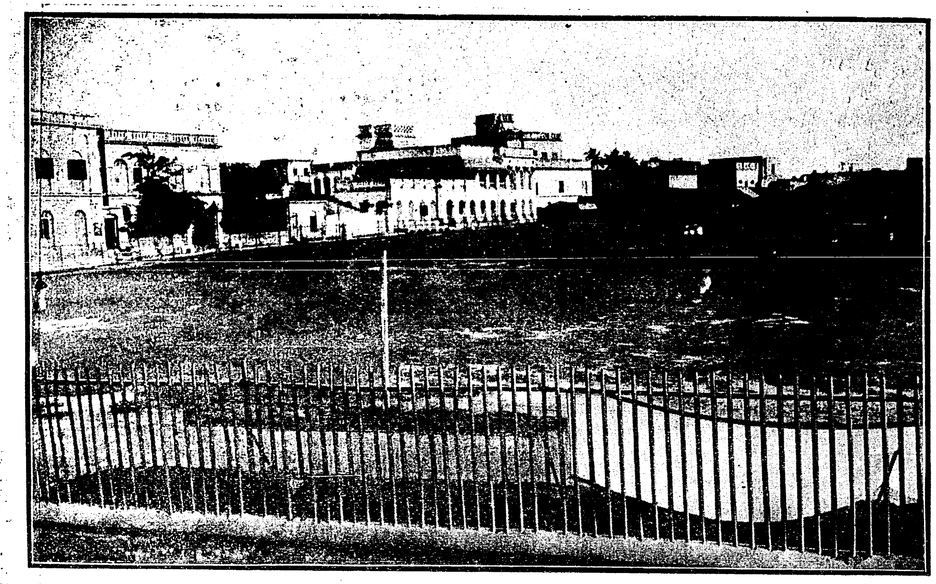

শ্যাম স্কোয়ার

বিডন স্কোয়ার

যোড়াপুকুর স্কোয়ার

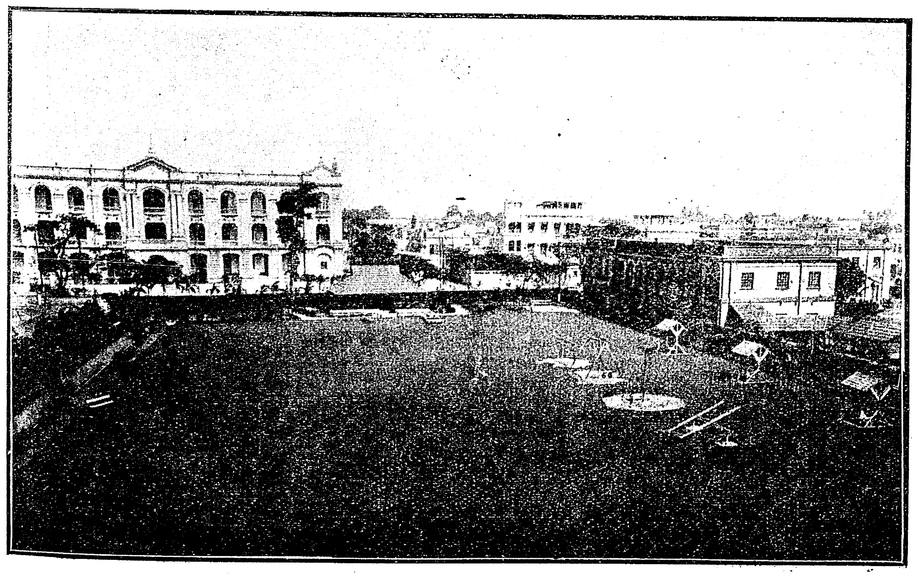

মহিলা পার্ক

বিদ্যাসাগর পার্ক
(রামকৃষ্ণ দাস তোলন)

মির্জ্জাপুর পার্ক

কলেজ স্কোয়ার

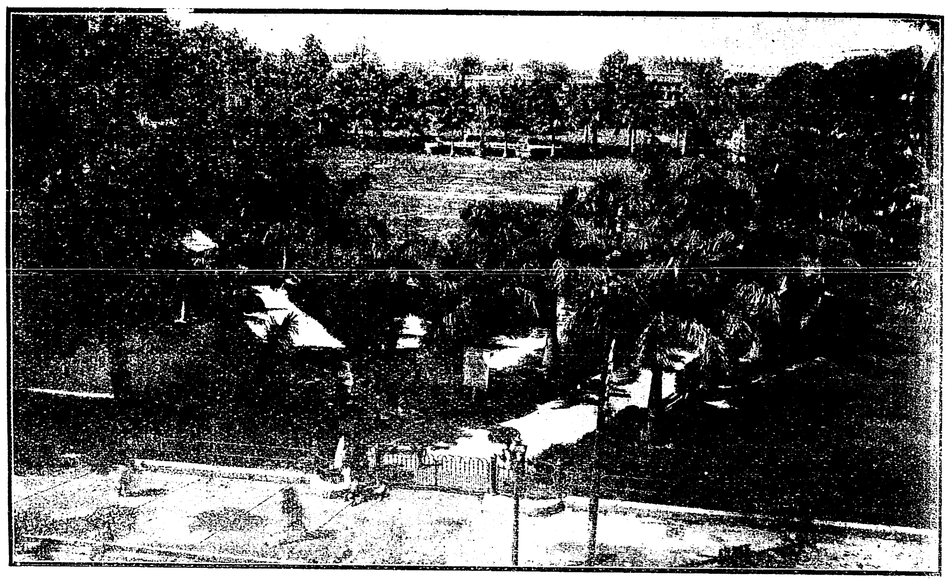

ওয়েলিংটন স্কোয়ার

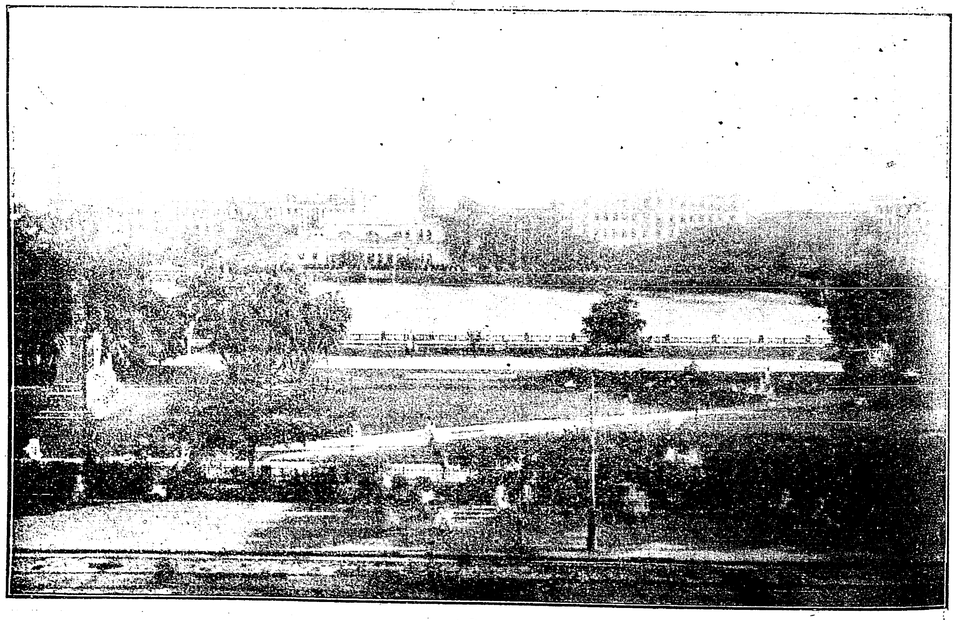

ডালহৌসী স্কোয়ার
(রাইটার্স বিল্ডিংয়ের উপর হইতে গৃহীত দৃশ্য)

রক্ত-কমল

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

(১)

কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের উপর সবচেয়ে ভাল ও বড় বাড়ীটা দখল করিয়া দুয়ারের সম্মুখে প্রস্তরফলকে নিজের নামের শেষে এম্-ডি যুক্ত করিয়া রাখিলেও জ্ঞানপ্রকাশকে কেহই বড় একটা রোগী দেখিবার জন্য বাহিরে যাইতে দেখে নাই। লোকটাও এমন অদ্ভুত যে, কাশীর মত বাঙালীবহুল স্থানে থাকিয়াও সে বাড়ীর বাহির হয় না—লোকের সঙ্গে দেখাশুনা বা মেলামেশা তো দূরের কথা। লোকে ভাবিল, লোকটি কাশীতে নূতন আসিয়াছে, তাই হয়ত ভাবিয়াছে সকলের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিলে কেহই টাকা দিবে না, সকলেই হয়ত বন্ধুত্বের দাবী করিয়া বসিবে। কিছুদিন এখানে থাকিলেই বুঝিবে, চিকিৎসা করিয়া এখানে ভিজিটের আশা নাই বলিলেই হয়। যেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় সিভিল সার্জ্জন পেন্‌সন্ লইয়া শিবপ্রাপ্তির লোভে শিবলোকের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে, সেখানে ডাক্তারের ও মেজাজ খাটে না।

কিন্তু পুরা একটি বৎসর কাটিয়া গেলেও লোকে তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখিল না। পূর্ব্বের মত সেই সর্ব্বক্ষণ বাড়ীতে থাকা আর রাত্রি ৯।১০টার পর গান। আর সে কি গান! তাহার যেন কোন শ্রান্তি নাই—সর্ব্বক্ষণই স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। কোন রাত্রে গান নহে সুধু বাঁশী—সে বাঁশী সারারাত্রি যেন সমস্ত কাশী ভরিয়া বাজিতে থাকে। এক এক রাত্রে বাঁশী বা গান নহে—বাজে সুধু বেহালা। যাহারা বোঝে তাহারা বলে লোকটির যেমন 'গলা', তেমনি হাত।

এই সুন্দর 'গলা' ও হাতওয়ালা লোকটিকে বাড়ীর বাহিরে লোকে দৈবাৎ দেখিতে পাইত। মাসের মধ্যে এক আধ দিন এমন কোন নাছোড়বান্দা ব্যক্তি যদি আসিত যাহার এই ডাক্তারটিকে নহিলে চলিবে না, তাহা হইলে সে অগত্যা বাহির হইত। কিন্তু তাহার ভৃত্য আগে গিয়া একখানা গাড়ী করিয়া আনিত। সেই গাড়ীতে আহ্বানকারী লোকটি, ডাক্তার নিজে ও একটি দুগ্ধফেন-শুভ্র-লোমবহুল ক্ষুদ্রাকৃতি কুকুর উঠিত।

এই ভৃত্যের নিকট হইতেও বাবুর সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় ছিল না। কারণ, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিত, 'বাবু জানেন'; এবং বাবু যে কি জানেন, তাহা বাবু ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তির জানিবার সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল না।

এই অদ্ভুত লোকটির সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ছাদের উপর উঠিয়া, দুয়ারের ফাঁক দিয়া, বাজারে, ঘাটে, যেখানে দেখা হইয়াছে, চাকরটাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া লোকে এইটুকু জানিতে পারিয়াছে যে, বাড়ীতে নারীজাতির কোন সম্পর্ক নাই; চাকর, মনিব, একটি কুকুর ও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এই লইয়া ডাক্তারটির সংসার। বিবাহ করিয়াছে কি করে নাই, করিবে কি করিবে না—এ কয়টার একটা খবরও কেহ পাইত না।

শেষটা প্রতিবেশীরা জ্ঞানবৃদ্ধি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া একযোগে হাল ছাড়িয়া দিল।

(২)

সকাল হইতে ইতস্ততঃ করিয়া দুপুরে চন্দ্রিকা ডাকিল—"বাবু!" আহারাদি শেষ হইলে জ্ঞানপ্রকাশ একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল— "কি রে?"

চন্দ্রিকা একটু অবনতমুখে বলিল—"আমি তা হলে যাব?"

"হ্যাঁ যাবি বৈ কি; তোর মেয়ের বিয়ে—তুই না গেলে কি করে চল্‌বে? কোন্ ট্রেণে যাবি?"

"বিয়ের এখনও এক হপ্তা দেরী আছে। কবে যাব ঠিক করিনি। একজন লোক থাক্‌বে বলেছে; আজ্‌কে তার আস্‌বার কথা। তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে তবে তো যাব।"

"আবার লোকের হাঙ্গামা কেন করতে গেলি? এ কটা দিন কুকারেই চালিয়ে নিতাম। কলের জল আছে আর ভাবনা কি?"

ভাবনা যে কি তা চন্দ্রিকা খুব জানিত, যাহার জন্য সে বাড়ী হইতে উপরি-উপরি পাঁচছয়খানা চিঠি আসা সত্ত্বেও যাইতে পারে নাই। বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল—বাবুকে একা রাখিয়া যাইবার উপায় নাই। একটা বিশ্বাসী লোক ঠিক করিয়া দিয়া তবে সে যাইতে পারিবে—তা সে যতই দেরী হউক্ না।

চন্দ্রিকা সিং সে সব কথা না বলিয়া শুধু জানাইল "একটা লোক না হলে যে কষ্ট হবে;—অন্ততঃ চা কি জলখাবারটা করে দেবারও তো একটা লোকের দরকার।"

"তা এ ক'টা দিন আমিই একরকম করে চালিয়ে নিতাম।" বলিয়া জ্ঞানপ্রকাশ একখানি ছোট রেকাবি হইতে মোটা করিয়া কাটা একখণ্ড সুপারি লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল।

একটু পরেই জ্ঞানপ্রকাশ আবার বলিল—"হ্যাঁরে চন্দ্রিকা, তোর মেয়ের বিয়েতে কত খরচ হবে?"

"শ'তিনেক টাকায় হয়ে যাবে।"

"তিনশ টাকায় কি করে হবে রে?"

"তা কেন হবে না বাবু? বরযাত্রদের খাওয়াতে শ'খানেক, গহনা শ'খানেক, আর এদিক-ওদিকের খরচ বাকি টাকাটায় হয়ে যাবে।"

"গহনা শ-খানেকে কখন হয় পাগল!"

"তা কেন হবে না বলুন! গায়ে রূপার গহনা, পায়ে কাঁসার জিনিস। আপনাদের মতন তো আর সোণায় মুড়িয়ে দিতে হবে না!"

"তা তুই তো আমাকে কিছুই বল্লিনে—কোন খরচ চাইলিনে?"

"গেল বারেই তো আপনি তিনশো টাকা দিইছিলেন। তার মা মারা গেল তাই না বিয়েটা হোল না। সেই টাকাই তো আছে।"

"সব টাকা কি করে থাক্‌বে চন্দ্রিকা! শ্রাদ্ধে তো তোকে খরচ কর্ত্তে হইছিল।"

"শ্রাদ্ধের জন্য যে আপনি আলাদা একশো টাকা দিইছিলেন মনে নেই? বিয়ের টাকা আমি পোষ্টাফিসের খাতায় জমা রেখেছিলাম—পাছে খরচ হয়ে যায় ভেবে। সেদিন দোয়ারকাকে পাঠিয়ে দিলাম সব কেনাকাটা করতে।"

"দোয়ারকা তোর ছোট ভাই,—নয়?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"হ্যাঁ ভাল কথা, আমার মণিব্যাগটা একবার নিয়ে আয় তো।"

"এখন টাকা কি হবে?"

"নিয়ে আয় না, কত আছে দেখি;—যা ওঠ্।"

চন্দ্রিকা অনিচ্ছায় উঠিয়া বাক্স হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া আনিল। টাকাকড়ি চাবি সব চন্দ্রিকার জিম্মাতেই থাকিত।

"হ্যাঁরে তুই যে কতকগুলো গিনি করে রেখেছিলি, সেগুলো কোথায় গেল?"

"সে তো ব্যাগে থাকে না—সেই রূপার কৌটাতে আছে।"

"তা সেটাও নিয়ে আয়, একবার দেখি।"

চন্দ্রিকা পুনরায় উঠিয়া কৌটা আনিয়া দিল।

কৌটা খুলিয়া কয়েকটি গিনি তুলিতে তুলিতে জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—"চন্দ্রিকা, তোদের দেশে গিনির মালার ভারি আদর, নয়?"

চন্দ্রিকা ব্যাপারটা অনুমান করিয়া চক্ষুর্দ্বয় কপালে তুলিয়া বলিল—"কি জানি বাবু, সে সব আমীর লোকদের কাছে হতে পারে। আমাদের মত লোক গিনি টিনি ভালবাসে না।"

জ্ঞানপ্রকাশ সে কথা কাণে না তুলিয়া কতকগুলি গিনি লইয়া বলিল—"চন্দ্রিকা, তোর মেয়েকে এই কটা গিনি গাঁথিয়ে দিবি; বুঝলি?"

চন্দ্রিকা বাবুকে জানিত। তথাপি একবার আপত্তি করিবার চেষ্টা করিল। বলিল—"যা দরকার সব তো হয়ে গেছে, বাবু। এখন উপায় নেই, অত খরচ কল্লে চল্‌বে কেন? আর আমাদের মধ্যে ও-সব গহনার চলন নেই।"

"তুই বেশী কত্তাত্ব করিস্‌নে বাপু। আমি তোর মেয়েকে এই গহনাটা দিচ্ছি। আমি তো তোদের মত রূপোর হাঁসুলি দিতে পারিনে—সেটা তো জানিস্?"

চন্দ্রিকা বাবুর হাত হইতে গিনি লইয়া গণিয়া দেখিল বারোটা গিনি। ভয়ে ভয়ে বলিল—"একেবারে বারোটা যে বাবু।"

"তুই তা হলে গুণ্‌তে শিখেছিস্ এতদিনে"—বলিয়া হাসিতে-হাসিতে জ্ঞানপ্রকাশ বইখানা হাতে তুলিয়া লইল।

চন্দ্রিকা নিরুত্তর হইয়া গেল।

একটু পরে বই হইতে মুখ তুলিয়া ব্যাগ হইতে দুইখানা ১০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"দেখ্ চন্দ্রিকা, যাবার দিন কাশী থেকে কিছু ফল আর আমাদের বাঙ্গলা দেশের কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবি। সন্দেশ রসগোল্লা নিবি—বুঝলি? তুই যে বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিস্, তার একটা চিহ্ন থাকা দরকার তো?"

আপত্তি করা নিরর্থক জানিয়া হাত বাড়াইয়া চন্দ্রিকা নোট দুখানাও লইল। তার পর মণিব্যাগ ও কৌটা তুলিয়া রাখিতে গেল। কিন্তু চোখ দুটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

অপরাহ্নে চন্দ্রিকা সিংয়ের ঠিক-করা লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞানপ্রকাশ তাহার পানে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিছু বলিল না। চন্দ্রিকা তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কি করিতে হইবে, বাবুর দিকে কি ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সব মোটামুটি একরকম বুঝাইয়া দিল ও সকালে আসিতে বলিল,—একটা দিন সে কি ভাবে কাজ করে তাহা একবার দেখিয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়।

অপরাহ্নে চন্দ্রিকা প্রভুকে চা আনিয়া দিল। হাতের বই খানা রাখিয়া জ্ঞানপ্রকাশ ধীরে ধীরে চা পান করিয়া আবার পড়ায় মনোনিবেশ করিল।

একটু পরেই ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া চন্দ্রিকা জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু খাবার দেব বাবু?"

জ্ঞানপ্রকাশ ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—'না'।

চন্দ্রিকা আর একবার বলিল—"পরশু খুব ভাল সন্দেশ রেখেছিলাম; আজও যদি না খান্ তো সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

"সন্দেশ কি কর্‌তে আনিস্ চন্দ্রিকা—ও আর ভাল লাগে না"—একটু অপ্রসন্নমুখে জ্ঞানপ্রকাশ বলিল।

একটা কথা মনে পড়ায় চন্দ্রিকা লজ্জিত হইল। তবু সে শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"রাত্রে তো অর্দ্ধেক দিন খাবার পড়েই থাকে; সন্ধ্যার সময়ও যদি কিছু না খান, শরীর টিঁকবে কি করে? অন্য খাবার কিছু আন্‌ব?"

চন্দ্রিকার কথার সুরে এমন একটা মিনতি ছিল, যাহাতে জ্ঞানপ্রকাশ চোখ তুলিয়া একবার চাহিল। তার পর বলিল—"আচ্ছা, যা ঘরে আছে তাই নিয়ে আয়।"

চন্দ্রিকা খুসী হইয়া একখানি রেকাবিতে সন্দেশ আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। জ্ঞানপ্রকাশ তাহা হইতে একটি সন্দেশ তুলিয়া লইয়া ডাকিল—'কিটি'।

কিটি চেয়ারখানার তলাতেই হাত পা গুটাইয়া বেশ আরামে শুইয়া ছিল। প্রভুর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া চার খানা পা একটু একটু প্রসারিত করিয়া একবার আলস্য ভাঙ্গিয়া ও একটা মৃদু শব্দ করিয়া প্রভুর পানে চাহিল—যেন উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

জ্ঞানপ্রকাশ কিটির পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—'কিটি, তুমি ক্রমশঃ বড় কুড়ে হয়ে যাচ্ছ। আমার চেয়ে;—বুঝেছ? কেবল খাওয়া আর ঘুম। একটু আধটু কাজ-কর্ম্ম কর; একেবারে বাবু হ'য়ে যেও না।'

কিটি যেন কথায় সায় দিয়া প্রভুর পায়ের কাছে আর একটু ঘেঁসিয়া বসিল।

পাত্র হইতে দুইটি সন্দেশ লইয়া কিটির কাছে ফেলিয়া দিয়া জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"নে, খাবার খা। চন্দ্রিকা সিং বল্‌ছে সন্দেশ না খেলে রোগা হয়ে যাবি।"

সন্দেশ দুটি সুধু এক একবার শুঁকিয়া কিটি প্রভুর পানে চাহিল।

জ্ঞানপ্রকাশ একটি সন্দেশ ডান হাতে তুলিয়া তাহাতে একটা কামড় দিয়া বলিল—"এই দেখ আমি খেয়েছি; তুই খা।"

কিটি তখনও প্রভুর পানে চাহিয়া রহিল।

অবশিষ্ট সন্দেশটুকু মুখে ফেলিয়া দিয়া—জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—'এই দেখ্ এবার খেয়ে ফেলেছি।' তার পর জলের গ্লাস লইয়া জল পান করিল।

কিটি তখন আনন্দে জলযোগ আরম্ভ করিল। এদিকে জ্ঞানপ্রকাশও অন্য দিনের মত গাইতে বসিল।

রাত্রি ১২ টার সময় জ্ঞানপ্রকাশ গান বন্ধ করিয়া ডাকিল—"চন্দ্রিকা!"

চন্দ্রিকা চোখ রগ্‌ড়াইয়া সম্মুখে আসিল। "আর এক পেয়ালা চা দিতে পারিস্ চন্দ্রিকা?"

চন্দ্রিকা ফিরিয়া গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া—জল চড়াইয়া দিল।

জ্ঞানপ্রকাশ আবার গান গাহিয়া যাইতে লাগিল।

চা তৈয়ার হইয়া গেলে রাখিতে আসিয়া চন্দ্রিকা দেখিল—বাবু গান গাহিতেছেন আর তাঁহার চক্ষু বার বার সজল হইয়া আসিতেছে। কয়েক ফোঁটা জলও চোখের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

চন্দ্রিকা কিছু না বলিয়া সুধু প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

গান শেষ হইলে জ্ঞানপ্রকাশ চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া কি ভাবিতে লাগিল। চোখের জল মুছিতেও মনে রহিল না। একটু পরে বলিল—"চন্দ্রিকা, গান আজ বড্ড ভাল লাগ্‌ছে।" সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

(৩)

জ্ঞানপ্রকাশ জমীদারের ছেলে; অল্প বয়সেই পিতৃ-মাতৃ-হীন হয়। বিশ্বাসী দেওয়ান শিবনাথের হাতে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে; বিষয়ের ভার তো আগে হইতেই ছিল।

বি-এ পাশ করিয়া জ্ঞানপ্রকাশ ডাক্তারি পড়িতে চাহিল। শিবনাথ একবার বলিলেন—"ও পথে তো আবার পাঁচ-ছ বৎসর লাগিবে; তার চেয়ে বিষয় আশয় দেখিলে হইত না?"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"আমি দেখিলে বিষয় আশয় এমন আর কি বাড়িয়া যাইবে?" শিবনাথ বলিলেন—"তবু তো সব শেখা ও জানা দরকার।"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"শেখা? তা সে ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিলেও আপনি শিখাইয়া দিতে পারিবেন। যত দিন আপনি আছেন, তত দিন আমাকে একটু পড়া-শুনা করিতে দিন্। বাবা মা কেউ তো নেই;—আপনিই সব। আপনি যদি এমন বলেন—"

বৃদ্ধ শিবনাথ সজল-নয়নে বলিলেন—"না বাবা, আমি এ কথা আর বল্‌ব না। আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমার যত দিন ইচ্ছা লেখাপড়া কর।"

জ্ঞানপ্রকাশ ডাক্তারি পড়িয়া পাশ করিল। তার পর স্থির করিল আইনটাও পড়িয়া লইবে এবং শিবনাথের সম্মতি লইয়া ল-কলেজে নাম লিখাইল।

এই সময়ে অজয়ের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব হয়। অজয়ের বাড়াতেও সে যাইত। অজয়ের পিতা ব্যারিষ্টার সঞ্জয় সেন মিঃ এস্, সেন নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ব্যারিষ্টারির প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ। জ্ঞানপ্রকাশকে তিনি বেশ পছন্দ করিয়াছিলেন। ছেলেটি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ও তদুপরি ধনবান্ বলিয়া সেন-জায়ার তাহাকে আরও ভাল লাগিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে তাঁহাদের একমাত্র কন্যা বিজয়ার স্বামী-নির্ব্বাচনে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। ইহার একটা ইতিহাস ছিল।

মিঃ সেনের একটি পণ ছিল যে, ব্যারিষ্টার ছাড়া তিনি আর কাহাকেও জামাতা করিবেন না। তাঁহার মত, যেমন পশুর রাজা সিংহ, তেমনি মানুষের রাজা ব্যারিষ্টার—যাহার ভ্রূভঙ্গে ও দর্পে চিফ্ জাষ্টিস্ পর্য্যন্ত কাহিল হইয়া পড়েন। কিন্তু এই রকম সৎপাত্র বাজারে তৈয়ারি মিলে না, তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য মিঃ সেন অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। অজয়ের বন্ধুদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত ছেলেদের তিনি সমাদর করিতেন ও বাড়ীতে আহ্বান করিয়া বাড়ীর মেয়েদের সহিত পরিচিত করাইয়াও দিতেন। যে কয়েকটি যুবক তাঁহাদের বাড়ী যাতায়াত করিত, তাহাদের মধ্যে কুমুদনাথ নামক একটি যুবকের প্রতি বিজয়া অনুরক্তা হয়। বিজয়া তখন স্কুল ছাড়িয়া সবে কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। কুমুদনাথ দুইবার বি-এ ফেল করিয়াও কলেজ ছাড়ে নাই। কুমুদের দৈহিক সৌন্দর্য্য, তাহার কথাবার্ত্তা কহিবার অদ্ভুত ক্ষমতা, সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাহার অসীম সাহস বিজয়াকে নিরতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। মিঃ সেন ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত বিজয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল যে মিঃ সেনের খরচেই কুমুদ বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে এবং আসিয়াই বিজয়াকে বিবাহ করিবে। বি-এ পাশের জন্য আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া কুমুদ যথাসময়ে বিজয়াকে কাঁদাইয়া বিলাত যাত্রা করিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ মিঃ সেন কুমুদকে পাঠাইতেন। পূর্ব্বে কথা ছিল, পরীক্ষা দিয়াই কুমুদ চলিয়া আসিবে। পরীক্ষার পরই সে জানাইল, বিলাত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সে একবার সমগ্র য়ুরোপটা ঘুরিয়া আসিবে। মিঃ সেন আপত্তি করিলেন না। মনকে বুঝাইলেন যে, ইহাতে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে।

কিন্তু য়ুরোপ-ভ্রমণে একটু বেশী দিন লাগিয়া গেল। পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলে জানা গেল কুমুদ পাশ করিয়াছে। অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রামাদি পাঠানো হইল। আসিবার খরচ চলিয়া গেল; কিন্তু কুমুদ ফিরিল না, অথচ না আসিবার কারণও জানাইল না। মিঃ সেন উদ্বিগ্ন হইয়া, বিলাতে তাঁহার যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের কাছে কুমুদের সংবাদের জন্য লিখিলেন।

সংবাদ আসিল অতি নিদারুণ। মাস ছয়েক হইল সে সেখানেই এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়াছে এবং বিলাতেই থাকিবার সংকল্প করিয়াছে। তখন মিঃ সেন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি কুমুদকে সত্য-সত্যই ভালবাসিতেন। তাহার এই ব্যবহারে তাঁহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। বিজয়ার মুখের পানে তিনি চাহিতে পারিতেন না। কি করিয়া আবার সবদিক বজায় হইবে, তিনি সতত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

বিজয়া অতি সুন্দরী। এই আঘাত তাহার তীব্র সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বোজ্জ্বল মূর্ত্তি স্নিগ্ধ ও শান্ত করিয়া আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল।

জ্ঞানপ্রকাশ ডাক্তারি পড়া শেষ করিয়াও আইন পড়িতেছে জানিয়া, মিঃ সেন তাহাকে এক দিন কথায় কথায় বলিলেন, সে কেন বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারিটা পড়িয়া আসে না? উকিল আর ব্যারিষ্টারে অনেক তফাৎ, যেমন বাংলাদেশের জরাজীর্ণ ছাগাকৃতি গাভী আর ভাওয়লপুরের প্রসিদ্ধ গাভীতে ব্যবধান।

জ্ঞানপ্রকাশ তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। কেবল বলিল—"জ্যেঠা মহাশয়ের একবার মত লইতে হইবে।" শিবনাথকে জ্ঞানপ্রকাশ জ্যাঠা মহাশয় বলিত।

জ্ঞানপ্রকাশকে ব্যারিষ্টারি পড়িতে ইচ্ছুক জানিয়া তিনি তখন নিজের সংকল্প প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়ার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। জ্ঞানপ্রকাশ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে সাগ্রহে সম্মত হইল; এবং ভরসাও দিল যে জ্যাঠা মহাশয়ের মত লওয়া কঠিন হইবে না। মিঃ সেন বলিলেন, তাহাকে বিবাহ শেষ করিয়া তবে বিলাত যাত্রা করিতে হইবে।

বিজয়াকে লাভ করিবার পর ইংল্যাণ্ড হইতে শতগুণ দূরে যাইতেও জ্ঞানপ্রকাশের আপত্তি ছিল না।

একটা ভাবনার বিষয় ছিল—বিজয়া পাছে কোন গোলমাল করিয়া বসে। কুমুদকে সে যে তখনও ভুলিতে পারে নাই মিঃ সেন তাহা জানিতেন। মেয়ে বড় হইয়াছে—বিশেষতঃ সেই ব্যাপারের পর মেয়ের মতটা একবার লওয়া দরকার। মত জানিবার ভার পড়িল অনসূয়ার উপর। অনসূয়া মিঃ সেনের দূর-সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বৎসরের মধ্যে ছয় মাসের উপর অনসূয়া তাহার বিধবা মাতার সহিত এখানে থাকিত। তাহা ছাড়া মিঃ সেনের যখনি কোন আত্মীয়ার প্রয়োজন হইত, তখনি তাহাদের আনাইতেন।

অনসূয়া বিজয়ার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট—অতি শান্ত ও মধুর প্রকৃতি; চন্দ্রমা-শোভিত গগনের এককোণে নীল স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারাটির মত ফুটিয়া থাকিত। মিঃ সেনের কথামত অনসূয়া বিজয়ার কাছে কথাটা উত্থাপন করিল; জানাইল যে, জ্যাঠামহাশয় এই বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পরদিন বিবর্ণ মুখে অনসূয়া মিঃ সেনকে জানাইল যে, খুব আগ্রহ না জানাইলেও বিজয়া কোন আপত্তি করে নাই ও করিবে না। শুনিয়া মিঃ সেনের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই দিন হইতেই অনসূয়ার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

জ্ঞানপ্রকাশ তখন শিবনাথকে নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিল ও তাঁহার অনুমতি চাহিল। তাঁহাকে অনুরোধ করিল, তিনি যেন নিজে আসিয়া বিজয়াকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান্।

জ্ঞানপ্রকাশের পিতা স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই পরিবারে জ্ঞানপ্রকাশের বিবাহে শিবনাথের কোন আপত্তি রহিল না। তিনি নিজে হিন্দু হইলেও ইহাতে আনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরেই অনসূয়া মায়ের সঙ্গে দেশে যাইতে চাহিল। জ্ঞানপ্রকাশ তাহাতে বাধা দিল। অনাসূয়াকে সত্যই সে স্নেহচক্ষে দেখিত; বলিল—"আমি বিলাত চলিয়া যাই, তখন যাইও।"

যথাসময়ে জ্ঞানপ্রকাশের বিলাতযাত্রার দিন আসিল। বিজয়ার নিকট বিদায় লইয়া জ্ঞানপ্রকাশ যখন অনসূয়াকে খুঁজিল, তখন তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

জ্ঞানপ্রকাশের বিলাত যাইবার মাসখানেক পরে মিঃ সেন কুমুদের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। এক ইংরাজতনয়া তাহার সামান্য একটু দুর্ব্বলতার জন্য ভয় দেখাইয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছিল, এবং সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সে ইহারি জন্য মহা বিপদে পড়িয়াছে। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, সে অপরের বিবাহিতা স্ত্রী; পূর্ব্ব বিবাহের কথা গোপন করিয়া এবং সেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না করিয়াই সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব স্বামী এখন তাহার নামে নানা অভিযোগ আনিয়াছে। এখন হাজার কয়েক টাকা নহিলে তাহার আর পরিত্রাণ নাই—জেল অনিবার্য্য। পরিশেষে সে ক্ষমা চাহিয়াছে এবং ইহাও জানাইয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সে বিজয়াকে লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবে।

মিঃ সেন সত্যই কুমুদকে স্নেহ করিতেন। তিনি প্রার্থিত অর্থ তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং বিজয়ার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথাও জানাইলেন।

ইহার মাস তিনেক পরে কুমুদ হঠাৎ এক দিন মিঃ সেনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদ একজন অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা। সে আসিয়াই এমন দুঃখ ও অনুতাপের ভান করিল যে, সকলেরই হৃদয় তাহার প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বিজয়া তো কাঁদিয়াই ফেলিল।

লজ্জা জিনিসটা কুমুদের কোন কালেই ছিল না। সে মিঃ সেনের বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতে লাগিল। কুমুদের কথা কহিবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তাহা সে এই সময়ে খুব কাজে লাগাইল। ধীরে ধীরে সকলে তাহার ভীষণ অপরাধের কথা ভুলিয়া গেল। বিজয়ার এখনও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল যে, জ্ঞানপ্রকাশ মাঝখানে আসিয়া না পড়িলে, আগে যেমনটি ছিল, আজ আবার তেমনই হইত।

জ্ঞানপ্রকাশ যখন পাশ করিয়া ফিরিল, কুমুদ তখন ভাঙ্গা আসর রীতিমত জমাইয়া বসিয়াছে। সে এসব কথা কিছুই অবগত ছিল না, তাই কুমুদকে ইহাদের একজন বিশেষ আত্মীয় বলিয়াই গ্রহণ করিল। জ্ঞানপ্রকাশ যখন বিজয়াকে লইয়া পৃথক্ বাসা করিল, তখনও কুমুদ যাতায়াত করিতে লাগিল। কুমুদ নাম মাত্র কোর্টে যাইত। জ্ঞানপ্রকাশ যখন কোর্টে কেস্ লইয়া ব্যস্ত থাকিত, কুমুদ তখন বিজয়ার কাছে আসিয়া অনুতাপ জানাইয়া ও কল্পিত দুঃখ ও মনোভঙ্গের কাহিনী কহিয়া বিজয়ার চিত্ত বিগলিত করিত। জ্ঞানপ্রকাশের বিশ্বস্ত ভৃত্য চন্দ্রিকা সিংহের কিন্তু কুমুদের এ ভাবে ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগিত না; কিন্তু সে ভৃত্য, কোন কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইত না।

কয়েক দিন পরেই এক দিন কুমুদ বিজয়াকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। কথাটা সেই দিনই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মিঃ সেন সেই রাত্রিতেই নিতান্ত অপরাধীর মত জ্ঞানপ্রকাশের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পূর্ব্ব-কথা যাহা এতদিন গোপন রাখিয়াছিলেন, সব জ্ঞানপ্রকাশের কাছে বলিলেন। জ্ঞানপ্রকাশ কাহাকেও দোষ দিল না। শুধু বলিল—"তাহাদের মঙ্গলের জন্যই আমি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইব। ইহাতে তাহাদের বিবাহে কোন বাধা থাকিবে না।"

জ্ঞানপ্রকাশ ইহার পর অতি অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইয়া, ব্যারিষ্টারির পসার ছাড়িয়া কলিকাতা ত্যাগ করিল। কেবল চন্দ্রিকা কিছুতেই প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। জ্ঞানপ্রকাশ যাইবার সময় শিবনাথকে জানাইল যে, দেশবিদেশ ঘুরিয়া বৎসর দুই তিন পরে সে ফিরিবে। দরকার হইলে সে অর্থের জন্য পত্র লিখিবে। যদি সে পাঁচ বৎসরের মধ্যেও না ফেরে, তাহা হইলে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি শিবনাথের পুত্রের হইবে—কারণ শিবনাথের পুত্র তাহার আসল ভাইয়েরই মত।

তার পর বৎসর খানেক চন্দ্রিকাকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া জ্ঞানপ্রকাশ কাশীতে আসে। চন্দ্রিকার অনুরোধে সে কাশীতে কিছু দিন থাকা স্থির করিয়াছিল। এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে যাইবার উৎসাহও তাহার আর ছিল না। চন্দ্রিকা অনুরোধ করিয়া বাসার দুয়ারের পাশে প্রস্তর-ফলকে প্রভুর নামের সঙ্গে ডাক্তারির খেতাবটা অঙ্কিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, যাহার ফলে মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-একটী রোগী দেখিবার জন্য বাহিরে যাইতে হইত।

(৪)

হরিশ্চন্দ্র ঘাট হইতে স্নান করিয়া এক যুবতী ফিরিতেছিল। বেলা তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে; সেদিন সূর্য্যগ্রহণ; তাই মুক্তির স্নান করিতে অত বেলায় সে ঘাটে আসিয়াছিল। মাথা নীচু করিয়া যুবতী হন্ হন্ করিয়া আসিতেছিল, এমন সময় গানের কয়েক ছত্র তাহার কাণে আসিল:—

"দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
দুখ হবে মোর কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে!"

যে বাড়ী হইতে গানের শব্দ আসিতেছিল—যুবতী মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে চাহিল। এ কণ্ঠ তাহার অতি পরিচিত। ঠিক রাস্তার উপরেই বাড়ী। একটু পাশে আসিয়া প্রস্তরফলকে গৃহস্বামীর নাম পড়িয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রথমেই যে ঘর, তাহার দুয়ার খোলা ছিল। সুরের আহ্বানে সে মুক্ত দ্বার দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বামদিকের কক্ষে জ্ঞানপ্রকাশ অরগ্যান সহযোগে গান গাহিতেছে, আর তাহার পায়ের কাছে বসিয়া একটি কুকুর তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সেই ঘর হইতে জ্ঞানপ্রকাশের মুখের একাংশ মাত্র দেখা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র যুবতী তাহার শব্দায়মান বক্ষঃ দুই হাতে ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। লোকচক্ষু হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য রাস্তার দিকের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জ্ঞানপ্রকাশ গাহিয়া যাইতে লাগিল:—

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া
তুমি তো আমার রহিবে।
বহিবারে যদি না পারি এ ভার,
তুমি তো বন্ধু বহিবে!
কলুষ আমার, দীনতা আমার,
তোমারে আঘাত করে শত বার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে
তুমি তো বন্ধু সহিবে!
যাক্ ছিঁড়ে যাক্ মোর ফুল-মালা,
থাক্ পড়ে থাক্ ভরা ফুল-ডালা।
হবে না বিফল মোর ফুল তোলা
তুমি তো চরণে লইবে!
দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
দুখ হবে মোর কণ্ঠের হার।
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে।

যুবতী দেখিল জ্ঞানপ্রকাশের চক্ষে কতবার অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, কতবার ঝরিয়া পড়িল। গান শেষ হইলে সে কিছুক্ষণ অরগ্যানের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে মাথা তুলিয়া চোখ মুছিয়া ডাকিল—কিটি!

কুকুরটি একেবারে গা ঘেঁসিয়া কোলের উপর মাথা রাখিল।

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"কিটি, আজ একাদশী, কিছু খেতে নেই, বুঝ্‌লি?"

কিটির লেজ কাটা, তাই লেজ নাড়িতে না পারিয়া মাথাটি প্রভুর কোলের উপর একবার বুলাইয়া লইল।

"কিটি, আর দুটো দিন বাদেই চন্দ্রিকা আস্‌বে—এ দুটো দিন আর উপোস্ করতে পার্‌বিনে?"

কিটি মুখ তুলিয়া মাঝারি গোছের একটা শব্দ করিয়া আবার মুখ নামাইল; যেন বলিল—"তুমি যদি উপোস্ কর, আমিই বা পারিব না কেন?"

"কিটি আর একটা গান শুন্‌বি?"

কিটি তাহার আপন ভাষায় কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা শব্দ শুনিয়া সম্মুখের ঘরের দিকে চাহিল ও পরক্ষণে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য চক্ষু ফিরাইয়া জ্ঞানপ্রকাশ দেখিল, অনসূয়া তাহার দিকে সজলচক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর কিটি আনন্দে তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

জ্ঞানপ্রকাশ প্রথমে কথা কহিল—'অনসূয়া!'

অনসূয়া কম্পিতপদে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওই বিছানাটায় বস। এমন সময়ে এসেছ যে তোমায় অভ্যর্থনা করবার কোন উপায়ই নেই"—

অনসূয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখানে কতদিন আছেন ?"

"দু-মাস। তুমি কবে এসেছ—কার সঙ্গে ?"

"আমি মার সঙ্গে মাসখানেক হ'ল এসেছি। এ ঘাটে প্রায়ই আসিনে। ভুবনেশ্বর দর্শন কর্‌ব বলে আজ এসেছিলাম। মার শরীরটা আজ খারাপ ; তাই আজ তিনি আসতে পারেননি।"

"কোথায় আছ ?"

"এই কাছেই আউধ মহল্লায় আমার এক মাসীমা থাকেন—সেইখানেই আছি।"

"আচ্ছা, এবার কি কথা কই বল তো ?

"কথা খুঁজে পাচ্ছেন না ? আচ্ছা আমি এইবার জিজ্ঞাসা করে যাই, আপনি উত্তর দিন। আপনার লোকজন সব কোথায় গেল ?"

"লোকজন তো এখানে নেই।"

"কেউ নেই ! রাঁধবার বা কাজ করবার লোক ?"

"না।"

"কেন আপনার চন্দ্রিকা কোথায় গেল ?"

"সে মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে গেছে।"

"আর কোন লোক রাখেন নি ?"

"সেই একজন লোক ঠিক করে গেছ্‌ল।"

"কোথায় গেল সে ?" "সেও চলে গেছে।"

"কবে গেল ?" "তিন দিন হ'ল।"

"আর ফিরে অসেনি ?" "না।"

"এল না কেন ?" "যাবার সময় কতকগুলো জিনিস না বলে নিয়ে গেছল, সে জন্য লজ্জায় বোধ হয় আসেনি। কতকগুলো টাকা, একটা ঘড়ি, কতকগুলো কাপড় জামা, এই সব।"

"এ তিন দিন কি করে চল্‌ল ?" "গান গেয়ে।"

"কি খেতেন ?" "দুপুরে কলের জল খেতাম। রাত্রে পাশের গলির এক ভদ্রলোক কিছু খাবার করে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করার জন্য তিনি খবর নেন।"

"দিনে পাঠান না ?" "তাঁর স্ত্রী রুগ্না। সেই জন্য তিনি দিনে যা হয় দুটো নিজ হাতে রেঁধে মুখে দিয়ে যান্। রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে রাঁধেন।"

"এ কদিন দিনমানে কিছু খান্‌নি ?"

"কলের জল বেশী করে খেয়েছি।"

"তাই বুঝি আপনার কিটিকে অমাবস্যার দিনে একাদশী করবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন ! চলুন তো আমায় রান্নাঘরটা একবার দেখিয়ে দেবেন।"

"কেন ?" "আপনাকে অনেক দিন পরে রেঁধে খাইয়ে যাই,—নিন উঠুন।"

"রান্নাঘর এই পাশেই—এই দিক দিয়ে যেতে হয়; কিন্তু এখন তো কোন জিনিসের ব্যবস্থা নেই।"

"চাল ডাল আছে তো ?" "তা আছে।"

"আলু কয়লা এ সব ?" "তাও বোধ হয় আছে। চন্দ্রিকা তো মাসখানেকের জিনিস রেখে গেছ্‌ল।"

"তা হলেই হবে। আমি দুটো আলুভাতে ভাত চড়িয়ে দিইগে"—বলিয়া অনসূয়া উঠিল।

"সব বিশ্রী হয়ে আছে, কষ্ট হবে।"

"কিচ্ছু কষ্ট হবে না—আপনি চুপ করুন তো।"

"তবে এক কাজ বরং কর। তিন দিন চা খাওয়া হয়নি, তুমি বরং একটু চা করে খাওয়াও, ভাত থাক্।"

"আচ্ছা, আমি আগে চা করে আনি।"

জ্ঞানপ্রকাশ চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিটি অনসূয়াকে সব ঘর-দুয়ার দেখাইয়া ফিরিতে লাগিল।

উঠানের এক পাশে উচ্ছিষ্ট খাদ্যস্পৃষ্ট তিন-চারখানা থালা, কয়েকটা বাটি ও গেলাস পড়িয়া আছে।

রান্নাঘরের দুয়ার খোলা। কয়েকটি হাঁড়ি উনানের পাশেই কাত হইয়া পড়িয়া আছে। একটা লোহার কেট্‌লি বারান্দায় পড়িয়া,—তাহার ঢাকনিটা উঠানে ছাই-গাদার উপর কি করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশের দুঃখের কথা সবই জানিত। আঁচলে চোখ মুছিয়া সে চৌবাচ্ছা হইতে জল লইয়া আগে ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া লইল। কেট্‌লি বেশ করিয়া মাজিয়া উনান জ্বালিয়া পেয়ালা ধুইয়া দুই পেয়ালা জল চড়াইয়া দিল। গোয়ালা আসিয়া তাকের উপর যেমন দুধ রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি পড়িয়া ছিল। জল গরম হইতে হইতে টি-পট্‌টি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পরিষ্কার করিল। তার পর জলে চা ছাড়িয়া দুধটুকু জ্বাল দিয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া আনিল।

জ্ঞানপ্রকাশ চায়ের পাত্রে ধীরে ধীরে দুইটি চুমুক দিয়া বলিল—"সুন্দর হয়েছে, অনেক দিন এমন সুন্দর চা খাইনি।" সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

অনসূয়া কহিল—"কি রোগাই হয়েছেন আপনি !"

জ্ঞানপ্রকাশ মুখ তুলিয়া একবার ম্লান হাসি হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই ফোঁটা জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভাত আলুভাতে ও একটা তরকারী রাঁধিয়া অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশকে খাইতে দিল। যৎসামান্য খাইয়া জ্ঞানপ্রকাশ কিটিকে খাইতে দিল।

অনসূয়া কহিল—'এবার আমি যাই।'

জ্ঞানপ্রকাশ নতদৃষ্টি অনসূয়ার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা অনসূয়া, আবার যদি চন্দ্রিকা কখন চলে যায়, তোমায় কোথায় খবর পাঠাব—যদি এসে এমনি করে খাইয়ে যাও।"

অনসূয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"যদি এক মাসের মধ্যে খবর পাঠান তো ১৩৩নং আউধ গর্ব্বিতে খবর দেবেন ; এর পরে হলে আমাদের বাড়ীতে—কুসুমপুরে।"

"কিন্তু তুমি শ্বশুরবাড়ী গেলে ?—সেখানকার ঠিকানাটা কি ?"

"সেটা ঠিক জানিনে—কারণ সেটা এখনও হয়নি।"

বলিয়া অনসূয়া একটু দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া তাহার সজল চক্ষুদুটি একবার বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া অনসূয়া পাশের পথ ধরিল।

৫

মাকে সব কথা বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অনসূয়া পরদিন সকালে সকালে তাহার ছোট মাসতুত ভাইটিকে সঙ্গে করিয়া জ্ঞানপ্রকাশের বাসায় আসিল।

অনসূয়ার মা এ সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন ও সারাদিন উন্মনা রহিলেন। বিজয়ার বিবাহের পর অনসূয়ার বিবাহের চেষ্টা হইতেই অনসূয়া মাকে কাঁদাইয়া জানাইয়াছিল, সে বিবাহ করিবে না। সমাজ কি বলিবে বলিয়া কিছু পীড়াপীড়ি করিলে সে মায়ের পা ধরিয়া জানাইয়াছিল যে, তাহার তো ভাই নাই যাহার জন্য সমাজকে মানিয়া চলিতে হইবে। মা আর সে ভগবানের নাম করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিলেই চলিবে। জ্ঞানপ্রকাশকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই সে যে বিবাহ করিতে চাহিতেছে না—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগিল, তাহা তিনি গোপনেই রাখিলেন।

অনসূয়া আসিয়া দেখিল জ্ঞানপ্রকাশ তখনও শুইয়া ও কিটি বসিয়া পাহারা দিতেছে। দুধ সকালে আসিবে কি না তাহার ঠিক নাই ভাবিয়া সে ছোট একটি বাটি করিয়া খানিকটা দুধ আনিয়াছিল। অনসূয়া বরাবর রান্নাঘরে গিয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া কিছু খাবার ও চা প্রস্তুত করিয়া আনিল।

জ্ঞানপ্রকাশকে ডাকিতে সে উঠিয়া বসিল। সকালেই অনসূয়াকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া বলিল—'কই, তুমি তো বলনি যে সকালে আস্‌বে !'

অনসূয়া উত্তর দিল—'না বল্‌লে আসতে নেই ? এত দেরীতে ওঠেন কেন ? এতে যে শরীর আরও খারাপ করে। কত রাত্তিরে শোন ?' "ঠিক নেই।"

"কাল কত রাত্তিরে শুয়েছিলেন ?" "দুটো তিন্‌টে হবে।"

"কি করছিলেন এতক্ষণ ?" "গান।"

"সমস্তক্ষণ ?" "হ্যাঁ।"

"কষ্ট হয় না ?" "না,—না গাইলে বরং কষ্ট হয়।"

"তা এখন উঠুন, খাবারটুকু খেয়ে চা খেয়ে ফেলুন। আমি ততক্ষণ রান্নাটা চড়িয়ে দি। কিছু তরকারি কেবল আনিয়ে নিতে হবে—তা রঞ্জিৎ এনে দিতে পারবিনে ?"

অনসূয়ার মাসতুত ভাই রঞ্জিৎ। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"খুব পার্‌ব। এই তো বাজার।"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"শুধু একটু চা দাও, আজ আর কিছু খাব না, শরীরটা ভাল নেই। মাথায় কি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"কেন, অসুখ হয়েছে ?—দেখি !" বলিয়া অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশের গায়ের উত্তাপ দেখিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আবার কি ভাবিয়া হাত সরাইয়া লইল।

জ্ঞানপ্রকাশ একবার "উঃ" বলিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিল।

"আপনার কষ্ট হচ্ছে?" বলিয়া অনসূয়া জ্ঞানপ্রকাশের কপালে হাত দিয়া দেখিল—গাও গরম হইয়াছে।

"না, এ কিছু নয়, সেরে যাবে"—বলিয়া জ্ঞানপ্রকাশ মুখ ধুইবার জন্য উঠিতে গেল; কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় "উঃ" বলিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

"থাক্, আপনি উঠ্‌বেন না"—বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অনসূয়া মুখ ধুইবার জল আনিয়া জ্ঞানপ্রকাশের মুখ ধোয়াইয়া দিল।

শয্যায় শুইয়া শুইয়াই জ্ঞানপ্রকাশ চা পান করিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তারের ব্যাগে থারমমিটার থাকে, তাহা অনসূয়া জানিত। অনসূয়া থারমমিটার বাহির করিয়া রোগীর উত্তাপ পরীক্ষা করিল;—দেখিল ১০৫ ডিগ্রি।

মাথায় জলপটি দিয়া অনসূয়া বাতাস করিতে লাগিল। আউধমহল্লায় একজন ডাক্তার থাকিতেন; অনসূয়া রঞ্জিৎকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিল ও মাকে খবরটা দিয়া আসিতে বলিল।

খানিক পরে জ্ঞানপ্রকাশ চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিল। অনসূয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু বল্‌বেন?"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—"ঐ ব্যাগটায় আমার ড্রয়ারের চাবি আছে। দরকার হলেই ড্রয়ার থেকে টাকা নিও। আর যদি অসুখ খুব বাড়ে—আমার জ্যাঠামশায়কে একটা তার করে দিও। আমার ডায়েরীতে ঠিকানা লেখা আছে।"

অনসূয়া বলিল—"আপনি ভাব্‌বেন না, শীগ্‌গির সেরে যাবে।"

"না, ভাবনার তো কিছু আর নেই।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। ঔষধ লিখিয়া দিলেন। বাসায় পুরুষ কেহ না থাকায় রোগীর সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। অনসূয়া ভিজিট দিতে আসিলে বলিলেন—'বাইরের ওই লেখাটা আগে তুলে রেখে দিও মা। তখন ভিজিট নেব।"

অপরাহ্নে জ্বর আরও বাড়িল। রাত্রে কে থাকিবে, একা সে কি করিবে, যদি কিছু বিপদ ঘটে তো কাহার সাহায্য চাহিবে, এই সব কথা অনসূয়া ভাবিতেছে, এমন সময় একটা মুখ-বন্ধ হাঁড়ি ও একটা কাপড়ের পুঁটলি হস্তে চন্দ্রিকা সিং আসিয়া উপস্থিত হইল।

চন্দ্রিকা অনসূয়াকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। জ্ঞানপ্রকাশের বিবাহের পূর্ব্বে ও পরেও অনসূয়াকে সে বার কয়েক দেখিয়াছে। প্রভুকে শয্যাগত দেখিয়া চন্দ্রিকা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কখন অসুখ হইয়াছে, কখন অনসূয়া আসিয়াছে, যে চাকর সে রাখিয়া গিয়াছিল সে কোথায় গেল, এ ক'দিন প্রভুর কি করিয়া কাটিয়াছে, এ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

অনসূয়ার চোখেও জল আসিয়াছিল। তবু সে চন্দ্রিকাকে বুঝাইল—'এখন অধীর হইলে চলিবে না। অসুখ কাহার না হয়! চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সারিয়া উঠিবেন।'

অনসূয়াকে চন্দ্রিকা ছাড়িয়া দিল না। হাত জোড় করিয়া কহিল—'একে তো আমি রোগের কিছুই বুঝি না, তার উপর বাবুর অসুখে আমার হাত পা উঠিতেছে না। আপনি না থাকিলে বাবু বাঁচিবেন না।'

অনসূয়া মায়ের অনুমতি লইয়া রহিয়া গেল।

পরদিন জ্ঞানপ্রকাশের জ্ঞান রহিল না। অনসূয়ার কথামত চন্দ্রিকা ডাকঘরে গিয়া শিবনাথের নামে তার করিয়া আসিল। চন্দ্রিকা, অনসূয়া ও কিটি এক প্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর কাছে বসিয়া রহিল। চন্দ্রিকা ও অনসূয়া তবু পালা করিয়া উঠিয়া স্নান করিয়া মুখে কিছু দিয়া আসিত, কিটি কিছুতেই সে ঘর ত্যাগ করিত না।

পরদিন অপরাহ্নে শিবনাথ একজন পরিচারক সঙ্গে করিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন।

জ্ঞানপ্রকাশের অবস্থা দেখিয়া তিনি চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। চন্দ্রিকা ও অনসূয়ার কাছে সব শুনিয়া বলিলেন—"জ্ঞানের বাড়ীতে জ্ঞানের পয়সায় আমরা রাজার হালে আছি, আর জ্ঞান এখানে এত কষ্ট পাচ্ছে;—রেঁধে দেবার একটা লোক নেই। ক্ষিদেয় ও কি না জল খেয়ে ক্ষিদে মেটায়?"

যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহাকে ডাকান হইল। কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে আনানো হইল। শিবনাথ হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"আপনারা দুই জনেই দেখুন।"

বৃদ্ধির মুখে রোগ কমে না। তার উপর শক্ত টাইপের টাইফয়েড্। অনসূয়া লজ্জা সংকোচ সব ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণ

শুশ্রূষায় রত রহিল। ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত বলিতে লাগিলেন—যদি ইনি বাঁচেন এঁরই শুশ্রূষার গুণে। শুনিয়া অনসূয়ার মাথা লজ্জায় নত হইয়া পড়িত, চক্ষে অশ্রু দেখা দিত।

রোগীর জ্ঞানের লক্ষণ কেবল মাঝে মাঝে বুঝা যাইত। কখন কখন কেবল নাম করিত, জ্যাঠামশায়,—অনসূয়া—চন্দ্রিকা। এক এক দিন বলিত—"কিটি কিটি—খা।"

ঠিক পঁয়তাল্লিশ দিন পরে জ্ঞানপ্রকাশের জ্বর ত্যাগ হইল। তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে প্রথমই ডাকিল "কিটি—কিটি!"

পথ্য পাইয়া যে দিন জ্ঞানপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল, সে দিন স্ফূর্ত্তি দেখে কে? তাহার যেন সজীবতা ফিরিয়া আসিল।—সে দিন আর বাড়ীতে একটা পাখীর পক্ষে বসিবার যো ছিল না।

অনসূয়া এক দিন জ্ঞানপ্রকাশকে পথ্য খাওয়াইয়া দিয়া হাত তাহার মুখ মুছাইয়া বলিল—"উঃ! কি ভাবিয়েই তুলেছিলেন আপনি এবার! ভাগ্যে জ্যাঠামশায় সময় মত এসে পড়েছিলেন, তাই তো এত চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। নইলে কি হ'ত?"

জ্ঞানপ্রকাশ বলিল—'সুধু চিকিৎসায় হয়নি, অনসূয়া, তোমার শুশ্রূষার গুণেই প্রাণ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু লাভ তো কিছু নেই এতে। আমার এতদিনকার চেষ্টা তুমি ব্যর্থ করে দিলে। সেই তো আবার দিনের পর রাত্রি আর রাত্রির পর দিন। আলো নেই, বাতাস নেই—যেন অন্ধকারে হাঁফিয়ে থাকা!'

অনসূয়া বলিল—'দেখুন, অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। এখন এ সব আর ভাব্‌বেন না। জীবনে কর্‌বার কত কাজ আছে। এক দিক থেকে অলাভ পেয়েছেন বলে চারিদিকে বিমুখ হয়ে থাকা আপনাকে শোভা পায় না। এবার থেকে শরীরের দিকে চাইবেন। আমরা তো কদিন পরেই চলে যাব। জ্যাঠামশায়ও তো বরাবর থাক্‌বেন না।'

(৬)

জ্ঞানপ্রকাশ খানিকক্ষণ আনমনা রহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে তুমি যাবে অনসূয়া?"

"আপনাকে আর একটু সুস্থ দেখ্‌লে দুইচার দিনের মধ্যেই যাব।——রাগ কর্‌লেন?"

"না রাগ কর্‌ব কেন? তুমি যা করেছ তা যথেষ্ট। তোমাকে কিসের জোরে ধরে রাখ্‌ব?"

অনসূয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। কিন্তু সে মুখ খুলিল না।

জ্ঞানপ্রকাশ আবার বলিল—"দেখ অনসূয়া, কেউ দরদ্ করবার আছে, কেউ ভালবাস্‌বার আছে, আমি না থাক্‌লে কারু মন কাঁদবে—এ ভরসা না থাক্‌লে মানুষে বাঁচতে চায় না; জীবন তার কাছে মরণের চেয়ে ভয়ানক হয়ে ওঠে।"

অনসূয়া মাথা নত করিয়া বসিয়া ছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—"আপনাকে দরদ কর্‌বার লোক তো আছে।"

"আছে বটে; জ্যাঠামশায়ের স্নেহ ভোলবার নয়। চন্দ্রিকা ও কিটির অনুরাগও কম নয়; কিন্তু মন যেন আরও কিছু চায়।"

"এ ছাড়াও এমন একজন আছে যে তোমাকে দেখ্‌লে সব ভুলে যায়।"—ভাবাবেগে অনসূয়ার বক্ষঃ তখন তোলপাড় করিতেছিল।

'আছে!—কে আছে অনসূয়া?'—জ্ঞানপ্রকাশের গলা তখন কাঁপিতেছিল।

অনসূয়া উত্তর দিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

আহত হৃদয়ে জ্ঞানপ্রকাশ অনসূয়ার বিগলিত অশ্রু-পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে অনসূয়ার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"অনসূয়া, আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি। কিন্তু তোমাকে আমি আর ছেড়ে দেব না। তোমার প্রতি আমি চির দিন অনুরক্ত, কিন্তু অন্য চক্ষে তোমাকে দেখেছিলাম। এখন ভাবি—তখন যদি ভুল পথে না যেতাম, তাহলে জীবনটা এমন হ'ত না।"

অনসূয়ার বহুদিনকার সঞ্চিত অশ্রু এতকাল পরে আজ ঝরিতে লাগিল। সে হাত সরাইয়া লইল না। একটি কথাও তাহার মুখে আসিল না। তাহার উদ্বেলিত হৃদয় বাক্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে শিবনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনসূয়া লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইতে,

তিনি বলিলেন—"বোস, মা, বোস, বুড়ো ছেলের কাছে লজ্জা কি মা!—হ্যাঁ একটা কথা বল্‌তে এলাম তোমাদের। আস্‌ছে সোমবারেই সবাই আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। জ্ঞানকে আমি আর এমন করে ছেড়ে যাচ্ছি নে। এতদিন জ্ঞান, আমি তোমার সব কথা শুনে এসেছি; এবার তোমাকে দিন কতক আমার কথা শুন্‌তে হবে। আর মা অনসূয়া, তোমাকে আমি ছাড়্‌ছি না—এই সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে; আর আস্‌তে দেব না। তুমি আমার জ্ঞানের গৃহলক্ষ্মী হবে। তোমার মার কাছে আমি এই অনুমতি নিয়ে আস্‌ছি। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি সঙ্গে না থাক্‌লে গৃহস্থালী কে দেখ্‌বে? আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমরা সুখী হবে।"

অনসূয়া ও জ্ঞানপ্রকাশ দুই জনে এক সঙ্গে উঠিয়া শিবনাথকে প্রণাম করিল। তাহাদের দুই জনের অশ্রু পূজার ফুলের মত পিতৃসম বৃদ্ধের চরণে নিবেদিত হইল।

শোক-সংবাদ

৺দক্ষিণাচরণ সেন

প্রসিদ্ধ যন্ত্র-সঙ্গীত-বিশারদ দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় আর ইহ জগতে নাই, যন্ত্র-সঙ্গীত ক্ষেত্র হইতে একজন প্রধান ব্যক্তির তিরোভাব হইল। এদেশে ঐকতান বাদনের

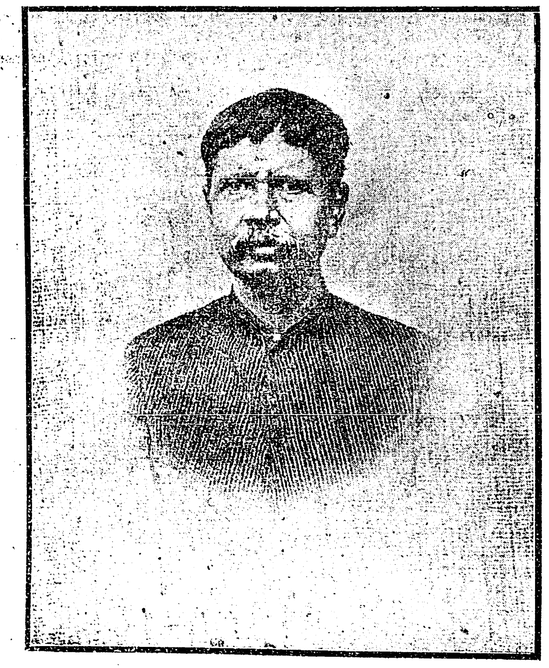

৺দক্ষিণাচরণ সেন

একটা নূতন পদ্ধতি দক্ষিণা বাবুই প্রচলিত করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুসৃত স্বরলিপি এখনও গীতবাদ্য-শিক্ষার্থীর নিকট যথোচিত সমাদর লাভ করিয়া থাকে। এমন বিনয়ী, নিরহঙ্কার লোক অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়; যিনিই দক্ষিণা বাবুর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও বড় কম ছিল না, অনেককে তিনি যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। আমরা দক্ষিণাবাবুর শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথিতনামা যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবাতেই যজ্ঞেশ্বর বাবু জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। টড সাহেব কৃত 'রাজস্থানে'র বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহার রচিত 'বীরমালা' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অমূল্য রত্ন। শেষ বয়সে তিনি কাশীমবাজার কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপকতা করেন এবং কাশীমবাজার হইতে প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকাও কয়েক বৎসর সম্পাদন করেন। ইনি কিছুদিন হইতে সভ্যতার 'ইতিহাস' প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি আর প্রকাশিত হইল না। আমরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর পরলোকগমন সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার সন্তানহীনা বিধবার হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

রবারাবৃত ক্যাম্বিসের ক্ষুদ্র নৌকায় ১২ ঘণ্টায় ৬০ মাইল অতিক্রম

বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস একজনের বসিবার উপযুক্ত রবারাবৃত ক্যাম্বিসের ক্ষুদ্র নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ১২ ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাণাঘাটে পৌঁছিয়াছিলেন।

নৌকাখানি জার্ম্মাণদেশে নির্ম্মিত,—ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট প্রস্থে ২ ফুট ৪ ইঞ্চি, ও উর্দ্ধে ১১ ইঞ্চি মাত্র। উহার ওজন প্রায় অর্দ্ধ মণ। নৌকাখানি দুইটি থলিয়ায় খুলিয়া ভরা যায়, ইহাতে দুইটি পাল ও দু'দিকে টানিবার উপযুক্ত একটি দাঁড় আছে।

অমরেন্দ্র বাবু বেলা ২ ঘটিকার সময় নদীয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৬টার সময় চারি ঘণ্টায় চুচুড়ায় পৌঁছান। পর দিবস বৈকাল ৫ ঘটিকায় পুনরায় যাত্রা করেন। তখন অনুকূল বায়ুযোগে তাঁহার নৌকাখানি ছুটিতে থাকে। কদাচ তিনি পাল তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ছাতটিই অধিকাংশ স্থলে পালের কার্য্য করিয়াছিল। সন্ধ্যায় ত্রিবেণী অতিক্রম করিবার পরই প্রবল ভাটায় তাড়িত হইয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানি পশ্চিমকূলে নসরায়ের নিকটবর্ত্তী মুনো গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, অমরেন্দ্রবাবু নৌকাখানিকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়া স্থানীয় জমীদার বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। পরদিন প্রাতে তিনি পুনরায় রওনা হইয়া, প্রতিকূল বায়ুতে ক্রমান্বয়ে দাঁড় টানিয়া বেলা প্রায় ৯৷৷০টার সময় জিরাটে অবতরণ করেন। সেই দিবসই বেলা ৫টার সময় আবার রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় চুর্ণী নদীতে প্রবেশ করিয়া রাত্রি ৮৷২০ মিনিটের সময়—রাণাঘাটে পৌঁছিয়াছিলেন। এবার হাওয়া বা স্রোত না থাকায় তাঁহাকে বরাবর দাঁড় টানিতে হইয়াছিল। রাণাঘাট হইতে নৌকাখানি ব্যাগে ভরিয়া তিনি ট্রেণযোগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রবারাবৃত ক্যাম্বিসের ক্ষুদ্র নৌকায় ১২ ঘণ্টায় ৬০ মাইল অতিক্রম

সাময়িকী

এই আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আজ তাই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম স্মরণ করি। তাহার পরই 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্মরণ করি। শ্রীভগবানের কৃপা ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণাই 'ভারতবর্ষ'কে এই এক যুগ বঙ্গবাণীর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছে; 'ভারতবর্ষ' যে যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে, তাহা ভগবানেরই আশীর্ব্বাদে; আমরা নিমিত্ত মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবকবৃন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া আমরা এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিলাম। যোগ্যতার স্পর্দ্ধা কোন দিন করি নাই; বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবাই আমাদের ব্রত; আমরা সেবা করিবারই অধিকারী, কর্ম্ম করিবারই অধিকারী; কর্ম্মের ফলের দিকে কোনদিন আমরা লোলুপ দৃষ্টিপাত করি নাই, জয়-পরাজয়ের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই, প্রতি-যোগিতার কথা কোন দিনই আমাদের মনে আসে নাই। আজ তাই এই ত্রয়োদশ বৎসরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব, আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক, আমাদের সুযোগ্য সহযোগীবৃন্দকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও অভিবাদন করিয়া আমরা 'ভারতবর্ষ'কে ত্রয়োদশ বর্ষে অভিষিক্ত করিলাম। এই দ্বাদশ বৎসর আমরা যত্ন চেষ্টা অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করি নাই, নিজেদের শক্তি সামর্থ্য 'ভারতবর্ষে'র সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি; এখনও তাহাই করিব—সাফল্য অসাফল্যের কথা কোন দিন ভাবিও নাই, ভাবিবও না।

এই মাসের প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত 'মেঘনাদ-বধ'-কাব্য রচয়িতা, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত,—যিনি একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—

"——রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

এবার 'সাময়িকী'র প্রধান কথা দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধীর বাঙ্গালা দেশে ভ্রমণ। সেই যে ফরিদপুরের প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলা দেশে আগমন করিয়াছেন, সেই হইতে তিনি বাঙ্গালা দেশেই আছেন এবং আরও মাসাধিক কাল থাকিবেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি কলিকাতায় বসিয়া দেশের খবর সংগ্রহ করেন নাই, পরের মুখে ঝাল খান নাই; এই দুর্ব্বল শরীরে তিনি বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান সহরে, নগরে, গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছেন। এখনও সে ভ্রমণের শেষ হয় নাই, এখনও তাঁহাকে আরও অনেক স্থানে যাইতে হইবে, অনেক স্থানের অসংখ্য নরনারীকে দর্শন দিতে হইবে। তাঁহার আগমনে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। এ উত্তেজনা সুধু শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে, দেশের জনসাধারণ, আবালবৃদ্ধবণিতা মহাত্মাজীর দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা অশিক্ষিত, সাধারণ লোক, যাহারা সমাজে অবজ্ঞাত, যাহারা দিনমজুরী করিয়া কোন প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যেই যেন মহাত্মার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেখানেই হাজার হাজার নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য দূর গ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। আর কি শক্তি এই দুর্ব্বল-শরীর মহাত্মা গান্ধীর। তিনি বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানেন না, কৌপীনধারী নগ্নদেহ, নগ্নপদ সন্ন্যাসী প্রফুল্ল মুখে প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন,—ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই!

মহাত্মা গান্ধী এবার বাঙ্গালা দেশে রাজনীতি প্রচার করিতে আইসেন নাই। এই যে মাসাধিক কাল তিনি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলেন এবং পরে আরও করিবেন, ইহার মধ্যে এক দিনও তিনি নন-কো-অপারেসন, কাউন্সিল প্রবেশ, রিফরম ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন কথাই বলেন নাই; এমন কি রাজনীতি-ক্ষেত্রের মহারথী

বৃদ্ধ সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত বারাকপুরে সুদীর্ঘ সময় কথোপকথনের মধ্যেও তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কোন আলাপ করেন নাই; বাঙ্গালার নানা স্থানে তাঁহাকে বোধ হয় শতাধিক বক্তৃতা করিতে হইয়াছে; কিন্তু কোথাও একবারও তিনি রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই। তাঁহার বাণী এবার "চরকা, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও হিন্দু মুসলমানের মিলন।" আর কোন কথা নাই; যেখানে গিয়াছেন, যত কথা বলিয়াছেন, তাহার সার কথা 'চরকা ঘুরাও, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কর, হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হও, আমার আর কোন কথা নাই, আর কোন উপদেশ নাই। এখন চরকা, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, হিন্দু মুসল-মানের মিলনই তাঁহার জপ-তপ হইয়াছে, এক মনে তিনি সেই তুই জপ করিতেছেন, সকলকে তিনি সেই মন্ত্রই দান করিতেছেন। যেখানে তিনি যাইতেছেন, সেখানেই দেখিতেছেন চরকা চলিতেছে কি না, লোকে খদ্দর ব্যবহার করিতেছে কি না। তিনি বলিতে চান, চরকাতেই ভারতের মুক্তি হইবে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনেই ভারতের উন্নতি হইবে, হিন্দু-মুসলমানে মিলনেই ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গালা দেশ কি মহাত্মার এই মন্ত্র গ্রহণ করিবে?

আমাদের সরকার বাহাদুর ভারতবর্ষে দুইবার উপাধি বর্ষণ করেন,—একবার ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে, আর একবার মহামহিম ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে। বৎসরের এই দুই দিনই অনেক লোক শিমলা শৈলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন। দেশে উপাধি লোলুপের সংখ্যাও বড় কম নহে। এই দুইদিনে কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হন, কেহ বা বিষাদে অবসন্ন হন, আবার কেহ বা ভাবেন 'আজকে বিফল হোলো, হ'তে পারে কা'ল।' এবারও বিগত ৩রা জুন মহামহিম ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপাধি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ বর্ষণে বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত হয় নাই,—অমনি দুই এক ফোঁটা মাত্র পড়িয়াছে। সাহেব-সুবাদের কথা ছাড়িয়া দিই, লাট-বেলাটের কথাও বলিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই চারিজনের নাম উল্লেখ করিব। মহীষূরের দেওয়ান এল্‌বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার বাহিরের হইলেও বাঙ্গালী ত, সুতরাং তাঁহাকে 'সার' উপাধিতে ভূষিত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। 'সার' অব্‌দর রহিম বাঙ্গলার মজলিসের প্রধান মেম্বর; আইন অনুসারে তিনিই নাকি কয়েক মাসের জন্য বাঙ্গালার লাট হইবার হক্‌দার ছিলেন। তাহা হয় নাই; তাহার বদলে তিনি এবার কে-সি-এস-আই হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে 'সার' উপাধি দিলেই ঠিক মানাইত, কিন্তু তিনি হইয়াছেন সি-আই-ই। সকলে বলিতেছে এই সবে আরম্ভ। তাহাই হউক। বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বৈজ্ঞানিক-প্রবর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় 'রায় সাহেব' হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই উপাধি যে শোভন হয় নাই, ইহা সকলেই বলিতেছেন। খুলনা মহেশ্বর পাশার প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীমান শশিভূষণ পাল 'রায় সাহেব' হইয়াছেন; আনন্দের কথা। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ও 'রায় সাহেব' হইয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয় বাবুর উচ্চতর উপাধি লাভ করা উচিত ছিল। আর যাঁহারা উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সরকারী আহারী বা অনাহারী কর্ম্মচারী; তাঁহাদের মঙ্গল হউক।

সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরী মাতা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় অন্যূন ২৮ বৎসর যাবৎ মাতৃজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। এই আশ্রম ২২।৬ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে প্রায় ত্রিশটি অনাথা বালিকাকে বাসস্থান, খোরাক, পোষাক ও শিক্ষাদান নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয়। অভিভাবক যাহাদের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন এমন অনেক বালিকাও এখানে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ধর্ম্ম-চর্চ্চা এবং লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরকা, তাঁত, সেলাই, রন্ধন ও যাবতীয় গৃহ কর্ম্মাদি অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে বাহিরের ছাত্রীগণও এখানে প্রত্যহ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই

বিদ্যালয় হইতেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আশ্রমবাসিনী মেয়েরা সংস্কৃত ও ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষা যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেরূপ বিশেষ বন্দোবস্তও আছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি কুমারী

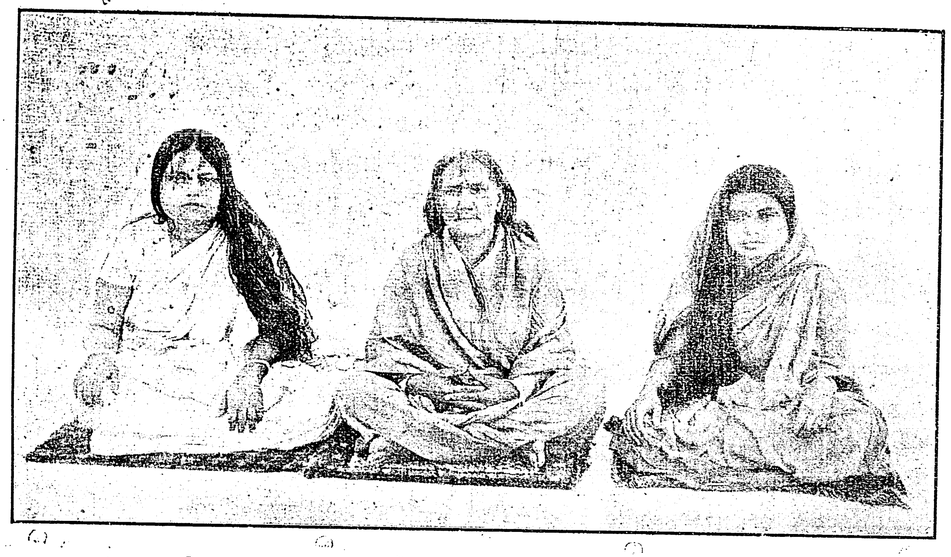

আশ্রম-সম্পাদিকা
শ্রীদুর্গাপুরী দেবী বি-এ, ব্যাকরণতীর্থ

আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী
শ্রীশ্রীগৌরীমা

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী
শ্রীসুতপাপুরী দেবী ব্যাকরণতীর্থ

ব্যাকরণে উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং সাংখ্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিয়াছেন। একজন বি-এ, পাশ করিয়াছেন এবং কয়েকজন আই-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। এতদিন এই দীর্ঘকাল স্থায়ী অনুষ্ঠানটি ভাড়াটে বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিল; সম্প্রতি নিজস্ব ত্রিতল বাড়ী নির্ম্মিত হওয়ায় তথায়ই শৃঙ্খলার সহিত আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতেছে। বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তার উপর আরো ১৫০০০৲ হাজার টাকা উঠিলে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত নূতন উপন্যাস "পিতা-পুত্র" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত নূতন উপন্যাস "বিসর্জ্জন" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি. আই. ই. প্রণীত নূতন উপন্যাস "ঋণ-মোক্ষ" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲

কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসু প্রণীত "বীরকুমার-বধ কাব্য" (নূতন সংস্করণ) প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী সিরিজের নবম উপন্যাস "হট্টমন্দিরে দস্যুলীলা" ও দশম উপন্যাস "জোড়া ডিটেক্‌টিভ" প্রকাশিত হইয়াছে; প্রত্যেকের মূল্য—৸০

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সাধন-মন্দির" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—২৷৷০

শ্রীহেমমালা বসু প্রণীত কাব্য "রাবেয়া" প্রকাশিত হইল;—১৷৷০

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ভবেশ" প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৷৷০

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ প্রণীত উপন্যাস "নিরক্ষরা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বাঁচিবার উপায়" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৲

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "একলব্য" নাটক প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী এম-এ প্রণীত "জঙ্গ বাহাদুর" নাটক প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷০

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত রঙ্গনাট্য "ওলোট-পালোট"এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য—৷৵০

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

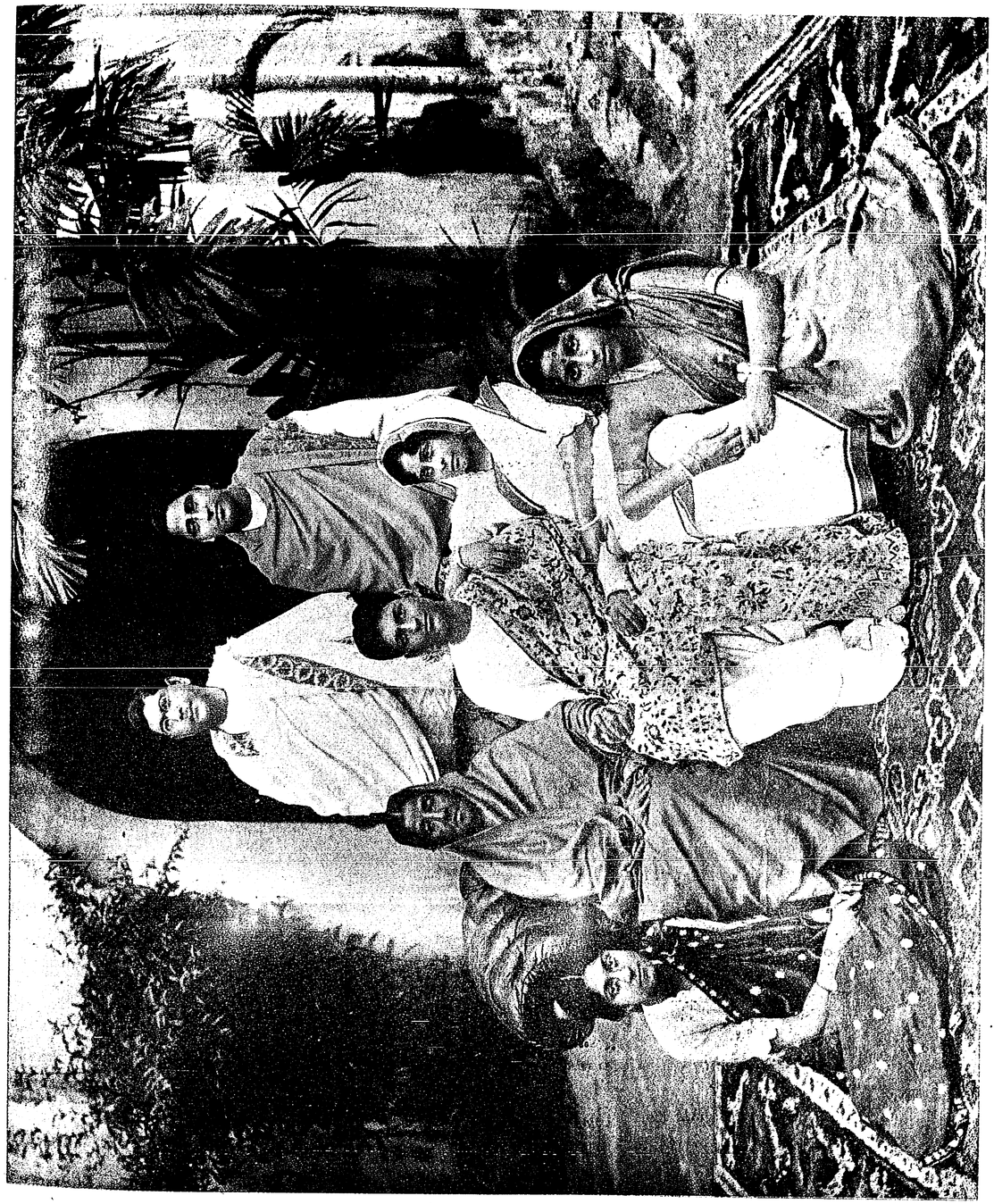

COLOURED ILLUSTRATION